বসন্ত রাতের ঝড়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

□ প্রথম প্রকাশ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬৯ / ডিসেম্বর ১৯৬২

□ প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

□ মুদ্রাকর ঃ অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৬

□ প্রচ্ছদ ঃ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীতুষার মাইতি
প্রীতিভাজনেষু

উপন্যাসটি অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকায় ছয়ের দশকের শেষাশেষি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী দেড়-দুই দশক ধরে গ্রাম-শহর সম্পর্কে যে নতুন বিন্যাস ঘটেছিল, এই কাহিনী তারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। তবে উপন্যাস যেহেতু বানানো গল্প, এ সম্পর্কে আমার কোনও উচ্চাভিলাষ নেই।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এক

দরজায় সাইকেলের ঘন্টি শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে লীলা বলেছিল, দেখ, কে ডাকছে। পিওন হয়ত।

সত্য বারান্দার তক্তাপোষে মাদুর পেতে শুয়েছিল। কদিন থেকে ভীষণ গরম পড়েছে। একটুও বাতাস নেই। গাছপালা পুড়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এবারও প্রচণ্ড খরা হবে। আষাঢ় আসতে দেরী আছে। তাহলেও এসময় কিছু বৃষ্টি খুব দরকার। পুকুর ডোবা সব শুকিয়ে গেছে। সত্যচরণ খুব একটা বিষয়ী না হলেও এইসব ছাই-পাঁশ ভাবছিল শুয়ে। হাতপাখা দিয়ে মাছি তাড়ানো ছাড়া হাওয়ার স্বাদ নেবার চেষ্টা করা বৃথা। গায়ে জ্বালা ধরে যায়। ফোস্কা পড়ে যেন। তাই সে বিরক্ত হচ্ছিল। সেইসময় লীলার কথা শুনে সে গা করল না। বলল, পিওন কেন আসবে? কোন ভিখিরি হবে, অন্ন খাবার ছলে ভাত খেতে চাইবে। ছেড়ে দাও।

রান্নাঘরে থাকার ফলে লীলাও বেশ বিরক্ত। তার কপালে ঘাম, নাকের ডগায় ঘাম, চিবুকে ঘাম। আঁচলে মুখটা মুছে সে বলে উঠল, কী কথার ছিরি তোমার! ভিখিরী ঘণ্টা বাজায়, না সাইকেলে চেপে আসে!

সত্যচরণ পা টানটান করে বলল, অ। সেও একটা কথা। তাহলে এই ভরদুপুরে কে আসতে পারে? পিওন…কিন্তু এই তো সবে গতকাল জামাইবাবু এসেছিলেন। দিদি ছাড়া আর কে চিঠি লিখবে?…অবিশ্যি তোমার মা…সত্য এবার কাত হয়ে কনুই ভর করে মুখ তুলল।…তোমার মা লোক পাঠাতে পারেন। কিন্তু রূপপুর থেকে যদি আসে কেউ—তো সে তোমাদের ঘণ্টা কিংবা হরু। আমি জানি, ও ব্যাটারা সাইকেল চাপতে পারে না। তাহলে…

কথা শুনতে শুনতে লীলা রাগে মনে মনে জ্বলছিল। এবার ফেটে পড়ল।…এত আলসে মানুষ তুমি! জীবনে কী করবে, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তখন থেকে কে যেন বাজাচ্ছে দরজায়, বাবুর ননীর শরীর—

একটু উঠে গেলেই গলে যাবে। নাঃ, সব দায় আমার ওপর চাপিয়ে বেশ সুখেই আছ।

ঝগড়া লীলা করে না স্বভাবত। কিন্তু এখন তার কথার সুরে ঝাঁঝ—বেশ কটুই লাগল সত্যর। তবু তারও নিজের একটা স্বভাব আছে—সে হাসল খিলখিল করে। বলল, সুখে থাকবার জন্যেই তো বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছি।

লীলা আরও ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিল, হ্যাঁ, বড়লোকের মেয়েকে ঝি গিরি করিয়ে আশা মিটেছে কিনা। এই গরমে নরকের আগুন সামনে নিয়ে বসে আছি—তুমি কী বুঝবে?

সত্য আপোষের সুরে বলল, ভালো ঝি যে কোথাও পাচ্ছি নে। রাণীচকের মত জায়গায় আজকাল ঝি মেলে না—কী অবস্থা হল দেশে। আশ্চর্য! যদি বা মেলে, মাইনে শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

ওদিকে ঘণ্টি বাজার বিরাম নেই। লীলা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল। সেই সময় একবার মুখ ফিরিয়ে সে দেখল, সত্য ফের চিৎ হয়েছে। পা-দুটো আঁকশি করে নাচাচ্ছে। পাখাটা মৃদু মৃদু ঠুকছে বুকে। ভালুকের মত রোমে ভরতি ওর বুক। আলসেমির যত উৎস সব যেন ওখানেই—ওইরকম রোমের আড়ালে একটা অদ্ভুত রাক্ষুসে জানোয়ার যেন লুকিয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে আবছা ভয়ে গা ছমছম করে তার।

লীলা অগত্যা উঠোনে নামল। গজগজ করছিল সে।···আমারই যত দায়! এটা যে ভদ্রলোকের বাড়ি, সে প্রমাণ আমাকেই দিতে হবে। কী ভাগ্যি আমার!

আজ হয়ত অত্যধিক গরমের জন্যেই লীলার মত শান্ত মেয়ে চটে লাল হয়ে গেছে। সত্য গরমকেই দোষারোপ করল মনে মনে। অবশ্যি লীলা কিছুটা জেদীও বটে। বেশি চটানো ঠিক নয়। বাইরে কেউ এসেছে, সাইকেল চেপেই এসেছে—সেটা লীলাই সামলে নিক। সত্যর কিছু করতে ইচ্ছে করে না। তবে একথা সত্যি, বেচারাকে একটা ঝি এনে দেওয়া খুবই দরকার। বিয়ের পর আজ দুবছর ধরে সেটা আর হয়ে

ওঠে না। এটা কি সত্যর চিরাচরিত আলসেমি?···ঝি-এর কথা মনে পড়লে, সত্য ভাবে—বড়লোকের ঘরের একমাত্র মেয়ে, বংশের সলতে। কুড়ি বছর তোমার কেটে গেছে শুকনো হাতেপায়ে। এবার কিছুদিন কষ্ট করতেই বা দোষ কী?···এ যেন শাস্তি দেওয়া একরকম। অথচ লীলা তো কোন দোষ করেনি সত্যর কাছে। ওর মায়ের অগাধ টাকা থাকাটাই কি ওর দোষ? নাঃ, তাও নয়। তবে কি ওর চেহারা? তাই বা কেন হবে? যৌবনে পুরুষমানুষ যুবতীদের স্বভাবত ভালবাসে। তাদের জন্যে রাক্ষসের পেটে যেতেও তার আপত্তি নেই। আর লীলার মত সুন্দরী এলাকার অন্য কারুর ঘরে বৌ হয়ে আছে বলে সত্যর জানা নেই। তাকে কেন সে কষ্ট দিতে চাইবে? এ তো দামী জিনিসের মত আলমারীতে রাখবার সাধ যায়। পাছে ভাঁজ ভেঙ্গে যাবে বলে ধোওয়া জামা পরতে গিয়ে সত্য যেমন বলে, থাক, গায়েরটা বিশেষ ময়লা হয়নি! লীলা এটা কুঁড়েমি বলে জানে।

শেষ অব্দি সত্য ধরে নিয়েছে, সে প্রকৃতপক্ষে একজন পাঁড় অলস। ভয়ঙ্কর গোঁফখেজুরে। আজ বলে নয়, জীবনের আটাশটা বছর তার ছাইপাঁশ ভাবতে-ভাবতে কেটেছে। না, সে নিস্পৃহ নয়, নিরাসক্ত নয়। জীবনকে আশ মিটিয়ে ভোগ করতে সে চায়। আহারে তার প্রচুর নিষ্ঠা—যার দরুণ লীলা পঞ্চাশব্যঞ্জন রান্না করেও কুল পায় না। নৈশ-শয্যায় এই লীলা সহস্র হলেও সে তুষ্ট নয়। তাই না লীলা ওকে বলে, ওদিকে তো রাক্ষুসে গ্রাস দেখে ভয় করে! একেই পাড়াগেঁয়ে কথায় বলে, 'কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে।' সত্য কদাচিৎ দাড়ি কামায় এবং সেই খোঁচাখোঁচা দাড়িগোঁফ চুলকে বলে, আমি একটা পাগলছাগল মানুষ, ছেড়ে দাও আমার কথা।

পাগল? যে বলে সে পাগল নয়—মহা ধড়িবাজ শয়তান।

সত্য মুখটা একবার ফিরিয়েছে ততক্ষণে। কারণ, ঘন্টাটা আর বাজছে না। এবং লীলার অনুচ্চকণ্ঠে আলাপ শুনতে পেয়েছে সে। ব্যাপার কী? কে এল দুপুরবেলা তেতেপুড়ে—এমন দিনে রোদ মাথায় নিয়ে সাইকেল ঠেলেছে, তার উৎসাহ বড় কম নয়! ওদিকে লীলাও

যেন একটা চাপা উৎসাহে চনমন করছে। কে এল রে বাবা!

প্রথমে সাইকেলের চাকা, হ্যাণ্ডেলে রিস্টওয়াচপরা একটা হাত, দরজার ভিতর এগিয়ে এল। পরক্ষণেই সুখেনের রোদপোড়া গনগনে লাল মুখটা ভেসে উঠল কবাটের ফাঁকে। লীলা মাথায় একটু কাপড় টেনে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে। সত্য শুয়ে থেকেই বলল, আয়।

লীলা টিউবেলের পাশে পেয়ারাতলায় সাইকেলটা রাখতে বলে উঠে এল। চাপা গলায় বলল, এবার উঠবে, না কী? তারপর রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

সত্য ওঠার আগেই সুখেন চলে এসেছে।···কীরে সতু, খুব যে গরজ দেখাচ্ছিস মনে হচ্ছে। গায়ে পড়ে এলাম বলে?

সত্য এবার লাফিয়ে উঠে ওকে জড়িয়ে ধরল।···আয়, বোস। এই গরমে কিচ্ছু ভালো লাগে না রে, চুপচাপ পড়ে আছি। শালা, কী গরম না পড়েছে ভাই! যাকগে, আজ দুবছর ধরে তোমাকে খোশামোদ করে আসছি, অ্যাদ্দিনে সময় হল আসবার?

লীলা বালতি হাতে টিউবেলের দিকে যাচ্ছিল। সুখেন তাকে শুনিয়ে বলল, দ্যাখ সতু—বিয়ে করেছিলি, তখন তো একবারটিও খবর পাইনি—নেমন্তন্ন করা তো দূরের কথা। কেন আসব, বল?

সত্য হেসে বলল, এখন যে এলি?

এলাম···সুখেনও একটু হেসে লীলাকে লক্ষ্য করে বলল, এলাম তোর সহধর্মিণীর আমন্ত্রণে। উনি না বললে, বিশ্বাস কর, কিছুতেই আসতাম না। তা সেদিন এলি কিসে? অত রাতে বাস পেয়েছিলি?

লীলা কলতলায় বালতিটা রেখে যেন কথা শুনছিল। বলল, বাস পাব কী? লাস্ট ট্রিপ ছাড়ে এগারোটায়। আপনার ওখান থেকে উঠলাম, তখন তো বারোটা বাজে।

সুখেন চমকে উঠে বলল, সর্বনাশ! বাস নেই জানলে তো ছেড়ে দিতাম না।

সত্য বলল, থাকতে দিতিস কোথায়? তোর ওই প্রেসঘরে? রক্ষে কর বাবা, এই গরমে···

সুখেন বলল, ফ্যান আছে। গরম লাগত না।

লীলা টিউবেলের হাতল থামিয়ে বলল, শঙ্করজ্যাঠার ওখানে যেতে বলেছিলাম। ও গেল না। তবে রিকশোয় দশ মাইল পথ রাত্রিবেলা বেশ ভালই লেগেছিল! ও তো ঘুমোতে ঘুমোতে এসেছে।

সুখেন চিমটি কেটে ফিসফিসিয়ে বলল, বাঃ, বৌর কোলে শুয়ে এলি তাহলে? কী কপাল রে!

সত্য জবাব দিল না। হঠাৎ সে সুখেনের মুখটা দেখছিল শান্ত চোখে। সুখেনের স্বাস্থ্যটা কিছুদিন থেকে ভাল দেখাচ্ছে। হয়ত প্রেস কেনবার পর থেকে সুখেন এতদিনে একটা মাটি পেয়েছে। ছিল অবশ্য একজন কম্পোজিটার—এখন নিজেই প্রেস কিনে মালিক হয়ে বসেছে। অবশ্য তার জন্যে কিছু টাকা দিতে হয়েছে সত্যকে। লীলাকে লুকিয়ে সত্য এটা দিয়েছিল।

লীলা বারান্দায় জলভরা বালতি রেখে বলল, নিন, হাতমুখ ধুয়ে ফেলুন। না কি চান করবেন?

সুখেন ভ্রূ কুঁচকে বলল, ওকি! আপনাকেই বুঝি সব করাচ্ছে সতুটা! তারপর সত্যর চিবুকে একটা মৃদু টোকা মেরে ফের বলল, এই যাঃ, মাইরি তুই ভীষণ বাজে। বেচারাকে একেবারে ঘানিতে জুড়ে রেখেছিস না কি রে! ছিঃ!

সত্য জিভ কেটে বলল, নাঃ। তুই অতিথি মানুষ। আমরা গেরস্থ। আমাদের বাড়ির মেয়েরাই এসব করে-টরে। তাছাড়া তুই জানিস নে, চুল দিয়ে অতিথির ভিজে পা মুছিয়ে দিতেও ওরা পারে।

লীলা কটাক্ষ হেনে মুখ ফেরাল। তারপর ঘরে ঢুকল। কাপড়টা বদলাতে গেল সে। শহুরে মানুষের সামনে নিজেকে হঠাৎ তার খুব হতশ্রী লাগছিল যেন।

ওরা দুজনে সিগ্রেট ধরিয়েছে। সত্য হুস হুস করে খানিকটা ধুঁয়ো ছেড়ে বলল, সিগ্রেট আমার পোষায় না, বিড়িই ভালো। তা হ্যাঁ রে সুখেন, এবার নিজের ছিল্লে তো বেশ একটা করে ফেললি। আমার একটা কিছু জুটিয়ে দে তো। মাইরি, বসে থেকে-থেকে শরীরে ঘুণ ধরে

যাচ্ছে একেবারে।

তুই আর কী করবি? ক'দিন বাদেই তো বাবা অঢেল সম্পত্তির মালিক হচ্ছ। তোমার এত ভাবনা কেন?

না রে। সে তো বৌ পাবে সব। আমার কী?'

সুখেন ওর পিঠে থাপ্পড় মারল।...শালা যখ!

তোর দিব্যি। দে না কিছু করে-টরে।

সত্যি বলছিস?

আমার চোখের দিব্যি, বিশ্বাস কর।

একটু যেন ভাবল সুখেন। তারপর বলল, প্রেস নিয়ে আমি ঝামেলায় পড়েছি। একা মানুষ, কোন্ দিক সামলাই। তেমন বিশ্বাসী কাকেও পাচ্ছিনে যে পুরোদমে কাজ চালাব। তা তুই যদি কিছু মনে না করিস, থাকবি আমার সঙ্গে?

সত্য ওর হাতটা লুফে নিয়ে বলল, আলবাৎ থাকব। তবে মাইনে দিবি কত?

সুখেন হাসল।...মাইনে কেন? তুই পার্টনার হিসেবে থাকবি।

আমার অত টাকাকড়ি নেই রে ভাই।

লীলা আলোচনাটা শুনছিল ঘরে দাঁড়িয়ে। শুনতে শুনতে আয়নার সামনে তার চিরুনীধরা হাতটা থেমে যাচ্ছিল বার বার। এবার দরজায় উঁকি মেরে সে বলল, টাকার ভাবনা তোমার নেই। সে আমি দেখব 'খন।

দুজনে হো হো করে হেসে উঠল। সুখেন বলল, ব্যস, আর কী চাই! শীগগীর তুই একদিন গিয়ে দেখা কর। চাই কি প্রেসের নামও বদলে দেব...

কী নাম দিবি শুনি?

সুখেন ঘরের দিকে কটাক্ষ করে জবাব দিল, লীলা প্রেস। কেমন হবে?

ঘরের ভিতর লুকিয়ে মুখে সামান্য একটু পাউডার ঘসে নিচ্ছিল লীলা। —বড্ড অসময় যদিও, স্নান করা বাকি আছে, খাওয়া হয়নি, রান্না আবার

চাপবে আরও দু-এক পদ—তা সত্ত্বেও তার হাতে এক অসচেতন বিহ্বলতা খেলা করছিল। সিনেমা দেখতে গিয়ে সে রাতে সুখেনের প্রেসে বসে যা সব আলাপ হয়েছিল, অবিকল বাজছে—যেন দূর মৃদু প্রতিধ্বনি। 'লীলা প্রেস' সে প্রতিধ্বনিকে আরও প্রসারিত করছিল। লীলার জীবনের উপর মুদ্রিত হচ্ছিল অজস্র কথা—যা সে পড়তে পারছে না।

বেরোল যখন, সত্য লক্ষ্য করল কিনা কে জানে, লীলার চোখ সুখেনের চোখে পড়ল। সুখেনের চাহনিতে একটা দুষ্টুমি ঝিলিক দিচ্ছিল—চোখের ভুলও হতে পারে। লীলা রান্নাঘরের দিকে ফিরতেই শুনল, সত্য চেঁচিয়ে উঠেছে সোল্লাসে।…আরে বাঃ বাঃ! ও লীলা, কী সব এনেছে দেখ তোমার জন্যে!

লীলা অবাক হয়ে গেল। এমন সুন্দর জিনিস অনেক দেখেছে বা ব্যবহার করেছে। কিন্তু এর মধ্যে কী একটা ছিল। খুব নতুন কিছু। ব্যাগ থেকে সুখেন প্যাকেটগুলো খুলে তক্তাপোষে রাখছে। শাড়ি, ব্লাউস, প্রসাধনী…একরাশ জিনিসপত্তর। সে ডাকছিল, বৌদি, দয়া করে এদিকে আসবেন একবারটি?

ওর হাতে একটা সোনার দুল ঝকমক করছে। ঠিক প্রজাপতির গড়ন। লীলা সলজ্জ হেসে এগিয়ে এল। বলল, এই জা! এসব কী এনেছেন! কেন আনলেন?

সুখেন মিষ্টি হাসল।··বিয়েতে তো খচ্চরটা নেমন্তন্ন করেনি। এগুলো আপনার পাওনা ছিল বৌদি।

সত্য ধমক দিল, বৌদি কিরে ব্যাটা? তুই তো আমার চেয়ে বয়সে বড়। তাছাড়া বারবার বিয়ের খোঁটা দিচ্ছিস, ওকে জিজ্ঞেস কর, হঠাৎ রাতারাতি বিয়ে এসে কাঁধে পড়লে। কোন্ দিক সামলাই। তোকে তো হাজার দিন সব কৈফিয়ৎ দিয়েছি বাবা, আবার কেন ওকথা?

সত্য কেমন প্রগলভ হয়ে উঠেছিল যেন। তাকে ভীষণ বাকপটু মনে হচ্ছিল। লীলার একটু অবাক লাগল। সে দুলটা হাতে নিতে সংকোচ বোধ করছিল। কিন্তু সুখেন এত বেপরোয়া—নাকি কিছুটা বেহায়াও, নিঃসঙ্কোচে বলে উঠল, আমি কিন্তু নিজের হাতে পরিয়ে দোব। এই

সত্য, তুই চোখ বুঁজে থাক্।

সুখেনটা এমনিই। সত্য জানে। সত্য চোখ বুঁজে বলল, ঠিক আছে বাবা, যা খুশী কর। বৌদি থেকে 'দি'টা তো বাদ দিতেও বলছি!

লীলা হেসেছে—তারপর চোখ বুঁজেছে। সুখেনের হাতটা অসম্ভব গরম—অথবা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, সে বুঝতে পারছে না। তার গালে অপরিচিত আঙুলের স্পর্শ—একটা নতুন স্বাদ। আর সে স্বাদ যেন··যেন বা বন্যার জলের মত—কিছুটা আঁশটে গন্ধে ভরা, হয়ত বা তেমনি ঘোলাটে, স্রোত আর ঘূর্ণীসঙ্কুল জলোচ্ছাসের সে সর্বনাশা স্পর্শ বন্যার দেশ রূপপুরের মেয়ে লীলার অচেনা নয়।

কিন্তু সে তো শুধু স্বাদ, শুধু স্পর্শ। পুরোপুরি বোঝবার আগেই কখন একটু করে তাকে উন্মুল করে ফেলছে, লীলা টের পাচ্ছিল না।

তা না হলে রাত্রের দিকে এ দারুণ বিপর্যয় ঘটে যেত না। লীলা আর বালিকা নয়। বোঝা উচিত ছিল। পারেনি।

কী করে যে দিনটা গেল লীলা বুঝতেও পারেনি। রাণীচক কুহকের দেশ হয়ে উঠেছিল তার অজ্ঞাতসারে। শহর থেকে এক জাদুকর এল যেন। তবে ছেলেবেলায় অনেক বন্যা লীলা দেখেছে। বাড়ির উঠোনেও কতবার জল উঠেছে। সে জল খুব ঘোলাটে। বড় আঁশটে গন্ধ আর কটু স্বাদ সে জলে। লীলা জানে। বন্যা তার খুবই পরিচিত। সে তাকে ভয় করতে শেখেনি। বরং ভালবাসতেই শিখেছিল। আকাশ কালো করে মেঘ এলে সে খুশী হত। বৃষ্টি পড়লে জানতে চাইত, এবার তেমনি করে উঠোনে জল আসবে কিনা। কিশোরী লীলা গ্রামের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সত্যি সত্যি সব-ভাসানো জলের আশায় অপেক্ষা করত। ভাসবে। সাঁতার কাটবে। মরার ভয় করবে না। আর তার এই মারাত্মক আকাঙ্ক্ষা দেখে গ্রামের লোকেরা বলত, বড়লোকের মেয়ে কিনা—সব কিছুই সাজে। পৃথিবী ভাসলেও ওর কী আসে যায়!

ভাসলে লীলার কিছু আসে-যায় না। সে তো ভাসতেই ভালবেসেছিল। তাই মধ্যরাতের ঘুমন্ত পৃথিবীতে বুকে ঘোলাটে জলের কটু স্বাদ আর গন্ধ নিতে চুপি চুপি চলে এসেছিল ঘর থেকে। কী দুঃসাহস

তার!

বাইশ বছর বয়সে নিজের এই নতুন সাহসের প্রতি অবাক হচ্ছিল সে। ঘরে সত্যচরণ একা শুয়ে আছে। সুখেন কখন তার পাশ থেকে উঠে গেছে। বাড়ির পিছনে ঘুরে গিয়ে লীলার মাথার কাছে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছে। জানালাটা খুলেই শুয়েছিল লীলা। এই গ্রীষ্মে জানালা খুলে না রেখে উপায় নেই। হঠাৎ চুলে টান পড়তেই সে চমকে উঠেছিল। ভয়ে চিৎকার করে বসত—ভাগ্যিস সুখেন সঙ্গে সঙ্গে ফিস-ফিসিয়ে ওঠে—আমি, আমি সুখেন। লীলার হাসি সুখেন দেখেনি। ফের ফিসফিস করে সে বলেছিল, বাইরে আসুন কথা আছে।

চুপিচুপি চলে এসেছিল লীলা। আর সুখেন তার হাত ধরে সামনে একটুকরো পোড়োজমি পেরিয়ে রাস্তায় নিয়ে গেল। তারপর যত দ্রুত বলা সম্ভব, অনেক—অনেক কথা বলছিল। যেন নিশির ডাকে ঘরছাড়া মানুষ কোথায় এসে দাঁড়িয়ে আছে! কোন কথা বোঝে না। শুধু কল্লোল শোনে।

ওর পরনে তখনও সুখেনের উপহারের শাড়ি আর—ব্রেসিয়ারটাও। গরমের জন্যে ব্লাউস মাথার কাছে খুলে রেখেছিল। মুখে সুখেনেরই দেওয়া স্নো-পাউডারের গন্ধ, চুলে ফুলের গন্ধ—সুখেন যা সব দিয়েছে। যদিও বিয়ের দুবছর পরে হঠাৎ এসে এই সব সুন্দর উপহার—বাসি বাসি লাগে, তবু দেওয়ার মানুষটির মধ্যে কী একটা ছিল, নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা যায়। এমনকি সত্যও বন্ধুর ওপর বেশ খুশী হয়েছে মনে হয়।

লীলা আঁশটে গন্ধেভরা ঘোলাটে জলে ভাসছিল। কিন্তু ভয় নয়, নিজের এই নির্বিকার আত্মসমর্পণটা লক্ষ্য করেই সে চমকে উঠছিল বারবার। যেন তার কিছু করার নেই, হঠাৎ সে স্রোতের মুখে দারুণ অসহায় হয়ে পড়েছে।

নাঃ, সে রাতে এতখানি হবে, লীলা কল্পনাও করেনি। মাত্র দু'একটা দিন বন্ধুর বাড়ি এসে বন্ধুর বৌকে এমন নিঃসঙ্কোচে দাবী জানাতে পারবে, লীলা সে-সাহসের এতটুকু চিহ্ন সুখেনের মুখে দেখেনি। সত্য বন্ধুর আপ্যায়নে রাণীচকের বাজার তোলপাড় করে ফেলছে, সেই অবসরে কত

কী অবাক কাণ্ড ঘটে গেল। রূপকথার রাজপুত্রকে সামনে দেখলেও লীলা এমন করে ছুটে যেত না! কী একটা আছে সুখেনের চেহারায়। কিছু আছে। জীবনের বাইশটে বছর যেন অনেকখানি আশ্বাসে প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

চলে আসতে-আসতে রাস্তার ওপর হঠাৎ কার টর্চ জ্বলে উঠেছিল। একঝলক আলোয় সুখেন ওখানে একা থমকে দাঁড়িয়েছিল। হয়ত কোন রোঁদের পুলিশ। হাইওয়েতে আজকাল রাতের দিকে ওরা ঘুরে বেড়ায়। পলকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত আগাছাভরা পোড়ো জমি পেরিয়ে এল লীলা।

খিড়কির ঘাট হয়ে আসতে লীলা একটু দেরী করেছিল। উঠোনে পা দিয়েই অন্ধকারে তার চোখ পড়েছিল বাইরের ঘরের দিকে। এদিকের দরজাটা যেন খোলা আছে। সত্য কি দরজা খোলা রেখে ঘুমোচ্ছিল?

দ্রুত নিজের ঘরের দরজা ঠেলে বেশ নিঃশব্দে, লীলা গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। তারপর বাইরের দিকে সত্য আর সুখেনের গলা শুনে সে উঠেছিল ফের। দরজাটা আটকে দিয়েছিল। দাঁতে দাঁত চেপে সে প্রতি মুহূর্তে প্রতীক্ষা করছিল, যেন বা কোথাও কোন বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

কিন্তু ঘটে নি। ঘটল না। গ্রীষ্ম গেলে বর্ষা এল। এতদিনে বৃষ্টি এল মরশুমী হাওয়ায় ভেসে। সবুজ হতে থাকল ঘাস গাছ মাঠ। হাইওয়ের দিকে তাকিয়ে লীলা ফের সুখেনের প্রতীক্ষা করছিল। সুখেনের অবশ্যি আর আসবার কথা না—এতদিনে সত্যরই যাওয়া উচিত ছিল—যায়নি। তবু লীলা সাহস পায় নি ওকে যেতে বলার। সত্য ক্রমশ কেমন ঝিম মেরে যাচ্ছে। রুগ্ন গাছের মত। কেন?

লীলা বুঝতে পারছিল না। সত্যর আচরণে লীলাকে ধরে ফেলার কোন আভাস তো দেখা যাচ্ছে না!

সেদিন সত্য ঘরে ছিল না। কোথায় বেরিয়েছিল ভোরবেলা—বলে যায়নি। দুপুর হয়ে এসেছিল, তবু তার ফেরার নাম নেই। লীলা সবে স্নান করে চুলে চিরুণী চালিয়ে জল ঝাড়ছে, বাইরে সাইকেলের ঘণ্টি। বুক ধড়াস করে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু না, এবার সুখেন নয়—তার

চিঠি।

ছাপাখানার লোক বলেই বুঝি এমন ঝকঝকে হরফে লিখতে পারে। আর লিখেছেও এত গুছিয়ে—লীলার বুঝতে আদৌ কষ্ট হল না। কবে প্রাইমারী পাস করেছিল, তারপর লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক খুবই কম। তবু চিঠি বলে কথা! ওটা মেয়েদের জন্মগত ক্ষমতা।

সুখেন লিখেছে: যদ্দুর জানি, এখনও রাণীচকের ধারে কাছে কোন কারখানা খোলেনি। তবু তুমি এলে না তো? ব্যাপার কী? এদিকে এই হাঙ্গামা নিয়ে বসে আছি। বিশ্বাসী একজন লোক খুব দরকার। অর্ডার খুঁজে বেড়াবো, না ছাপাখানা দেখবো? পত্রপাঠ চলে এসো।

শেষে এক লাইন মিষ্টি কথা: লীলা বৌদি কেমন আছে? তাঁর আদরযত্ন ভুলতে পারি না।

লীলার চোখে জল এসে গেল। কথাটার কত কী যে মানে হয়, জানে শুধু দুজন। পৃথিবীতে আর কেউ এখনও টের পায় নি। গোপন ক্ষতের উপর কোত্থেকে যেন এল চকিতে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ, জুড়িয়ে গেল সব জ্বালা।

চিঠিটা বারবার পড়ে এক সময় লীলার ধ্যান ভাঙল। সত্য এসে গেছে। সাইকেলটা উঠোনে লেবুগাছে ঠেস দিয়ে রাখছে।

লীলা চিঠিটা নিয়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে। বলল, তোমার বন্ধুর চিঠি। এবার আর না করো না। আজই একবার যাও—আমার দিব্যি। তোমায় টাকার জন্যে ভাবতে হবে না।

সত্য হাসিমুখে পড়ল চিঠি। তারপর বলল, কিন্তু আমার এদিকে গেরো বাধল যে!

কিসের গেরো?

হাটুবাবু একটা বোন মিল করবেন। আমাকে রাজ্যের ভাগাড় থেকে হাড় জোগাড় করে দিতে হবে।

লীলা ঘেন্নায় নাক কুঁচকে বলল, ছিঃ, ও তো মুদ্দোফরাসের কাজ!

সত্য খিলখিল করে হেসে বলল, আমি ওসব ভালই পারি। সীসের হরফ ছুঁলে বিষ ছোঁয়া হয়। তার চেয়ে···

লীলা নিভে গিয়ে বলল, তাহলে ও বেচারা কী করবে ?

সত্য বৌর মুখটা যেন খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল, ওর কাছে একবার যাবো অবিশ্যি। একটা মতলব খেলেছে মাথায়।

রুদ্ধশ্বাসে লীলা প্রশ্ন করল, কী মতলব ?

সত্য গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কাজকর্মের আলোচনায় এ গাম্ভীর্য তার হয়ত স্বাভাবিক, লীলার তা মনে হয়েছে। সে বলল, আচ্ছা লীলা, ওকে যদি বলি প্রেসটা এখানেই নিয়ে আসতে! রাণীচকের এদিকেও তো আজকাল অনেক ছাপার কাজের দরকার হয়। একচেটিয়া সুখেনই করবে সব! বাস রিকশোর ভাড়া দিয়ে লোকে কেন যাবে বহরমপুর—হাতের কাছে যদি ছাপাখানা থাকে ? কী বলো তুমি ?

উত্তেজনা চাপা রেখে লীলা জবাব দিল, খুব ভালো হবে।

কিন্তু সত্য যাই বলুক, সুখেন হয়ত আসবে না শহর ছেড়ে। অত সভ্যভব্য ছিমছাম মানুষ ; ধুলো কাদা মাড়াবার ভয়ে যারা পথের কিনারা ঘেঁসে পথ হাঁটে, জুতোশুদ্ধ পা ঠুকে ধুলোবালি ঝাড়া অভ্যেস যাদের, তারা ময়লা হবার জন্যে গ্রামে আসতে চাইবে কি ? লীলার অবাক লেগেছিল, পুরুষের গাল মেয়েদের গালের মত অমন চিকণ অমন তুলতুলে হয় কী করে ? সত্যর গাল যেমন ময়লা তেমনি শক্ত—সব সময় তেলতেলে হয়ে থাকে। কিন্তু সুখেন যেন আদৌ ঘামে না। আর সত্যর বুকটা চওড়া হলে কী হবে, আস্ত ভালুকের মত রোমে ভরতি। সুখেনের বুক এত পরিষ্কার। সত্যর মত আত্মগোপন করে সে থাকে না। সূর্যের আলোর মত সহজ সুখেন। আর সত্য যেন একটা অন্ধকার রাত্রি—অভিসন্ধি আর ষড়যন্ত্রে ভরা সে।

পরদিন সত্য সাইকেল চেপে শহরে চলে গেলে সে অস্থির হয়ে ঘরবার করছিল সারাটি দিন। কেবল ঘুরে ফিরে দুটি মানুষের তুলনা করছিল সে।

সত্য ফিরেছিল বেশ রাত করে। দারুণ ভিজেছে বৃষ্টিতে। বাসে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু সুখবর এনেছে শেষ অব্দি। সুখেন নাকি আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে বলেছে। তবে খুব তাড়াতাড়ি পারবে

না—কিছুদিন গুছিয়ে নিতে হবে। তারপর পাড়ি দেবে রাণীচক। সত্যকে এখন তার ভীষণ দরকার। সত্য জানাল।

মুখ টিপে লীলা হাসল। সত্যর ভেজা জামা নিঙড়ে শুকোতে দিচ্ছিল বারান্দার তারে। বলল, কিন্তু কাদা মাখতে পারবেন তো সুখেনবাবু?

সত্য থুথু ফেলে বলল, কাদা কোথায়? বাজারের ওদিকেও তো পীচ পড়েছে রাস্তায়। সন্টুবাবুর আড়তের পাশে একটা বড় ঘর খালি পড়ে আছে। ও ঘরটার জন্যেই কথা বলব ভাবছি। ওখানে ইলেকট্রিও পাওয়া যাবে।

সত্যচরণ সত্যি সত্যি নিতান্ত ভালমানুষ। লীলা উত্তেজনা দাঁত দিয়ে চাপল। তারপর বলল, জানো—অবেলায় বিষ্টি বাড়লে ভেবেছিলাম, আজ আর ফিরছ না তুমি। থেকে যাবে বন্ধুর বাড়ি। তখন আমার রাত কাটানো সে এক জ্বালা হয়ে যেত। উঃ মাগো!

লীলা চোখ বুজে শিউরোল।

দেখে সত্য বলল, সুখেনের বাড়ি বলতে কিছু আছে নাকি? ও চিরকালই চালচুলো-ছাড়া ছেলে। আমায় আজ সব বলেছে ওর কথা। এর-ওর বাড়ি থেকে-টেকে এত বড়টি হয়েছে। আমার যখন আলাপ, তখন ও সবে কম্পোজিটারের কাজ শিখছে। প্রেসেই শুয়ে থাকে বিছানাপত্তর নিয়ে। শেষে একদিন কিছু টাইপ চুরি গেলে ওর কাঁধেই দোষ পড়ল। তখন গিয়ে জুটল একটা রেডিওর দোকানে। আশ্চর্যের কথা, সেখানেও একই ব্যাপার ঘটেছিল।

লীলা চমকে উঠে বলল, চুরি?

সত্য বিড়ি জ্বালছিল। মুখ তুলতেই কাঠিটা নিভে গেল। ফের না জেলে সে জবাব দিল,—হ্যাঁ চুরি। যাই হোক, সেখান থেকে আরেক জায়গা…এমনি করে এতদিনে একটা মাটি পেয়েছে বেচারা। সত্যি, ওকে চোর ভাবা অসম্ভব। ও খুবই সৎ ছেলে। তোমার কী মনে হয়?

লীলা কোন মন্তব্য করল না। তার মনটা হঠাৎ স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছিল কী কারণে।

সত্য বলতে থাকল।…আর তাছাড়া ভীষণ উদ্যমী। খাটতে পারে

গাধার মত। বাপস্, অমন হলে আমি তো এক মহাজন হয়ে উঠতাম অ্যাদ্দিনে। কারণ, ওর যা ছিল না বা নেই, আমার তা আছে।

আনমনে লীলা বলল, কী আছে তোমার?

মিষ্টি হাসল সত্য। বলল, তোমার মত বৌ, আর শাশুড়ির অঢেল সম্পত্তি।

থামো, খুব হয়েছে।

সে রাতে ঘুম হল না লীলার।

খুব ভোরে উঠে সত্য যখন কোথায় বেরিয়ে গেছে, লীলা পটের ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলেছিল, ও আর যাই হোক, যেন চোরছ্যাঁচড় না হয়।

স্নান করতে অনেকটা সময় নিল সে। পরিপাটি সাজল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। ওদিকে বৃষ্টি ঝরার বিরাম নেই সারা দুপুর। আকাশের মেঘে যেমন অকৃপণ অনাবিল দানের আয়োজন, লীলাও তেমনি একটা আয়োজনের মাঝে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে চাচ্ছিল। সেই সময় ভিজতে ভিজতে সত্য ফিরল।

সত্য একটা খবর এনেছিল সঙ্গে। গত রাতে লীলার মা মারা গেছে।

দুই

একটু ভূমিকা আছে।

রূপপুর ওখান থেকে পাঁচ মাইলের কাছাকাছি। কিন্তু রাণীচকের পাশে আছে হাইওয়ে, রাণীচক বাজার জায়গা। সময়ের আলোয় সে রাঙা। ওদিকে রূপপুর বিলখাল জলজঙ্গলের আদিম পৃথিবীতে ভিন্ন আলোর রঙে রাঙা—সে-রঙ গাছের কোটরে যেসব ধূসর পাখির বাসা, তাদের মত কিছু বিবর্ণ, কিছু অমসৃণ মনে হয়।

লীলা ওই রূপপুরের মেয়ে।

রূপপুরে চাষাভুষো জেলে-বাগ্দীদেরই বসবাস বেশি। তাদের মধ্যে দুচার-ঘর ভদ্রলোক কোন পুরুষে এসে জুটেছিল হঠাৎ। কিছু বামুন

আর একঘর কায়স্থ। বোঝা যায় বামুন ভদ্রলোকেরা এসেছিলেন যজমানের ভক্তির টানে। কিন্তু লীলার ঠাকুর্দার বাবা?

রামকান্ত ঘোষমশাই ছিলেন আসলে গোমস্তা। রাণীচকের জমিদার তাঁকে স্নেহের দান যা দিয়েছিলেন, চতুর গোমস্তা অর্জন করেছিলেন তার তিন চার গুণ বেশি।

তিন পুরুষে সে বিশাল সম্পত্তির যতখানি টিঁকে ছিল, এ যুগে হেসেখেলে সেজেগুজে দিন কাটানোর পক্ষে তা অপর্যাপ্ত।

মজার কথা, এ তিন পুরুষে একটির বেশি সন্তান কারুর বাঁচেনি। অবিশ্যি পুত্রসন্তান তারা। কেবল প্রাণকান্তের বেলায় টিঁকে গেল একটি মেয়ে। লীলা। লীলার জন্মের পরই প্রাণকান্ত মারা যান। চারপাশে সরল চাষাভূষো মানুষ—রূপপুর একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত; সুতরাং লীলার মা কুমুদিনীর পক্ষে যথেষ্ট সম্পত্তি রাখার বিপদ ছিল না।

সচরাচর এসব ক্ষেত্রে অবশ্য লীলার সঙ্গে যার বিয়ে হবে, তার ঘরজামাই হবার কথা। কিন্তু তা হয়নি। সত্যচরণ প্রাণকান্তের বন্ধুর ছেলে। সেজন্যেও নয়। এটা একরকম লীলার নিজের জেদ—সত্যকে ঘরজামাই হতে হয়নি। উপযুক্ত পাত্রের খোঁজে দিন চলে যাচ্ছিল লীলার। কুমুদিনী বড় খুঁতখুতে মেয়ে। তাছাড়া লীলা যে জলজঙ্গলের পরিবেশে মানুষ তাতে তার মধ্যে বেড়ে উঠেছিল একটা উদ্দাম স্বাধীনতার বোধ। বামুন পরিবারের সুবাদে একটা পাঠশালাও চলছিল রূপপুরে। লীলা সেখানে লেখাপড়া শিখছিল। কিন্তু প্রায়ই তাকে খুঁজে আনতে হয়েছে দূর খড়ের বনে বা জলার পাশ থেকে—বাগ্দী মেয়েদের সঙ্গে সারা গায়ে কাদা মেখে ঘুরছে। একেবারে গেছো মেয়ে যাকে বলে—যেমন দুরন্ত, তেমনি বন্য। তার স্বাধীনতার বোধকে কুমুদিনী ক্রমশ ভয় করতে শিখেছিল। একদিন তো লীলা বন-করবীর বিষাক্ত ফল খেয়ে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করতে বসেছিল! রাণীচকে হাসপাতাল না থাকলে কী হত বলা যায় না। আর একদিন···

রঘুপণ্ডিতমশাই ঘাসের বনে গাড়ু হাতে কুকর্ম করতে বসেছেন, মাথার ওপর মস্তো শেওড়াগাছ। কিন্তু যেখানেই বসছেন পরক্ষণে উঠে

পড়তে হচ্ছে বেচারাকে—চারপাশ থেকে ছুটে আসছে দলে দলে ছিনে জোঁক—এ অঞ্চলের যা বৈশিষ্ট্য।

পণ্ডিতমশাই যাচ্ছেতাই গালাগালি করেছিলেন জোঁকগুলোকে। পরিশেষে তাঁর পিতৃপুরুষদেরও একচোট নিলেন, কারণ কী সুখে তাঁরা এ বুনো দেশে বসতি করেছিলেন এসে কে জানে!

হঠাৎ মাথার উপর খিলখিল করে হাসি। পেত্নী নাকি? শিউরে উঠে রঘুপণ্ডিত উপরের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন।

হ্যাঁ, পেত্নীই। আলুথালু চুল, অগোছাল কাপড়, ফুলোফুলো গাল, রাঙা চোখ—অথচ দারুণ হাসির ঘটা হাততালি দিয়ে।

পরক্ষণে পণ্ডিতমশাইও হাসলেন।…অ্যাঁ, লীলারাণী! আরে, তুই গাছের মধ্যে কী করছিস? কী সর্বনাশ!

আঠারো বছরের দুরন্ত যৌবন সেদিন মনের কী একটা দুঃখে শেওড়া গাছ থেকে মৃত্যুর গলা জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল। রঘুপণ্ডিত বিচক্ষণ মানুষ। টের পেতে দেরী হয়নি। লীলারাণীর মাথার উপরের ডালে বাঁধা দড়িটি তাঁর চোখ এড়ায়নি।

কুমুদিনীর কাছে অবিশ্যি কথাটা বলেননি তিনি। বলেও কোন লাভ হত না। কুমুদিনী মেয়ের সম্পর্কে আর মাথা ঘামাতে চাইত না। জমির ফসল আর টাকাকড়ি তাকে ক্রমশ যেন এক অন্ধকার বিবরে পৌঁছে দিয়েছিল। সেখানে বসে পেটের মেয়েকেও তার বড় অচেনা মনে হত।

পণ্ডিত বলেছিলেন, আর দেরী কোরো না কুমুদ। অবিলম্বে মেয়েকে পাত্রস্থ করো। একটি ভাল পাত্র আমার সন্ধানে আছে। বাপের অবস্থা একসময় ভালোই ছিল, এখন অবিশ্যি তদ্রূপ নেই। তবে…

কুমুদিনী বলেছিল, কে?

মহিমের ছেলে।

কোন্ মহিম?

কেন, রাণীচকের মহিম! প্রাণের বন্ধু মহিমের কথা মনে পড়ছে না তোমার?

ও। কুমুদিনী বলেছিল। বেশ তো আপনি ব্যবস্থা করুন। তবে আগে মেয়েকে শুধোন।

পণ্ডিত অবাক হননি। লীলাকে তাঁর বেশ চেনা আছে। জনান্তিকে ডেকে লীলাকে বলেছিলেন—হ্যাঁ রে মা, একটা কথা বলছিলাম···

লীলা ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল, ও আমি জানি। বিয়ের কথা তো?

রঘুপণ্ডিত শাস্ত্রে এবং জীবনে যা জানতেন, নারীর মন দেবতাদেরও অগোচর। লীলা খুব সহজেই মত দিয়েছিল।···কিন্তু রক্ষে করো বাবা, ঘরজামাই-টামাই চাইনে। এ ছন্নছাড়া জঙ্গল থেকে পালাতে পারলে বাঁচি!

বিয়ে হয়ে গেল।

তারপর কিন্তু একেবারে বদলে গেল লীলা। সে-লীলা আর এ-লীলায় তফাৎ আকাশ-পাতাল। শালবনের দুরন্ত পাহাড়ী নদীটি সমতল পৃথিবীর সভ্য পরিবেশে এসে শান্ত হয়ে উঠল—নিশ্চল গভীরতা তার অস্তিত্বে ছিল ভিন্ন এক লাবণ্য।

পুরনো লীলার কথা সত্যচরণ কিছু জানে। ও সব নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। পৃথিবীর কোন কিছুতেই তার মাথাব্যথা নেই। খায়দায় নাকডাকিয়ে ঘুমোয়। বরং বিয়ে করার পর সে ক্রমশ আরও আলসে হয়ে উঠেছিল।

মধ্যে মধ্যে লীলা বলেছে তাকে রূপপুরে শাশুড়ির কাছে যেতে। বলেছে, একা মানুষ, বয়স হয়েছে মার। দেখাশোনা করার মত নিজের লোক নেই। তুমি যোগাযোগটা রাখো।

সত্য বলেছে, আর তুমি?

আমি? লীলা একটু হেসেছে। বলেছে, আমি কী করব? রূপপুরে যেতে আমার ভাল লাগে না। বছরে একবার লক্ষ্মীপুজোর সময় যাই, ওই যথেষ্ট।

সত্য জানে, শাশুড়ি মারা গেলে লীলা অঢেল সম্পত্তির মালিক হবে। এ জানাটার বিশেষ তাৎপর্য নেই তার কাছে। যেমন করে সে নিজের ঘরবাড়িকে জানে, মাঠঘাট চেনে, চেনে মাথার ওপর আকাশকে—

তেমনি জানার বেশি কিছু নয় মোটে। লীলার অনেক টাকা হবে। হবে তো হবে তাতে মাথা ঘামানোর কী আছে? কী আছে নানারকম স্বপ্ন দেখার? সত্যর কাছে এটা একটা নিশ্চিন্ত স্বাভাবিকতা। আর মধ্যে-মাঝে কোন রাতে লীলা যখন ওকে জড়িয়ে ধরে থেকেছে, হঠাৎ চমকে উঠে সত্য ভেবেছে, আরে তাইতো! আমি একটা মেয়ের কাছে শুয়ে আছি!

যেন খাবার সামনে রেখে অন্যমনস্ক হয়েছিল। সত্য তখন গোগ্রাসে গপ গপ করে খাওয়ার মত হুটোপুটি ব্যস্ততায় লীলার দেহের দিকে হাত বাড়িয়েছে।

নিতান্ত আহার না করে উপায় নেই—অন্তত একবারও শরীরে না কিছু নিলে নয়, সেইরকম।

লীলা যেন সেটা বুঝতে পেরেছে। তার উপর ঝুঁকে, অন্ধকারে তার চোখ খুঁজে বলেছে—আমাকে তোমার ভালো লাগে না, তাই না?

সত্য অকপটে বলেছে—আরে, কী বলছ? ভালো লাগে না মানে? প্রায় পাগল হয়ে যাই।

লীলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুয়েছে। শরীর ফিরিয়ে থেকেছে অন্যদিকে। সত্যর কী ভালো লাগে, কিসের আনন্দে সে পাগল হয়, তা যেন ঝিলিক দিয়ে উঠেছে মনের আবছায়ায়। ক্ষোভে দুঃখে রাগে সে মনে মনে ছটফট করেছে। উঃ, একটা নিতান্ত জানোয়ার নিয়ে তার ঘর করা।

নাকি উদরসর্বস্ব শিশু? যে সর্বক্ষণ খেলায় বিভোল থাকে, খেতে ডাকলে কিছুক্ষণের মত খেলা ভুলে যায় মাত্র? যতক্ষণ খায়, প্রাণভরেই খায়—কোন ফাঁকি নেই তাতে। এবং তাই যেন মাঝে মাঝে বড় মমতায় লীলা আপ্লুত হয়ে ওঠে। তার মনে হয়, সে নিজেও যেন কী অপরাধ করে চলেছে—কোথাও কী ভাবে বড় ফাঁকি দিচ্ছে নিজের সংসারকে নিজের স্বামীকে।

সাবিত্রীর মত অনুগামিনী হতে লীলা পারে না। কারণ যমকেই খুঁজে পায় না সে, সাবিত্রী যেমন পেয়েছিল। আর সে মরণপণ সহনশীলতা সে সাধনার শক্তি—যা বুঝি মাতাপিতাগুরুর আশীর্বাদেই

মেয়েরা চিরদিন লাভ করে, লীলার কি তা আছে ?

বড় জোর কুমুদিনী বলেছিল, স্বামীকে মাথায় রাখতে হয় মেয়েদের। জীবনে একবার মাত্র এসেছিল জামাইবাড়ি। গত চৈত্রে। যাবার সময় বলে গিয়েছিল, সতু খুব ছেলেমানুষ এখনও—বুঝেসুজে চলিস। ওর যেমন কেউ নেই তুই ছাড়া, আমারও তাই। তবে আমার আর ক'দিন বাছা ? ইচ্ছে ছিল তোকে···

ইচ্ছেটা হঠাৎ চোখের জলে চাপা পড়েছিল। লীলা অবাক হয়েছিল কিন্তু। কুমুদিনী—তার মা, তাহলে কাঁদতেও জানে ? তারও চোখে জল নামে একটা পদার্থ আছে ? হাড়কিপটে দজ্জাল বদমেজাজী কুমুদিনীর ভয়ে সারা রূপপুর তটস্থ থেকেছে।

কিন্তু কী ইচ্ছে ছিল তার মেয়ের জন্য ? আর কোনদিন জানার উপায় রইল না।

নাকি এতদিনে জানা গেল ! মেয়ে-জামাইকে কাছে রাখতেই বুঝি চেয়েছিল কুমুদিনী।

রূপপুরে বেশ কিছুদিন কাটাতে হল ওদের। সেই সময় যা ঘটবার তা ঘটে গেল।

ধানের মরাই, গোয়ালভরা গোরু-বাছুর, পুকুরভরা মাছ—তাছাড়া আম-কাঁঠাল-নারকেলের বাগানও আছে কয়েকটা। কীভাবে এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করেছিল কুমুদিনী, কে জানে। সত্য যেমন, তেমনি লীলা যেন অথৈ সমুদ্রে গিয়ে ভাসছিল।

কিন্তু মেয়েদের যেন কী আছে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে লীলা রীতিমত দ্বিতীয় কুমুদিনী সাজবার চেষ্টা করছিল। প্রথমেই সে রাতদুপুরে কুমুদিনীর ঘরের দোর বন্ধ করে একটা শাবল হাতে নিয়েছিল। সত্যকে বলেছিল, মেঝেটা খুঁড়তে হবে।

সত্য অবাক। কেন ?

মা নগদ টাকা-পয়সাগুলো নিশ্চয় এখানে পুঁতেছে।

সত্য মাথা চুলকে বলেছিল, তাই তো !

তাইতো-টাইতো রাখো দিকি। লীলা ধমকাল। পুঁতে না রাখলে

গেল কোথায় ?

সত্য বলল, ভারী আশ্চর্য মানুষ ! অমন কঠিন অসুখে পড়েছেন, তা খবরও দিলেন না একবারটি।

লীলা চোখ পাকিয়ে বলল, খবর দিলে তুমি যেন বাঁচাতে ! নাও, এসো, শাবল নাও। নয়তো আমি নিজেই……

রক্ষে করো। সত্য শাবলটা নিয়ে এলোমেলো খুঁড়তে থাকল মেঝে। কঠিন কংক্রিটে বিচ্ছিরি শব্দ উঠছিল রাতদুপুরে। এক সময় হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, অসম্ভব ! এ মেঝেয় কিছু পোঁতা থাকতেই পারে না। তুমি লোহার আলমারিটা খুঁজেছ ভাল করে ?

খুঁজেছি।

কিছু নেই ?

একগাদা অলঙ্কার আছে। হয়ত বন্ধকী জিনিস।

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে সত্য বলল, সিন্দুক দেখেছ ?

লীলা চিন্তিত মুখে বলল, সিন্দুক তো দলিল-দস্তাবেজে ভরতি আছে।

সত্য ওর হাত ধরে টানল। চল, খুঁজে দেখি।

দুটো মস্ত সিন্দুকভরতি রাজ্যের পুরনো কাগজপত্র, কিছু বিবর্ণ পোশাক-আসাক—তারপর একটা হাতবাক্স মিলল। রুদ্ধশ্বাসে উত্তেজনা চেপে চাবির গোছা খুঁজে চাবি মিলিয়ে অবশেষে খুলতে পারল সেটা।

নাঃ, চোখধাঁধান যখলাগা গুপ্তধনের জেল্লা কোথায় ? হাজারখানেক রূপোর টাকা। মোহর আছে গোটা আষ্টেক। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে ইতিমধ্যে আরও গোটা তিনেক মিলেছিল। কিন্তু গেল কোথায় নোটের বাণ্ডিল ! সব দরজার চাবি ছিল হরু কৈবর্তের হাতে। হরু ওদের আদ্দিকালের চাকর। চাকর নয় ঠিক—যাকে বলে সরকার। যেখানে-যেখানে খবর দেবার, সেই দিয়েছিল যথাসময়ে। লীলা রাগে ফেটে পড়ল। ওই হতচ্ছাড়া লোকটাই সর্বনাশ করেছে তাহলে। কেন সে মায়ের অসুখের খবর দেয় নি ? বেশ বোঝা যাচ্ছে, ওই পাপিষ্ঠ ডাকাতটার একটা কুমতলব ছিল এর পেছনে।

সকালে হরুকে তলব করল লীলা। হরু সাদা থানের ফতুয়া গায়ে

কাঁধে গামছা আর হাতে রূপোর পাতবাঁধান তেলচকচকে লাঠি হাতে প্রণাম ঠুকল এসে। তার দু চোখে জল। লীলা কিছু বলবার আগেই সে কেঁদে ফেলল ভেউ ভেউ করে।···আহা, মরবার সময়ও হাত ধরে মিনতি করলাম, মাঠাকরুণ, দিদিকে একবারটি নিয়ে আসি। হুকুম হলেই তিন রাত্তিরের পথ চক্ষের পলকে উড়ে যাবে লোক। তা, মা আমার কথাটি কইলেন না গো। যদি বা কইলেন, বললেন—থাক। আমি বাঁচব।···মাথা নেড়ে শোক সামলে হরু ফের বলল, বুঝতে পারেন নি, বুঝলেন গো দিদি, আদতে বুঝতেই পারেন নি শমন শিয়রে দাঁড়িয়েছে। কপালে করাঘাত করে থামল হরু।

সেই একই কথা বারবার। একই ভাষা। লীলা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। শুধু বলল, আচ্ছা হরুদা, টাকা-পয়সা তো কিছুই পাচ্ছি না কোথাও। তোমাকে কিছু বলে যায় নি?

তীব্রভাবে মাথা নেড়ে হরু ফের আগের কথাগুলো আওড়ে গেল যথারীতি। গতিক দেখে সত্য বলল, ছেড়ে দাও। যা হবার হয়েছে। যা আছে এই যথেষ্ট।

সত্য পালাবার পথ খুঁজছিল যেন। বাপস, যার কিছু নেই সে ভাল আছে। ধনসম্পদ রাখা কি কম ঝক্কিকার! সর্বক্ষণ ভয়-ভাবনা উদ্বেগে তটস্থ হয়ে থাকো—খেতে-শুতে সুখ নেই, নিশ্চিন্ত ঘুমুনো যায় না। শুধু সতর্ক থাকা আর পাহারা দেওয়া। রক্ষে করো বাবা।

সত্য ভাবছিল, এর কোন মানে হয় না। যারা লেখাপড়া শিখে চাকরি করে তারা একরকম সুখেই আছে বলতে হয়। সে সুযোগ পেলে একটা চাকরিই খুঁজে নেবে বরং। ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দেওয়া হয়নি। তাতে ক্ষতি নেই। হাটুকাকা বেঁচেবর্তে থাকলে মিলেই যাবে একটা।

সত্যর মনে হয়, একটা সুদিন তার জীবনে আসছে। সে লীলার ধনসম্পদের দিকে আশান্বিত নয়। তার সুদিন হাটুবাবুর কারখানাকে কেন্দ্র করেই আসবে যেন।

কিন্তু ওদিকে সুখেন যদি সত্যি সত্যি রাণীচকে ছাপাখানা খোলে···

লাফিয়ে উঠেছিল সত্য। লীলাকে বলেছিল, শোন। সুখেনের খবর

নিলে হত একবার। আমরা যে এখানে রয়েছি ও জানে না।

লীলা তখনই অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তাই তো! সুখেন···সুখেনকে সে ভুলে গিয়েছিল। আঃ, এ ভুলের দুঃখ ঢাকবার সান্ত্বনা নেই। সে বলল, হ্যাঁ গো, তুমিও ওর সঙ্গে ছাপাখানা চালাবে? খুব বড় ছাপাখানা! যত টাকা লাগে, আমি দেব। তুমি আজই একবার যাও বহরমপুর। ওকে বলে এস।

লীলা আরও বলল, বরং রাণীচকে কেন, ওখানেই চালাবে ছাপাখানা। পাড়াগাঁয়ে আবার ওসব চলে নাকি! আর জানো, পাড়াগাঁয়ে আমার থাকতেই ইচ্ছে করছে না আর। ওকে বলো, ওখানে বাড়িটারি পাওয়া যায় নাকি, দেখে দিক।

সত্য সব শুনে বলল, তারপর কী করবে? এখানের জমিজমা কে দেখবে? তাছাড়া রাণীচকে আমারও তো পৈতৃক কিছু রয়েছে!

লীলা বলল, বেচে দিলেও চলবে।

সত্য আঁতকে উঠে বলল, সর্বনাশ! একেবারে মূলশুদ্ধ উপড়ে যাবার মতলব?

লীলা কোন জবাব দিল না কথাটার।

একটু ভেবে নিয়ে সত্য বলল, তা মন্দ বলনি। আমার এ-সব ঝঞ্ঝাট সত্যি বলতে কি, মোটেও সয় না—সে তো তুমি ভালই জান লীলা। খুব বেঁচে যাব, সত্যি। টাকা যা পাব ব্যাঙ্কে জমা রাখব। ব্যবসা আশা করি ভালই চলবে। লেখাপড়া আজকাল যত বাড়ছে, ছাপার কাজও তত বাড়ছে। সুখেন ঠিক পথই ধরেছে।

রাণীচক থেকে আসবার সময় সাইকেলটা আনা হয় নি। গোরুর গাড়ি চেপে এসেছিল দুজনে। সুতরাং ফের গোরুর গাড়ির আয়োজন করা যেত অন্তত রাণীচক অব্দি। কিন্তু সত্য পায়ে হেঁটেই গেল। মোটে মাইল পাঁচেক মেঠো পথ। বর্ষায় জলকাদা হবে ভীষণ। তবু হাঁটতেই ভাল লাগল তার।

সত্য আরও কিছুক্ষণ ভাবতে চেয়েছিল। কারণ তিন মাস ধরে যা

গঁজিয়েছে, তার একটা বিহিত করা দরকার।

পাঁচ মাইল জলকাদার পথে সেটা অবশ্য তার মত মানুষের পক্ষে বেশ কঠিন ব্যাপার। বারবার জুতো খুলে হাতে নেওয়া, কাপড় সামলানো, পিছলে আছাড় খাবার ভয়—পথটা তাকে একবারও ভাববার সময় দিচ্ছিল না।

সামনে একটা খাল পড়ে। তার ওপরে থেকে মাঠ ক্রমশ উঁচু হয়ে মিশেছে দিগন্তে। তার ওদিকে রাণীচক। ইটভাঁটার চিমনিটা অস্পষ্ট দেখা যায়।

খালটা পেরিয়ে ওপারে একটা বটগাছ। তার গুঁড়িতে বসল সত্য। বেশ ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল সে। বিড়ি জ্বেলে টানতে থাকল।

কী করতে যাচ্ছে সে? লীলাকে পরীক্ষা করতে চায় একবার? নিজের দৃষ্টির সত্যাসত্য বিচার করতে চায়?

...সুখেনকে বিয়ের সময় নেমন্তন্ন করা হয় নি। খুব তাড়াহুড়ো বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। মা-বাবা নেই—আছে শুধু দিদি। অনেক দূরের এক গ্রামে তার বিয়ে হয়েছে। সেই মাথার উপর থেকে সব সামলে নিয়েছিল।

তারপর সুখেনকে নেমন্তন্ন করার কথাটা যেন ভুলেই গিয়েছিল সে। দুটি বছর ধরে বহুবার সুখেনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, সুখেন বলেছে—কই সতু, তোর বউ দেখালি নে? লীলাকে নিয়ে কতবার সিনেমা দেখতে গেছে সে—তবু সুখেনের ওদিকে যাওয়া হয় নি। সুখেনকে—সুখেনের চোখ দুটোকে কেমন অবিশ্বাসী কেমন যেন ভীতিজনক মনে হত তার। যেন এড়িয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল লীলাকে।

লীলার চোখেও একটা কিছু নিশ্চিত ছিল। আছে একটা কিছু ভীতিপ্রদ। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। গা শিরশির করে।

শেষ অব্দি সুখেনই জেদ করে চলে এসেছিল ওর বাড়ি।

সে রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সত্যর। সুখেনের পাশেই সে শুয়েছিল বাইরের ঘরে। অমরের বোন কুন্তীকে ডেকে এনে লীলা শুয়েছিল নিজের ঘরে।

সত্য দেখেছিল, সুখেন তার পাশে নেই। হয়ত বাইরে বেরিয়েছে পেচ্ছাব করতে—কিন্তু এত দেরী হচ্ছে কেন? বালিশের পাশে টর্চটা নেই। পায়খানা গেল নাকি? খাওয়া-দাওয়া বেশ জোর হয়েছে। সুতরাং এ কর্মও স্বাভাবিক।

বিয়ের পর স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরী হয়েছে বাড়িতে। টিউবওয়েল বসানোর ইচ্ছে ছিল—তাও হয়েছে অবশেষে। সত্য বিড়ি জ্বেলে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জ্যোৎস্নার রাত। তবে আকাশে কিছু মেঘ ছিল। কাকজ্যোৎস্না যাকে বলে।

ল্যাট্রিনটা আছে বাড়ির ভিতরের অংশে। সত্য দাঁড়িয়েছিল। বাইরের দিকের বারান্দায়। হঠাৎ তার মনে হল সামনের হাইওয়ের উপর ছুটো ছায়ামূর্তি। সে বারান্দা থেকে নেমে ডেকেছিল—কে?

আমি। ভারী গলায় সাড়া এসেছিল সুখেনের।

ওখানে কি করছিস?

পায়খানা পেয়েছিল।

কাছে এলে সত্য বলেছিল, আমাকে ডাকলেই পারতিস। বাড়িতে ল্যাট্রিন থাকতে মাঠে কেন? আজকাল সাপখোপ বেরোয় বড্ড।

টর্চ জ্বেলে সুখেন বলেছিল, আলো নিয়েছি সঙ্গে।

হাত থেকে টর্চটা নিয়ে সত্য চারপাশে যেন অকারণ আলোর ঝলক ছড়িয়ে দিচ্ছিল এলোমেলো। সুখেন সেটা কেড়ে নিয়ে বলেছিল, পুকুরঘাটে যাব। পথ দেখিয়ে দে।

…ছায়ামূর্তি একটা ছিল, না ছুটো?

নাঃ, চোখের ভুল। একটাই। আরেকটা বুঝি তার ছায়া—যখন মেঘ সরে জ্যোৎস্না ফুটেছিল মুহূর্তকাল।

ঘাটের পথ দেখিয়ে সত্য লীলার ঘরের দিকে চলে এসেছিল। দরজা ভেতর থেকে যথারীতি বন্ধ। চুপচাপ ফের দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরিয়েছিল সে। আর জ্বলন্ত কাঠিটা দরজার সামনে পড়বার সময়—ফের যেন চোখের ভুল, সত্য দেখেছিল—ভেজা পায়ের ছাপ, তখনও জল চকচক করছে।

আবছায়ায় ঢাকা বারান্দায় হঠাৎ ঝুঁকে সেই পায়ের ছাপের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে হাতটা তুলে নিয়েছিল সত্য। যেন কী নোংরা ছুঁতে যাচ্ছিল সে।

শেষে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল। পায়ের তলায় পায়ের জল নিঃশব্দে কী কৈফিয়ৎ দিল, সে বুঝতে পারে নি। কিছু বুঝি বলতে চাইছিল। কিছু পুরনো কথা—যা বার বার নতুন হয়ে ফোটে।

বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছিল। চেষ্টা করেও আর ঘুমোতে পারে নি। লীলা বড়লোকের মেয়ে—তার মত গরীব মানুষের গলায় তাকে ঝুলিয়ে দেবার সাধ হল কেন ওদের—সত্য তবু স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না। নাকি বুঝেছিল? এই দু-তিন মাস সে যেন যাত্রাদলের রাজা সেজে কাটিয়েছে রঙকরা মুখ নিয়ে।

তারপর সন্ধ্যায় সত্য ফিরে আসছিল রূপপুরের দিকে। পশ্চিমের আকাশে ঘন মেঘের স্তবক এত উজ্জ্বল লাল হয়ে উঠেছে—যেন বলির মুণ্ডুকাটা এক দল মোষ। কোথাও কালো, কোথাও সিঁদুরে, কোথাও খুনখারাপি রঙ। বড় বীভৎস আর ভয়ঙ্কর লাগে দেখতে। আর দিনের শেষে সবুজ গাছপালার গায়ে ধোঁওয়ার মত কুয়াশার ঘননীল আচ্ছন্নতা জমেছে। দূরে ও কাছে ব্যাঙ ডাকছিল। সোনাগদি ডাকছিল অদ্ভুত শব্দ করে। শেষ পাখির ঝাঁক ফিরে যাচ্ছিল বাঁশবনের দিকে। কোথাও কোন লোক নেই। জমিগুলো জলে ভরে আছে। এবার চাষবাস ভালই হবে।

চাষবাসের কথা সত্য কোনদিন ভাবে না, যদিও তার কিছু সামান্য জমি আছে। কিন্তু বৃষ্টি হলে সে চাষাদের মতই খুশি হয়। মাঠের সীমান্তে গিয়ে দাঁড়ায়। দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে।

আজ সে অন্যরকম চোখে দেখছিল তার চারপাশের পৃথিবীকে। ওই রক্তাক্ত মেঘের বীভৎসতা, পচা মাটির আঁশটে গন্ধ—আর চারপাশে ক্রমশ অন্ধকার নেমে আসছে, যেন বড় সর্বনেশে এক আড়াল তুলে দেওয়া হচ্ছে। কেমন গা ছমছম করছিল তার। পারবে তো শেষ অব্দি?

লীলা একদল মেয়েকে নিয়ে জমিয়ে রেখেছিল উঠোন। সত্যকে বাড়ি ঢুকতে দেখে সে গ্রাহ্য করল-না। একবার মুখ তুলে দেখেই ফের জের টানল। এ লীলা রূপপুরের লীলা।

সত্য টিউবওয়েলের কাছে গেল। নিবিষ্ট মনে হাত-পা ধুল। গায়ের জামা খুলে ফেলল। তারপর বারান্দায় চেয়ার টেনে বসল। সুখেনের কাছে যাওয়া হয় নি, কেন হয় নি—তার কৈফিয়ৎটা যা দেবে, তা ফের শানাচ্ছিল মনে মনে। সুযোগ খুঁজছিল সে। বোমাটা তাতাচ্ছিল।

ঘণ্টার মা একে একে হেরিকেনগুলো জ্বেলে দিয়ে গেল। হরু একবার এসে এদিক-ওদিক ঘুরে, সত্যর দিকে চেয়ে প্রণাম করে, ফের বেরিয়ে গেল কোথাও। রাখাল ছেলেটি গোয়ালে গোরু বেঁধে এসে রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়েছিল। বাসিনী ঝি তার হাতের তেলোয় তেল ঢেলে দিয়ে বলল, গোয়ালে ধুঁয়ো বেশি করে দিস নে কেন রে? মশার কামড়ে ওরা সারা রাত ছটফট করে।

রাখালটা বলল, ছটফট করে তুমি বুঝি শুনতে পাও? ঘুমোও তো ব্যাঙের মত নাক ডাকিয়ে।

ব্যাঙের তুলনা দিলে অভ্যাসমত একটা হইচই বাঁধবার কথা। কিন্তু বাসিনীর মেজাজ আজকাল নরম। গিন্নীঠাকরুণের শোক এখনও সামলে উঠতে পারে নি কিংবা নতুন গিন্নী লীলারাণীর আমলে অনেক বেশি অধিকার মিলেছে। বাসিনীর হাতে ভাঁড়ারঘরের চাবি। বাসিনী আজকাল বড় বেশি পান খাচ্ছে। ঠোঁট দুটো পিকে প্যাচপেচে সব সময়। আর ওর কাপড়ের যা ছিরি হয়েছে পানের ছোপে! এমন কি বালিশটারও। মুখে পান রেখে রাত কাটাচ্ছে বাসিনী। নগদ পয়সা-কড়ির সুবিধে নেই—পানদোক্তা আনতে ক'মুঠো চাল অনায়াসে খরচ করতে পারে। তিলেপাড়ার ওদিকে বরজ আছে পানের। মকু শেখ মাথায় ঝাঁকা নিয়ে উঠোনেই ঢুকতে অভ্যস্ত চিরদিন। আগে স্বয়ং কুমুদিনীর মাপা চালে পান কেনা যেত। এখন তো লীলারাণীর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বাসিনী ইচ্ছেমত কেনে।

তাই বাসিনীর—শুধু বাসিনীর কেন, চাকর-বাকর অন্যান্য

লোকজনদের সবারই সুখ। সাধে কি আর ঘণ্টার মা বুড়ো গিন্নীর জন্যে চোখের জলটা মুছে শ্বাস টেনে বলে, আহা, এ্যাদ্দিনে এ বাড়িতে সূয্যির আলো এল গো!

তবে একটা ব্যাপার থেকে গেল। টিঁকল।

যে রাজ্যে পুরুষ নেই, মেয়েরাই কর্ত্রী, তার নাম ছিল প্রমীলা রাজ্য। ওরা ভেবেছিল মুনিব বদল হয়ে এবার পুরুষের রাজা হবার কথা। জামাই সত্যচরণ কেমন লোক হবে কে জানে। কিন্তু শেষ অব্দি দেখা গেল, লীলারাণীই রাণী। সত্যচরণ রাজা হতে পারল না। হয়ত ইচ্ছে নেই, নয়ত বৌ'র কেনা চাকর। ওই ঘণ্টার মত।

এ বাড়ির চাকর পুরুষগুলো বড় অদ্ভুত। বাড়ি ঢোকে নিঃশব্দে। মুখ খোলে কম। পুতুলের মত এদিকে-ওদিকে কী সব করে বেড়ায়—সেটা সত্যি সত্যি কোন কাজ, না কিছু খুঁজে বেড়ানো—বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা মুশকিল। যেমন এসেছিল, তেমনি চলে যায়। চোখ তুলে তাকালে মনে হয়······যা মনে হয়, তা ঝিরা মুখ ফুটে নিঃসংকোচে বলে।···বলদ! বলে, তখন থেকে বলছি কথাটা, বুঝতেই পারে না বলদটা। আর বাসিনী তো বাঘিনীর মত হাঁকরায়, বলি ওরে বল্‌দা, ওরে মুখপোড়া, রাধু কবরেজের বাড়ি গিয়েছিলি?

কথাটা ঘণ্টাকে বলা। ঘণ্টা একটা গরিলার মত মানুষ। কালচে চামড়া গায়ের, ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুল, থ্যাবড়া নাক—তার ওপর হাত দুটো বেজায় লম্বা। যখন হেঁটে যায়, মাটিতে ধুপ ধুপ শব্দ ওঠে।

আঁতুরঘর থেকে ওকে শেয়ালে চুরি করেছিল নাকি। ঘণ্টার মা বলে, তখন এ রূপপুর আরও জঙ্গুলে গেরাম ছিল। ঘরের চারপাশে বনবাদাড়। আঁতুড়ের গা-লাগা বাঁশের বন আর নাটা ঝোপ। শেয়ালেরা দোষ নেই বাছারা!...তবে কথাটা হচ্ছে কি না, বোঝলেন গো জামাইদাদা, মা-ভগবতীই এসেছিলেন আদতে।

মা ভগবতীর কী উদ্দেশ্য ছিল কে জানে, ঘণ্টার কাজ গোয়ালে দুধ দোহাবার—সে মা ভগবতীদের গোপনে যা শোষণ করে, তাতে গায়ে কাঁটা দিত নাকি কুমুদিনীর। স্বয়ং কুমুদিনী দরজায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। তবু

ঘণ্টা চিমসে পেট নিয়ে গোয়ালে ঢুকে বেরিয়ে আসবার সময় পেটকে ঢাক করে ফেলেছে! গাভীর তলপেটের নীচে দৃষ্টি পৌঁছানো সহজ কথা নয় কুমুদিনীর পক্ষে। কারুর পক্ষেই নয়।

তাই ঘণ্টার স্বাস্থ্যটি অসম্ভব ভালো। আর এখন তার বিশেষ সুদিন এসে গেছে। এ সংসার এখন তার কাছে সুখের সংসার।

আর লীলার কাছে?

পায়ের কাছে হেরিকেন জ্বলছিল। সত্য লীলার নতুন সংসারকে খুঁটিয়ে দেখবার বা জানবার চেষ্টা করছিল। কাকেও ধাক্কা দিতে হলে তার দাঁড়ানোর জায়গাটাও বুঝে নিতে হয়। পড়ে যাবে, না সামলে নেবে, পরখ করতে হয়।

নাঃ, পড়ে যাবে না লীলা। ওর আশেপাশে কোন গহ্বর নেই। শুধু ঝাঁকুনি লেগে হয়ত বা বিরক্ত হবে মাত্র; নয়ত সরে যাবে একটু তফাতে। পাল্টা আক্রমণ করতেও পিছপা হবে না।

সত্য ভীষণ ঘামছিল।

কী অদ্ভুত আচরণ লীলার। লোকটা যে জলকাদা ভেঙে এতখানি ক্লান্তি নিয়ে বাড়ি ঢুকল, তার দিকে এতটুকু লক্ষ্য নেই। বামুনবাড়ির মেয়ে লতা শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরেছে, একশো মুখে সেখানের গল্প করে চলেছে, লীলা হাঁ করে শুনছে। বাড়িভরা ভাশুর-দেওর-ননদ লতার। শ্বশুর রেলে চাকরি করেন। খুড়োশ্বশুর ব্যবসা করছেন। স্বামী এখনও বেকার—তবে শীগগীর বাবার পাশে ওই রেলেই কাজ পেয়ে যাবার আশা আছে।...তদ্দিন, লতা বলছিল, তদ্দিন অবিশ্যি একটু হেনস্থা সয়ে থাকতেই হবে।

লতা লীলার চেয়ে সুন্দর। হেরিকেনের আলোয় ওর মুখটা দেখা যাচ্ছিল। হার চিকচিক করছিল গলায়। লীলা ইতিমধ্যে হারটা একবার হাতে নেড়ে দেখে নিয়েছে। বলেছে, ভরি-দুই সোনা হবে। নাকি?

লতা বলেছে, কে জানে। আচ্ছা লীলাদি, আপনি কিছু পরেন না কেন?

লীলা হাসছিল। জবাব দেয় নি।

সত্যর সংসারে লীলা দারুণ সেজেগুজে থাকত। সব সময় গা ভরতি গয়না, মুখে প্রসাধন, সিঁথিভরা সিঁদুর, ঝকঝকে শাড়ি। পান থেকে চুন খসে নি। আর রূপপুরে এসে যেন বা মায়ের শোকে এত শৈথিল্য তার সাজসজ্জায়!

আসলে সময় পায় না। পাচ্ছে না এখনও। সংসারটা গুছিয়ে হাতের মুঠোয় আনতে দেরী আছে কিছু।

সত্যর এই ধারণা।

এতক্ষণে লীলা উঠল। মেয়েগুলো কিলবিল করে চলে গেল। সত্য তখন অন্য একটা কথা ভাবছিল। লীলা ইচ্ছে করে লতার সঙ্গে (অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গেও) আলাপ করিয়ে দিতে পারত। যত পাড়াগাঁ হোক, এটুকু সচরাচর ঘটে থাকে। প্রথাও আছে। লীলা কিন্তু কোনদিনই করে নি। এমন কি বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলার সময়ও নয়। লীলা কি সত্যকে অন্য মেয়ের ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিতে চায় না? তার মানে লীলা তাকে যথার্থ ভালবাসে?

আপন মনে খিক-খিক করে হেসে ফেলল সত্য।

লীলা পাশে এসে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে বলল, বাব্বাঃ! সব ছিনে জোঁকের মত সেই বিকেল থেকে লেগেছিল। ছাড়বার নাম নেই!

এটা নিছক কৈফিয়ৎ! সত্য বুঝতে পেরে হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বলল, আমি এসেছি ঠিক সওয়া সাতটায়। এখন সাড়ে আট।

ইতিমধ্যে রূপপুরে প্রগাঢ় অন্ধকার নেমেছে। ঝিঁঝি ডাকছে। তক্ষক ডাকছে। ব্যাঙ ডাকছে। উঠোনের এক কোণে চাকর-মুনিশদের পাত পড়েছে। ও বারান্দায় হেরিকেন ঝুলিয়ে দিয়েছে ঘণ্টার মা। বাসিনীই ভাত বাড়ছে। বাইরের লোকের জন্যে যা রাঁধতে হয়, সেই রাঁধে। মনিবদের অন্ন মনিবরা নিজেই প্রস্তুত করেন। এই আদ্যিকালের প্রথা। ভিতরে-বাইরে উনুনও সেজন্যে পৃথক আছে।

কিন্তু যা ভেবেছিল সত্য, লীলা সুখেনের কথা জিজ্ঞেস করবে, করল না মোটেও। হয়ত এ এক লীলা লীলারাণীর। এ-লীলা সে গত দু-তিনটি মাস খেলছে হয়ত। কোনদিনই যেচে পড়ে সুখেনের কথা তো জিজ্ঞেস

করেনি।

লীলা বলল, রান্না করিনি। শরীর ভাল নেই। একটু দুধ খেলেই চলে যাবে আমার। তুমি ?

সত্য নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিল, খেয়ে এসেছি।

লীলা একটু হাসল। সে তো বন্ধুর বাড়ি খাওয়া দুপুরবেলা। এখন কি আর তা পেটে আছে ? বরং লক্ষ্মীটি ··লীলা একটু ঘন হয়ে দাঁড়াল কাছে···বরং চিড়ে আর দুধ খেয়ে নাও রাতটুকু। এখানে এসে কী যে হয়েছে, রান্নাবান্না একটুও ভাল লাগে না।

কথাটা অক্ষরে-অক্ষরে ঠিক নয়! আজ লীলাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। আলস্যের আভাস ওর সর্বাঙ্গে। কিছু কি ঘটেছে সত্যর যাবার পর ? সত্য বলল, ঠিক আছে। সে যা হয় করা যাবে। তুমি যা খাবে, খেয়ে এস। জরুরী কথা আছে।

পাগল! লীলা বলল!···তুমি খাবে না, আমি খাবো কী ?

লোকগুলো চলে না গেলে বোমা ফাটানো যাবে না। অবশ্য বাসিনী ওদিকের ঘরে শোবে। ঘণ্টার মা বাড়ি চলে যাবে। কেবল ঘণ্টা শোবে সদর দরজার লাগোয়া খুপরিটায়। বাইরের ঘরে—যেখানে অতিথি অভ্যাগতদের থাকবার ব্যবস্থা আছে, সেখানে হরু শোয়।

তাহলেও কোন অসুবিধে নেই সত্যর পক্ষে। কেউ শোনে তো শুনবে। রূপপুরের সঙ্গে যখন সম্পর্ক ছেদ করার মতলব, তখন ওসব শোনাশুনি জানাজানি গ্রাহ্যও করে না সত্য। তাছাড়া, তাতে যদি লীলার কলঙ্ক রটে তো রটুক। সেও একটা বড় শাস্তি।

তবু ঈষৎ দ্বিধা লাগে। মনে হয়, একটা সুন্দর শান্ত অব্যাহত সংসারযাত্রা নাড়া দিতে চলেছে সে। বরং নিঃশব্দে চলে যাওয়াই ভালো ছিল না কি ?

সত্য বলল, আমি খাবো না।

লীলা হাত ধরে টানল এবার। কেন ? রাগ করেছ এতক্ষণ আসিনি বলে ? দেখ, অবুঝের মত কথা বলো না। বাড়িভরা মেয়েরা রয়েছে, তুমি আসামাত্র ওদের ফেলে চলে আসব—ওরা সব কী ভাববে বল তো ?

আর, এ বাড়ি ঘর-সংসার আমার না তোমার ? বাড়ির মালিক বাড়ি আসবে। ঝি-চাকরকে হুকুম করবে। না তো পরের মত চুপচাপ বসে থাকা। কী মানুষ তুমি!

কত লীলা জানো তুমি লীলারাণী! সত্য মনে মনে বলল। জবাব দিল না লীলার কথার।

লীলা বলল, কই, ওঠো। ছিঃ, ওরা কী ভাববে!

এবার সত্য একটু গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে কিছু জরুরী কথা আছে। ঘরে চল আগে।

হেরিকেনের আলোয় লীলার মুখটা হঠাৎ কেমন থমথমে হয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। ভ্রূ কুঁচকে সে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত সত্যর চোখের দিকে—নিষ্পলক। তারপর সেই চমক সামলে নিয়ে হেসে ফেলল সে। বলল, এমনভাবে বললে যে গা শিউরে উঠেছে শুনে। না জানি কী সাংঘাতিক কথা যেন। সুখেনবাবুর ব্যাপার তো?

সত্য ঘাড় নাড়ল।

বেশ তো। সে বিছানায় শুয়ে শুনব। তবে একটা কথা—তুমি যাবার পর আমার কিন্তু অন্য রকম ইচ্ছে হয়ে গেছে। ওঠো, খেয়ে নেবে আগে। তারপর সব বলব।

সত্য মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সুখেনের কাছে যাই নি।

লীলা কিন্তু মোটেও চমকাল না। বলল, ভালো করেছ। কিন্তু ছিলে কোথায় সারাটা দিন? ··আর তাহলে খাওয়াও নিশ্চয় জোটে নি। কী অদ্ভুত মানুষ!

বলেই সত্যকে আর কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে সে হনহন করে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ওখান থেকে তার গলা শোনা গেল—বাসিনী, একটু পরে খাবে তুমি। ভাঁড়ারঘর খোল দিকি।···

সেকেলে বিরাট পালঙ্কে শুয়ে কখন চোখ ভরে ঘুম নেমেছিল সত্যর। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বৃষ্টি পড়ছে অবিরলধারায়। মুখের উপর হেরিকেন ধরে দাঁড়িয়ে আছে লীলা। বৃষ্টিভেজা কাপড়-চোপড়, মুখে মুঠির ঝোঁটা, কিছু চুলও ভিজেছে—অবিশ্যি পিঠের দিকে একটা গামছা

চাপানো আছে। লীলা তাকে ডাকছিল।

সত্য উঠে বসল ধুড়মুড় করে।

লীলা বলল, চল। রান্না হয়ে গেছে। আলুভাতে করেছি। ঘি মাখিয়ে খাবে। রাতদুপুরে আর কী করব বলো!

সত্য হঠাৎ ওর হাতটা ধরল। একটু ঝুঁকে, বদ্ধোন্মাদ মানুষের মত লাল কোটরগত চোখ, তীব্র চাহনি, কাঁপানো ঠোঁট—সে কী একটা বলবার চেষ্টা করল এবং সেই সময় বাইরে একটা তীব্র চিৎকার—সম্ভবত ঘণ্টার কণ্ঠস্বর, চোর চোর···! হরুর গলাও শোনা যাচ্ছিল। বাসিনী ঘণ্টার মা—ওদিকে জনাকয় অন্য গ্রামের মজুর মরশুমী চাষাবাদের জন্যে এ-বাড়ি আশ্রয় নিয়েছে, তারাও—এত প্রচণ্ড হট্টগোল শুরু করেছে যে সত্যকে লাফ দিয়ে নামতে হল বিছানা থেকে।

গ্রামের লোক জাগতে দেরী হয় নি। কিন্তু চোরের পাত্তা নেই। ঘণ্টা দিব্যি কেটে বলল, আমি দেখেছি স্বচক্ষে। পাঁচিল বেয়ে উঠেছিল।

হয়ত চোর। হয়ত চোখের ভুল।

লীলা বলল, যাই হোক, এবার শীগগীর একটা বন্দুকের জন্য দরখাস্ত করো। যে জংলী গ্রাম, চোর-ডাকাতে কেটে রেখে যাবে কোনদিন।

হরু শাসাচ্ছিল ঘণ্টাকে। শালা মামদোটার এক বিচ্ছিরি অভ্যেস। যখন তখন রাতদুপুরে চেঁচামেচি করবে। দিলে সুখের ঘুমটা নষ্ট করে।

শেষে জানা গেল, ঘণ্টা এর আগেও অনেকবার এমন করেছে। রাখালের সেই পালে বাঘ পড়ার গল্প একেবারে। শেষ অব্দি সত্যি সত্যি চোর-ডাকাত এলে তখন হয়ত কেউ এদিকে ছুটে আসবে না।

না আসুক। লীলা ফের বলল। একটা বন্দুক হলেই চলবে আমাদের। কালই তুমি ব্যবস্থা করো।

সত্য জবাব দিল না।

ঘণ্টার মা ওদিকে হরুকে বোঝাচ্ছে, বাছার আসলে ওটা স্বপ্নদোষ, বুঝলে হরুদা?

বাসিনী লীলার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। লীলা বাসিনীকে লুকিয়ে সত্যর দিকে চোখ টিপে হাসছিল। স্বপ্নদোষের কথায় নির্দোষ হাসি।

সত্যর মন সেদিকে নেই। চোর-কাণ্ডের সমারোহ শেষ হলে সে ফের মূল ভাবনায় চলে গেছে। ব্যাটা চোরও যেন নিয়তির হাতের যন্ত্র। মুখের কথা ফুটতে দিল না।

বাসিনী জামাইবাবুকে শুনিয়েই ফিসফিস করে অন্য একটা কথা বলছিল। ঘণ্টার মায়ের সম্পর্কে। মদন নাপিতের সঙ্গে ওর একটা পুরনো 'নটাঘটা' রয়েছে। ঘণ্টাও নাকি সেটা জানে। ওঁৎ পেতে পড়ে থাকে ছোঁড়া। আর মদনের যখন যাবার সময় হয়, তখনই চেঁচিয়ে ওঠে। বাসিনী বলছিল, ছ' চক্কের কিরে, আমি দেখেছি বারবার। বলি নে কাকেও। এ্যাদ্দিনে বললাম। তা ছোঁড়াটার মজা দেখ দিদিঠাকরান, এটা একটা মস্করা নয় ? বলো তুমি !

লীলা বলল না। সরে এল ওখান থেকে। সত্যকে ডাকল, চলো। নাকি এ বারান্দায় পাত পেড়ে দিই। থাক্, আর কাদায় নেমে কাজ নেই।

সত্য গোঁ ধরে বলল, কিন্তু আমি বলেছি তো, খাবো না কিছু।

কী বলছ যা-তা। লীলা কাঁদোকাঁদো মুখে বলল। এতক্ষণ রান্না করলাম...

তুমি খেয়ে নাও।

লক্ষ্মীটি, এবারের মত ক্ষমা করো—যদি কোন দোষ করে থাকি।

সত্য স্থির দাঁড়িয়ে বলল, লীলা, কেলেঙ্কারী করো না। আমার ক্ষিদে নেই।

তুমি সারাদিন কিছু খাও নি। ক্ষিদে আবার নেই ?

শরীর খারাপ। খেতে ইচ্ছে নেই।

বাসিনী একটা কিছু অনুমান করছিল অদূরে দাঁড়িয়ে। এবার বলল, শরীর খারাপ থাকলে তো তাই বটে জামাইদাদা। তবে দিদিঠাকরানকে উপোস করাবেন কেন ? একমুঠো মুখে দিয়ে নিন।

সত্য বলল, তা কেন ? ও খাক না।

জিভ কেটে বাসিনী বলল, এ মা। সে কি হয় নাকি গো ?

সত্য জবাব দিল, যদি আমার ওলাওঠা হয় তো ও কী করবে ?

এরা ছুটিতে জবাব শুনে কাঠ। পরক্ষণে সত্য হনহন করে গিয়ে ঘরে ঢুকেছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর বাসিনী চাপা স্বরে বলল, কী হয়েছে? ঝগড়া করেছ নাকি?

লীলা জবাব দিল না। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর রান্নাঘরের শেকল তুলে দিয়ে নিঃশব্দে চলে এল উঠোন পেরিয়ে।

সত্য বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে বিড়ি টানছিল। লীলা দরজা বন্ধ করে মেঝেয় ধুপ করে শুয়ে পড়ল। সত্য উঠে বলল, নীচে কেন? তোমার খাটপালঙ্ক পড়ে রয়েছে, নীচে শোবার কী দরকার?

জবাব না পেয়ে উঠে এল সে। দু'হাতে লীলাকে তুলে বিছানায় এনে শুইয়ে দিল। বলল, যে কথা বলতে বাধা পড়ে, সেকথা বলতে নেই। তাই বলতেও আমি চাই নে। কিন্তু তুমি কি এখানেই থাকবার মতলব করেছ নাকি? রাণীচক যাবে না?

লীলা উপুড় হয়ে শুল। জবাব দিল না. স্পষ্টত সে কাঁদছিল। কাঁদা স্বাভাবিক তো বটেই।

সত্য বলল, তাহলে আমি?

তোমার খুশি।

ও। আচ্ছা।

দ্রুত আলনা থেকে জামাটা নিয়ে পরল সত্য। বালিশের নীচেটা খুঁজে ঘড়ি বের করে হাতে বাঁধল। রুমাল জড়াতেও ভুলল না। বাকসোয় তার কিছু কাপড়-চোপড় আছে—লীলারও আছে। বলল, বাকসোর চাবি দাও! কাপড় নোবো।

নিঃশব্দে চাবি ছুঁড়ে দিল লীলা আঁচল থেকে খুলে।

পারল? সত্য চমকে উঠছিল প্রতি মুহূর্তে। ভেবেছিল স্বামী-স্ত্রীর জীবনে একটা চরম জায়গা থাকে, থাকে একটা চরম সময়—যখন উভয় পক্ষই নড়ে ওঠে। আঘাতে বেদনায় জর্জর হয়ে শেষে ফের একাকার হয়ে ওঠে।

হল না।

ক্ষিপ্র হাতে কাপড় বের করতে গিয়ে হঠাৎ ক্ষেপে গেল সত্য। থাক্। কী হবে।

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে। লীলা মুখ তুলেও দেখল না। আর বৃষ্টি ঝরছিল ঝিরঝির করে। আকাশ কালো হয়ে ছিল মেঘে। ঝিঁঝি ডাকছিল। তক্ষক ডাকছিল। ব্যাঙ ডাকছিল। অন্ধকার রূপপুরের কাদায় ভরা পিছল পথে টলতে টলতে সত্য রাণীচকের দিকে এগোল।

তিন

সুতরাং যা ঘটবার ঘটে গেল বলতে হয়।

আর রাণীচকে ফিরে সত্য নিজের মুখেই এত সব রটিয়েছে যে ভাবতে অবাক লাগে। ওরা বেচারা সত্যর মত ভালোমানুষ পেয়ে একটা ছেনাল গছিয়ে দিয়েছিল। তাই তো! নতুবা অমন বড় ঘর, অত জোতজমা—একমাত্তর কন্যারত্ন,—তাকে কিনা মহিমের ছেলের মত পাত্রে সমর্পণ, যার কুঁড়েমিরও তুলনা নেই আর গেরস্থালির ক্ষেত্রে যাকে বলে—'ভাঁড়ে মা ভবানী'!

তবে সত্যচরণ ভীষণ বোকা। লোকে তার বোকামির জন্য জনান্তিকে গালমন্দ করছিল। বউ ছেনাল তো হয়েছে কী। অমন সম্পত্তি ধনসম্পদ পায়ে ঠেলে পালিয়ে আসে কাপুরুষের মত? ছেনাল বউ শায়েস্তা করা খুব একটা কঠিন কাজ বলে লোকে মনে করে না। অহল্যাদের পাথর করা খুব কঠিন কাজ কি?

হাটুবাবু প্রায় মারতে আসেন আর কি! হ্যাঁরে হারামজাদা, গলায় দড়ি জোটে না তোর? তুই না ভদ্রসন্তান, লেখাপড়া জানিস?

সত্য বোকার মত তাকাল শুধু।

ঠিক আছে। হাটুবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, আমার সঙ্গে আজই চল সদরে।

সত্য ফের হাঁ করে তাকাল।

ঠুকে দিয়ে আসি চল্ এক নম্বর। আদালত থেকে পেয়াদা পাঠিয়ে দেবে, মাগীর চুলের মুঠি ধরে রেখে যাবে তোর বাড়ি।

নলিনাক্ষ সম্পর্কে সত্যর জ্ঞাতিভাই। সে জিভ কেটে বলল, ছিঃ হাটুকা, হাজার হোক, ভদ্রলোকের বাড়ির বউঝি।···

তুই থাম্ তো নলেন। হাটুবাবু গর্জালেন। ভদ্দরলোক! আজকাল ভদ্দরলোক কোথায় আছে রে! যা না গঙ্গা পেরিয়ে বহরমপুর। দেখে আয় ভদ্দরলোকের ভদ্দর মেয়েদের পোশাক-আসাক কথার ছিরি। এ হল কলির শেষ পা। অঘাট ঘাট হচ্ছে, ঘাট হচ্ছে অঘাট। জাত-বেজাত মানামানি নেই, বামুন-শুদ্দুর এক ঘাটে জল খাচ্ছে। যে গেলাসে তুই চা খাচ্ছিস, সেই গেলাসে আধ মিনিট আগে মোছলমানে মুখ দিয়ে গেছে। অতএব···

এ সব তুলকালাম ও শলাপরামর্শ সামলে নিতে দেরী হল না সত্যর। এমন কি লোকজন নিয়ে গিয়ে জোর করে লীলাকে ধরে (অবশ্যি রাত্রিকালে) আনবার চেষ্টাও সে করল না। অবশেষে হাইওয়ের পাশে বাজারের এক প্রান্তে একটা চায়ের দোকান খুলে বসল।

বন্ধু বান্ধব সত্যর বরাবর কম ছিল। এ সুযোগে কিন্তু তাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে গেল। তারা প্রথম-প্রথম এসে ঠাট্টা করত—কী রে সতু, ব্যাটা কায়েতের পো, কলম ঠুকে প্যাঁচ পয়জার করবি, তা নয় শেষে গেলাসে ছাক্‌নী ঠুকছিস। শালা মরেছে রে!

সত্য শুধু হাসে নিঃশব্দে।

বিয়েতে তো অনেক টাকা পেয়েছিলি, কী হল সেগুলো? একটা বড়সড় ব্যবসা তো অনায়াসেই খুলতে পারতিস সতু।

সত্য রহস্যময় ভঙ্গীতে তাকিয়ে থাকে।

কত পেয়েছিলি যেন, দশ হাজার না কত?

সত্য আঙুল দিয়ে দেখায় নিঃশব্দে। সাত হাজার।

কী হল সে টাকা?

সত্য শুধু বলে, আছে।

টাকার অঙ্ক অবশ্যি এখন অত নেই। হাজার চারে ঠেকেছে।

শয়তান সুখেনকে ধার দিয়েছিল বার কয়। প্রায় হাজার দুইয়ের বেশী—সঠিক মনে নেই এখন। লীলাকে লুকিয়ে দিয়েছিল। নোটবইতেও টোকা নেই। বাকী হাজারখানেক দু বছরে খরচ করেছে নিজের কাজে। এ সব ব্যাপারে লীলা কখনও মাথা ঘামায় নি। আসলে, সত্যর মনে হয়—ও তো সংসারী মেয়ে ছিল না। ওর মন ছিল অন্যদিকে।

চায়ের দোকান খুলতেও সামান্য কিছু টাকা তুলতে হয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে। সখের দোকান। কিন্তু সব থাকতে, এই বাজে কারবারে কেন তার এত ঝোঁক পড়ে গেল, সত্য নিজেই বোঝে নি। শুধু বুঝতে পারে, বেশ লাগে। চারপাশে চেনাঅচেনা মানুষের আড্ডা। ভিড়ের মধ্যে দিনটা ভালই কাটে। কত গল্প শোনে—কত সব বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে পারে—সেটা জানা হয়। এ ছাড়া আর কী?

যাতায়াতের পথে মানুষ একবার এসে বসে যায়। কত নতুন মুখ! হাইওয়েতে আজকাল কত গাড়ির আনাগোনা হয়। কোনটা সামনের মেহগিনি গাছের ছায়ায় থেমে যায়। বেরিয়ে আসে সুন্দরী মেয়েরা। অপ্সরাদের মত। কী নিটোল নগ্ন বাহু, মনোরম চাহনি, উজ্জ্বল গ্রীবা। পাছার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সত্য। মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত মনে পড়ে যায় লীলার দেহের কথা। হয়তো এমন সাজলে, নগর-বাসিনী হলে, লীলা এদের চেয়েও সুন্দরী হত!

আর লীলাও তো ইচ্ছে করলে এখন শহরে বাড়ি করতে পারে। কিনতেও পারে এমন একটা সবুজ রঙের মোটরগাড়ি। তারপর ধরা যাক, মেসেঞ্জোর বাঁধ দেখতে বা দূর পাহাড় অঞ্চলে তার কোমরের ব্যথা সারাতে যেতে পারে রুদ্রেশ্বরের থানে—সেই গাড়ি চেপে তার নরম গদীতে বসে থাকতেও পারে শয়তান সুখেনটা। হয়তো সত্যকে দেখেছিল আসতে আসতে—থামাল গাড়ি। নামল। জুতোর শব্দে কাঁপল পীচের পথ। বুক কি কাঁপবে না সত্যর? ·হুম! লীলার কী কেনার আছে এখানে?···ঘাড় ঘুরিয়ে খোঁজে সত্য। আছে, আছে। সুখেনের জন্যে সিগ্রেট। কিম্বা গাড়ির জন্যে পেট্রোল। কী তরঙ্গ তুলে হাঁটছে লীলা!···আঃ আঃ!

যেন লীলার সেই ব্যথাটার মত ব্যথা নাভির নীচে। সত্য আনমনে ককায়, আঃ আঃ!

বুলু বলে, কী হল মামা? পেট ব্যথা?

মাথা নাড়ে সত্য।

তুমি শুয়ে পড় বেঞ্চে। নাকি বাড়ি যাবে? বুলু এগিয়ে আসে। আমি বসছি মামা।

চা করতে পারবি?

খুব পারব।

তাই বস্ বাবা। আমি ঝোঁকটা একটু সামলে নিই।

বেঞ্চে দুপুরের পত্রপল্লবঘন মেহগিনির ছায়া ঘন হয়েছে। সে শোয় হাত-পা ছড়িয়ে। ডাকে, বুলু খদ্দেরকে চা দিয়ে একবার আয় দিকি।

যাচ্ছি মামা।

সঙ্গীটিও বেশ জুটেছে। নিবারণ মাস্টারমশায়ের দশ বছরের ছেলে বুলু। মাস্টারমশায় বলতেন, বুলুর কপালে লেখাপড়া নেই। খালি টোটো করে ঘুরে বেড়ানো। ও ব্যাটা নির্ঘাৎ জুতো সেলাই করবে ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে। মরতে দাও আমায়—তারপর দেখ।

ক্লাস সেভেনে অবশ্যি উঠেছিল কোনগতিকে। হঠাৎ মাস্টারমশায় সত্যি সত্যি মরে গেলেন। সুতরাং এই দশা স্বভাবত হয়েছে।

আরও গোটা চারেক ভাইবোন রয়েছে ওর। মা এক রকম ঝি-গিরি করে বাঁচছে। ছেলে-মেয়েদের আরো দুটো স্কুল ছেড়ে দিয়েছে একে একে। আর দুটো হাঁটি হাঁটি পা-পা।

বুলু, দেখ তো বাবা চুল পেকেছে নাকি! সত্য আরামে চোখ বুজে বলে।

বুলু সত্যি সত্যি চুল খোঁজে। তারপর বলে, নাঃ, নেই!

পাকে নি? সত্য চোখ বুজে হাসে। আটাশে চুল পাকবার কথা নয়। অথচ কেবলই সেরকম মনে হয়। প্রতিরাত্রে শোবার আগে মনে হয়, সকালে উঠে দেখবে সে সারা মাথা সাদা হয়ে গেছে। চামড়া হয়েছে গাছের বাকল, সে লাঠি খুঁজবে। মহিমের সেই ময়ূরমুখো

সখের লাঠিটা।

এমনি ছপুরে জায়গাটা বেশ নির্জন হয়ে ওঠে কোনদিন। কোন গাড়িও আসে না হাইওয়েতে। বড় বড় গাছগুলো ঝিমোয় নিঃশব্দে—বাতাসের সাড়া নেই। চারপাশের ঘন সবুজ রঙের ওপর হঠাৎ যেন জমে ওঠে ছায়া। পাখি ডাকে। ছায়া আরও ঘন হয়।

চোখ কচলায় সত্য। মনে মনে স্থির করে—শীগগির চশমা নিতে হবে তাকে। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকা বড় দরকার মনে হয় কেন!

খুব সাবধানে পা ফেলে আস্তে আস্তে সে হাঁটে। কথা বলে কম। কিন্তু রোজ সকালে দাড়ি কামাতে ভোলে না। হাতের কাছেই সেলুন খুলেছে বনমালী। ধোওয়া ইস্তিরি করা জামা-কাপড় পরেই চা ছাঁকে—চায়ের দাগ না লাগবার দিকে সে ভারী সাবধানী। আর স্নানের সময় অবিকল লীলার মত অনেকক্ষণ ধরে গায়ে সুগন্ধ সাবান মাখে। চুলে শ্যাম্পু করে।

আর রান্নার জন্মে রেখেছে যমুনাকে। খবর শুনে দিদি নিজে সঙ্গে এনেছিল ওকে। তার ভাস্থরের মেয়ে। মা-বাবা ছেলেবেলায় মারা গেছে, এতদিন দিদির সংসারেই ছিল।

কিশোরী হয়ে উঠেছে যমুনা। এখানে এসেই শাড়ি পেয়েছে। বাড়ির পাশেই দোকান খুলেছে সত্য। কিন্তু যমুনার জন্মে সে হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ফাঁক পেলেই বাড়ি ঘুরে যায়। দেখে যমুনা জানলার কাছে পা ছড়িয়ে বসে বই পড়ছে। নয়ত সেলাই করছে।

নাঃ, ঘর ভাঙে নি সত্যর। ভাঙতে পারে নি লীলা। ঘরে ঝাঁটা পড়ে। উঠোনে পড়ে। ঘরদোর ঝকঝকে তকতকে হয়ে থাকে আগের মত। থরে-থরে ফুলও ফোটে। গাঁদা হরগৌরী জবা। ঝি এসে কাজ করে দিয়ে যায়। হাতের কাছে যা চাওয়া যায়, ঠিক ঠিক মেলে।

সুতরাং সত্যর জীবনে বাইরের দেখবার মত ব্যাপারগুলো একই চলেছে। কেবল সে নিজে যেন বদলে যাচ্ছে—খুব ভিতর থেকে!

এক লোলচর্ম অথর্ব বৃদ্ধ মানুষ—যার ছু চোখে অসম্ভব জ্যোতি, সত্যর মাংস ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল। সত্য মাঝে মাঝে ভয়ে চমকে

উঠছিল—ও কে? তার বড় বড় নখ, বিশৃঙ্খল চুল, গা ভরতি লোম, দাড়ি-গোঁফ-ঢাকা মুখবিবর হাঁ করে খাচ্ছ গেলে।

দোকানে বুলু ঘুমোয় রাত্রিবেলা। বাইরে বেঞ্চে শুয়ে থাকে চালচুলোহীন বাউণ্ডুলে অভা, অভয় সদ্গোপ। সন্নেসীদের মত চেহারা। গাঁজার যম। আর সত্য আজকাল বাড়িতেই শোয়। যমুনা একা থাকবে কি করে?

একদিন দুপুররাতে পাশের ঘরে যমুনা ভয় পেয়ে ডাকছিল সত্যকে। সত্যর অনিদ্রা। সে হুড়মুড় করে বেরিয়েছিল দরজা খুলে। কী হল, কী হল যমুনা?

যমুনা কাঁচুমাচু মুখে বলল, জানালায় কে যেন দাঁড়িয়েছিল। ডাকছিল আমাকে।

চিনতে পেরেছ?

জানালা বন্ধ করে দাও।

পরক্ষণে সত্যর মনে হয়েছিল, যা গরম পড়েছে! তায় অসম্ভব মশা। মশারির মধ্যে শুতে হয়। সে বলেছিল, ঠিক আছে, আমি আসছি।

সেই থেকে একঘরে শোওয়া। যমুনা যুবতী হচ্ছে। গ্রামের লম্পট ছেলেদের শ্যেন দৃষ্টি তার ওপর রয়েছে—এটা স্বাভাবিক।

পাশাপাশি মেঝেয় শিয়রে জানালা—দুটো মশারি। যমুনা নির্ভয়ে ঘুমোয়। সত্যর অনিদ্রা।

এবং হঠাৎ কোন রাতে সত্য হেরিকেনের দম বাড়িয়ে দেয়। আস্তে আস্তে—অতি সন্তর্পণে যমুনার মশারিটা তুলে একটুখানি দেখে নেয়। জানুদুটো সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে আছে যমুনার। গরমের জন্যে জামার বুক খুলে শোয় সে। সত্য দেখে।...যমুনা কে তার? তার সঙ্গে সত্যর এতটুকু রক্তের সম্পর্ক নেই। ও সত্যকে মামা বলে ডাকে। কেন ডাকবে?...সত্যর এ রকম মনে হয়। সব যুক্তিহীন ঠেকে।

অথর্ব এক বৃদ্ধের মাংস ঠেলে ওঠা দোলা—ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গ নিয়ে সত্য দাঁতে দাঁত চাপে। আস্তে আস্তে সাবধানে হাত বাড়ায়। প্রথমে আঙুলে ছোঁয় হাঁটুর কাছটা। ক্রমশ আঙুলে চাপ বাড়ে।

যমুনার ঘুম বড় গাঢ়—তার মনে হয়। সে ভাবে, অতি সহজেই একটা কিছু করা যেতে পারে।

কিন্তু কিছু ঘটে না।

হয়ত ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরে যমুনা। কিম্বা সত্যর ক্লান্তি লাগে। বিড়ি খেতে ইচ্ছে করে। সরে এসে বাইরে বেরোয়।

তারপর প্রচণ্ড দুঃখে তার বুকে ভেঙে যায়। যমুনার জন্যে মায়া লাগে। বাৎসল্যে পূর্ণ মন নিয়ে সত্য ভাবে—আচ্ছা, আমিও তো বাবা হতে পারতাম ওর, কিম্বা কারুর, কিংবা কলঙ্কিনী পাপিষ্ঠা ওই লীলারাণীর গর্ভজাত কোন কন্যার।···

কালই বহরমপুরে যাবে সত্য। কিনে আনবে একটা সুন্দর শাড়ি। কিছু প্রসাধনদ্রব্য। যমুনার বাকসোটা খুব বাজে আর পুরনো। নতুন একটা কিনে দিতে হবে।

একদিন সত্যিসত্যি কেনা হয়ে গেল সেগুলো। তারপর সত্য যখন খেতে বসেছে, যমুনা সামনে বসে একটু হেসে বলে উঠল—আচ্ছা মামা, আপনি রাত্তিরে আলো জ্বেলে কী দেখেন বিছানায়?

চমকে উঠেছিল সত্য। গলায় ভাত আটকেছিল তক্ষুনি। সে গম্ভীর হয়ে বলল, কার বিছানায়?

অক্লেশে যমুনা জবাব দিল, সত্যি। বড্ড ছারপোকা হয়ে গেছে। শহরে গেলে মনে করে বিষ এনো দিকি!

তখন সত্য হাসল হো হো করে। বলল, ছারপোকার জন্যে?

নয়তো কি আমার জন্যে? যমুনা চোখ পাকিয়ে বলল।

সর্বনাশ! মেয়ে যে তলে পেকে লাল টুকটুকেটি হয়ে গেছে রে বাবা! সত্য খাওয়া ছেড়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কেবল হাসছিল। শেষে বলল, তবে আমার জন্যে!

যান্। আপনি খাবেন কোন্ দুঃখে!

সত্যর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, তোর মামীমার জন্যে দুঃখ নেই বুঝি?

যমুনা বলল, ছাই মামীমা! অমন মামীমা থাকলেও যা না থাকলেও তাই। কী কষ্টটা পাচ্ছেন শুনি!

সত্য রসিকতা করল, কষ্ট একটা আছে তুমি বুঝবে না এখন।

কখন বুঝব ?

বয়স হোক, তারপর।

সত্য এমন বিচ্ছিরি ভঙ্গীতে কথাটা বলল যে, যমুনা লজ্জা পেয়ে মুখ ফেরাল। বলল, যান! আপনি অসভ্য।

খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গলায় যেন কাঁটা বিঁধেছে কখন। এত খারাপ লাগে সব! এত বিচ্ছিরি! কেন এমনি করে একটা আড়াল খুঁজছে? জঘন্য কারচুপির ফিসফিস শব্দ শুনছে সকল রোমকূপে। সত্যর মনে হল, সে অজ্ঞাতে একটা নোংরা জায়গায় হাঁটছে, শহরের একপাশের সেই আবর্জনা ফেলবার মাঠটার মত একটা দুর্গন্ধ মাঠ—অথচ ঠিক ওখানে যেমন রয়েছে, তেমনি সুন্দর সবুজ গাছপালায় মরশুমী ফুলের শোভা ইতস্তত! শহরের ওই মাঠটায় একটা গাধাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে। সত্য মনে মনে বলছিল, আমি শালা সেই গর্দভটা!

পান খাবেন না ?

দাও! জরদা দিয়েছ নাকি ?

খুলে দেখুন, দিয়েছি। মজার জরদা। কখনও খাননি। ভিরমি খাবেন।

কী জরদা দেবে আর যমুনা? মাথামুণ্ডু আর নতুন করে ঘুরবে কতটুকু—ওটা ঘুরেই আছে।

যমুনা দ্রুত যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলে গেছে, এর নাম মামাবশকরা জরদা। শুনে সত্য কাঠ। সত্য পাথর। নরকের দরজা হুট করে খুলে গেল। সামনে আগুন—গায়ে আঁচ লাগে। তখন সে ছটফট করে উঠল। আঃ, এখন তাকে অনায়াসে একটিমাত্র মেয়ে বাঁচাতে পারত। সে লীলা।

চার

ইতিমধ্যে ধূসর মাঠগুলো সবুজ রঙে ঢেকে গেছে। রূপপুর এখন রূপসী। সমতল নাবাল এলাকা। পথ বলতে তেমন কিছু নেই। ওরা বলে ডহর—দুপাশে নিশিন্দা ফণীমনসা আর চোরকাঁটার ঝোপ। কোনরকমে একখানা গোগাড়ি চলতে পারে। চাকার দুটো দাগ দেখেই বোঝা যায় এটা পথ। নয়ত পোড়ো জমির মত সবটাই ঘাসে ঢাকা। ভদ্রমানুষের—বিশেষ করে শহুরেদের পক্ষে হাঁটা বেশ বিরক্তিকর। জুতো খুলেও রেহাই নেই। হাঁটুঅব্দি না গুটিয়ে নিলে চোরকাঁটায় কুরুক্ষেত্র করে ছাড়বে।

আর সাইকেল নিয়ে যে আসে, তাকে দেখে পাশের জমির চাষারা বড় বড় হলুদ দাঁতে হেসে বলে, বল হরি, হরি বোল! পরক্ষণেই মাঠ-কাঁপানো শব্দ। হা হা হা হা হা!

অনেক কষ্টে খাল-কাঁদরগুলো পেরিয়েছে সুখেন। সামনে বুঝি ওটাই রূপপুর। বিকেলের নরম আলোয় শরতকালের গ্রাম-বাংলা শান্ত অবোধ মেয়ের মত নীরবে হাসছে। বড় সহজে তার সর্বনাশ করা যায়।

মড়ার মত কাঁধে সাইকেল বইতে হচ্ছে তাকে।—যা দেখে চাষারা হরিধ্বনি দিয়ে হেসেছে; তবু মনটা প্রফুল্ল। হাঁটুঅব্দি প্যাণ্ট গুটিয়েছে সুখেন। ঠোঁটে সিগ্রেট, কাঁধে সাইকেল। মোজাভরা জুতো সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে আটকে রেখেছে। পকেটে ট্র্যাঞ্জিস্টার। গতিক বুঝে চাবি বন্ধ করে রেখেছিল।

অই মান্যবর, বাবু মশায়ের শরীল বাজছে হে। আহা বাবুমশায় বাজছেন······

না রে ধনপতি উটা রেড্ডো।

উঁহু, টেনজিস্টার।

কিনবি একটা? কত দাম লাগে রে?

মণ চারেক চান। আমি কিনব হে, ধান উঠুক।

শালা ! বাজাবার মত মানানসই ঘর আছে তোর ?

কেনে ? লাঙলের জোয়ালে ঝুলিয়ে দোব।

ফের সেই উদ্দাম হাসি হা হা হা হা !

চাষীরা আজকাল সুখেই আছে। জমি আছে। ধান ফলে। ধানের দর দিনে দিনে আগুন হচ্ছে।……অদ্ভুত একটা লোভ সুখেনের মনে গরগর করে উঠছিল হুলো বেড়ালের মতো। লীলা তো এখন অনেক জমির মালিক।

গাঁয়ে ঢোকার মুখে কিছু শুকনো পথ পাওয়া গেল। দুপাশে উঁচু ঢিবির ওপর বসতি। ঘন নীল ধুঁয়ো গাছপালা ঘিরে জমছে ক্রমান্বয়। ঘন ঝোপঝাড় দুপাশে। বাঁশের বনে পাখিগুলো চিৎকার করছে দলবেঁধে। সজনেগাছের লেজঝোলা পাখিটা হঠাৎ এতো ভালো লাগল সুখেনের—কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল থেমে।

পথের পাশে যে ঝোপগুলো সেখানে একটি দুটি করে মেয়েরা এসে দাঁড়াচ্ছিল। কারুর হাতে নাকটা ঢাকা, কারুর হাত তলপেটে মৃদু আঘাত করছিল। নোংরা আর দুর্গন্ধে সুখেনের বমি এসে গেল। ওরা এখানে কেন এমন করে দাঁড়িয়ে আছে, সে টের পেয়েছে।

কিন্তু মেয়েগুলোর চেহারা ভারি সুন্দর তো ! বনকুসুম—যাকে বলে। কী নিটোল স্বাস্থ্য, কী প্রশান্ত চাহনি। বড় সহজে হয়ত সর্বনাশ করা যায়।

বাবুমশাই, কার বাড়ি যাবেন গো ? উঁচুতে উঠোন থেকে এক বুড়ো প্রশ্ন করল।

ঘোষমশাইদের বাড়ি। কোন্‌দিকে যাবো ?

সোজা গিয়ে বারোয়ারীতলা বটগাছ, সিখান থেকে ডাইনে ঘুরে একতলা পাকা-বাড়ি দেখবেন···

বুঝেছি।

সুখেন উৎসাহে সাইকেল ঠেলতে থাকল। যাক ? সত্যিসত্যি এসে পৌছল তাহলে। আর একটুও উদ্বেগ নেই। বাপস্ রাণীচকে সত্যকে এড়িয়ে আসতে অনেকখানি জলকাদা ভাঙতে হয়েছে তাকে।

জামা-প্যান্ট নোংরা হয়ে গেছে। যাক্। ব্যাগে আরও রয়েছে। নির্বিবাদে ছুটি দিন অন্তত কাটাবেই সে। প্রেস গোল্লায় যাক, এদিকে পুষিয়ে নেবে সব লোকসান।

নির্জন লাগে গ্রামটা। বড় সুন্দর লাগে। পাখপাখালির ডাক চারপাশে। চোখজুড়ানো গাছপালা। কুয়াশার রহস্য। লীলা। পটের ছবি লীলা—সরল অবোধ আর প্রশান্ত।

কোথাও তাহলে এখনও অপরিমিত সুখ আর সৌন্দর্য জমা হয়েছিল হাতের আড়ালে। পৃথিবী আর ভয়ঙ্কর মনে হয় না। এত ভালো লাগে সব।

হঠাৎ সুখেনের মনে হয়েছে সে পাপী। তার হাত পাপের হাত। তার চলার পায়ে পাপের কণ্ঠস্বর ফুটেছে।

এ ঢেউ প্রশমিত হলে, সে মনে মনে বলল, আমি সৎ হয়ে বাঁচতেও পারি। শুধু লীলা—লীলা যদি তাকে করুণা করে।

বুকভরা আবেগ নিয়ে সুখেন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাল। সে ছাড়া কেউ জানল না এই মৃদু ভীরু কম্পিত ঘণ্টার ধ্বনিতে একটা কাকুতি ছিল।

কিন্তু প্রথমেই ভড়কে গিয়েছিল সুখেন।

থ্যাবড়া নাক বীভৎস কদাকার একটি লোক গরিলার মতো দুলতে দুলতে এসে বাইরের ঘরটা খুলে দিয়েছিল। ঘরে সেকেলে একটা মস্ত তক্তোপোষ, গুটিকয় হাতলভাঙা চেয়ার আর ততোধিক জীর্ণ একটা টেবিল—যা অজস্র ছোপে কুৎসিত।

শূন্য তক্তাপোষে একটা কম্বল পেতে দিয়ে লোকটা বড় বড় দাঁত বের করে বলছিল, চান করবেন নাকি অবেলায়?

নাঃ। সুখেন মাথা নেড়েছিল। সাইকেলটা বারান্দার নীচে রয়েছে। নিজেকেই তুলে আনতে হবে নাকি? ব্যাপার কী লীলার? চিঠি লিখে ডেকে এনেছে, তারপর এই অভ্যর্থনার ছিরি?

বড় এক বালতি জলও এসে গেল একসময়। হেরিকেন এল।

হাতমুখ ধুয়ে জামাপ্যান্ট ছেড়ে ধুতিপাঞ্জাবি পরে নিল সুখেন। তখন চা, একথালা মুড়ি আর নারকেল নাড়ুও এসে গেল। কিন্তু লীলা এল না।

ক্ষিদে পেয়েছিল পনের মাইল সাইকেল ঠেলে। কিন্তু খেল না কিছুই—কেবল চা। চা খেতে খেতে সে লক্ষ্য করল, সেই গরিলাটা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল সুখেনের। সে বলল, নাম কী তোমার?

আজ্ঞে, ভালো নাম শুনবেন, না বাজে নাম?

সে আবার কী? সুখেন হাসবার চেষ্টা করল। দুটোই শোনা যাক্, বলো।

আজ্ঞে ভাল নাম মহেশ্বর। লোকে ডাকে ঘণ্টা বলে।

ঘণ্টা? ঘণ্টা কেন? সুখেন তার ভয়ের লোকটার সঙ্গে ভাব জমাতে চাইছিল।

ঘণ্টাকর্ণ ঠাকুরের পূজোর দিন আমার ভূমিষ্ঠ কিনা···ঘণ্টা জানাল।

ও। তা হ্যাঁ হে ঘণ্টা, এবার চাষবাস তো বেশ ভালই না কি?

খুব খুব ভাল। এমন আবাদ আজ্ঞে দশবিশবচ্ছর হয় নি ইদিকে।

তুমি কি বরাবর এ বাড়িতে রয়েছ?

আজ্ঞে, জম্মোকাল হতে।

তাহলে তুমি তো বাড়ির লোক।

তা তো বটেই।

তোমাদের জমিজমা দেখাশোনা করে কে?

হরু কৈবর্ত। বলে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে ঘণ্টা ফের বলল, লোকটা ভাল না। বোঝলেন দাদাবাবু।

দাদাবাবু শুনে আশ্বস্ত হয়ে সুখেন বলল, কেন?

বোঝলেন না? মালিক হচ্ছেন গে মেয়েমানুষ। সম্পত্তিও বিস্তর। শালা দুহাতে মারে দাদাবাবু। ধান ওঠবার সময় ওর পোয়াবারো।··· লালা এসেছিল মুখে—কোঁৎ করে গিলে ঘণ্টা ফের বলতে থাকল, তবে ইবারে সেটি হচ্ছে না বাবা। দিদিমণি নিজেই সব দেখাশুনা কচ্ছেন।

দিদিমণি—মানে, লীলা? বল কী!

ঘণ্টা হাত নেড়ে বলল, আজ্ঞে, অবাক হবার কিছু নাই। উনি ছেলেবেলা থেকে মাঠেঘাটে ঘুরেছে। ওনার পক্ষে কাজটা কঠিন নয় দাদাবাবু। কপালের দুর্ভোগ, পড়েছিলেন এক বাজে লোকের হাতে··· তা লোকটার কী বুদ্ধি দেখুন, লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে পালালে গো। নাঃ, দিদিমণির এট্টুকনও দোষ নাই। বোঝেন তো প্রিকিত কথাটা, বড়লোকের বড় আদুরে মেয়ে—মানিয়ে নিতে হয় বৈকি। পাল্লে না যে, হেরে গেল সে। না কী বলেন?

সুখেন মাথা নেড়ে সায় দিল।

ভিতর থেকে ডাক এল, বলি অ ঘণ্টা, এদিকপানে একবার আসবি না?

না, লীলা নয়, বাসিনী ডাকছে। ঘণ্টা উঠল।

কী প্রচণ্ড মশা। এরই মধ্যে ভনভন শন-শন শব্দ উঠছে। পাদুটো ঝুলিয়ে বসেছিল সুখেন। তুলতে বাধ্য হল। বাইরে ঘন অন্ধকার নেমেছে ততক্ষণে। জোনাকি উড়ছে। ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে। কোথাও কোন লোক নেই। কোন শব্দ নেই।

আছে। কদাচিৎ কাছে বা দূরে হঠাৎ প্রচণ্ড গর্জন করে কেউ ডেকে উঠছিল, দুর্বোধ্য জান্তব একটা চিৎকার মাত্র! সুখেন এক অবাস্তব জগতে এসে পড়েছে।

ফের ঘণ্টা এলে ওই চিৎকার কিসের জানতে চাইল সে। ঘণ্টা বলল, গয়লার বিলজঙ্গল থেকে গোরুমোষ চরিয়ে বাড়ি ফিরছে। বাড়ি ঢোকার আগে আলো দেখাতে বলছে তারা। যতক্ষণ বাইরে ছিল, তখন চোখ দুটোই আলো। এবার ঘরে কিন্তু সত্যিকার আলো চাই-ই একটা।

সুখেন ম্লান হেসে মন্তব্য করল, আলো! কিন্তু ডাক শুনে বোঝা যায় না। যেন বাঘ ডাকছে!

ঘণ্টা বলল, বুনোদেশের ডাক দাদাবাবু—ওইরকমই হয়।

লীলার ছবি বদলে যাচ্ছিল সুখেনের চোখে। সেদিন রাণীচকের বন্ধুপত্নী সে-লীলা ছিল মোহময়ী সরলা এক বধূ—হয়তো বা স্বামীর কাছে

অতৃপ্ত—তাই হঠাৎ মনে হবে এত কামার্ত। হ্যাঁ, লীলাকে দেহ-সর্বস্বা এক কামাতুরা সাধারণ মেয়ে বলেই মনে হয়েছিল তার। এমন মেয়ে সে জীবনে অজস্র দেখেছে, ভোগ করেছে। খুব সহজে এরা হাতের কাছের সেরা জিনিসটি প্রেমাস্পদকে দান করে বসে। তাদের বোকামি দেখে হাসিও পায়।

কিন্তু লীলা যেন তা নয়। ওই জান্তব গর্জনে আলো ডাকবার মধ্যে লীলার রক্তের একটা সহজাত সম্পর্ক আছে। সুখেন বুঝতে পারছিল, লীলা সহজ হতে পারে, কিন্তু ভয়ঙ্করও। এই গ্রামীণ রাত্রিটার মত—যখন মাথার উপর উজ্জ্বল স্পষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ, নীচে আরণ্য-আদিম অন্ধকার।

ঘণ্টা বলল, এখন খাবেন—না পরে, দিদিমণি জানতে চাইলেন।

সুখেন শুকনো হাসছিল। এরই মধ্যে খাও নাকি তোমরা! সবে সাড়ে সাত বাজছে।

আজ্ঞে, আটটার মধ্যেই সব নিশুতি। বোঝেন তো, নিতান্ত গণ্ডগেরাম।

অসুবিধে না হলে পরেই খাবো।

ঘণ্টা চলে গেলে সুখেন একটু লোভার্ত হল। খাবার সময়, সেবার যেমন করেছিল, লীলা অবশ্যই সামনে থাকবে। সেই অবসরে বুঝি তার কথা জানাবে।

কিন্তু যদি তখনও সামনে না আসে সে। লীলা কি লজ্জা পাচ্ছে? এ তো তার একান্তই নিজের সংসার নিজের ঘর। সে মালিক সব কিছুর। কিসের লজ্জা তাহলে?

তা ঠিক নয়। আসলে লীলার সময় হয় নি এখনও। আসবে সে, যখন সুখেন শোবে। (এখানেই শুতে দেবে নাকি, এই ঘরে? মশারি দেবে তো?) বিছানায় পাশে ঘেঁসে বসে, রাত গভীর হলে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, সে তার কথা বলবে।

কী কথা আছে লীলার?

দুরদুর বুকে সুখেন বসে থাকল। একটা হাতপাখার দরকার ছিল তার। বড্ড গরম লাগছে। তার ওপর মশা।

ক্ষোভে-দুঃখে অভিমানে সে ক্রমশ অস্থির হচ্ছিল। কখনও ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবছিল, এখনই চলে যাবে সাইকেলটা ঠেলে ফের পনের মাইল। জলকাদার পথ ভাঙতে কষ্ট হবে না তার। সে পুরুষ, এটা লীলার আরো ভালোভাবে বোঝা উচিত ছিল।

ঘণ্টা না, বাসিনী এসে ডাকল এক সময়।···আসুন গো দাদাবাবু, খাবেন আসুন।

গম্ভীর থমথমে মুখে সুখেন উঠল। বলল, সাইকেলটা ওখানে আছে···

বাসিনী উঁকি মেরে দেখে নিয়ে বলল, হতচ্ছাড়া ঘণ্টাটাকে যে কী বলব! আক্কেল আছে এতটুকু! বলি আর ঘণ্টে, অই ঘেণ্টু!

হাসতে হল দুঃখের মধ্যেও। হাসি মুখেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করল সুখেন।

পাঁচ

সে রাতে রাণীচকে সত্যও কম অস্থির নয়।

বিকেলে দোকানে যাবার সময় দেখে গেছে, যমুনা দারুণ সেজেছে। পূর্ণ যুবতীর মত তার দেহে খেলছে এক অপার্থিব আলো। নিজের বয়সকে মাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে সে।

সত্য ভাবছিল, সইয়ে নিতে হয় অল্প করে—তারপর হয়ত সবই সহজ হয়ে ওঠে। মানুষ যা কিছু বলুক, যত ভালই করুক, আসলে পৃথিবীজোড়া যা চলছে চিরদিন তার যত ভদ্র নামই দেওয়া হোক, তা নিতান্ত ভোগলীলা; কাম থেকেই ভোগ। জীবনে শুধু ওই একটি চিৎকার—ক্ষুধা ক্ষুধা! ক্ষুধার জন্য ভোগ। রাক্ষস হয়ে পৃথিবী পেয়েছি। পৃথিবী গিলবো।

কী রে সতু, খিক-খিক করে হাসছিস কেন? পিনাকী বলছিল।

ও কিছু না।

বল না বাবা, ঝেড়ে ফেল। আমরাও খানিক হাসি।

হাসির কথা নয়।

তবে যে হাসলি?

হাসলাম।

পিনাকী ভেংচি কেটে বলেছিল, হাসলাম! তাহলে কথাটা কিসের?

ও একটা উড়ো কথা।

কাকেও বলা যায় না। অথচ সবাই জানে। আর তাছাড়া তুমি শালা পিনাকী মুখুয্যে, কোন ঘাটে জল খাচ্ছ, তা কারুর জানতে বাকী নেই। সত্য মনে মনে বলছিল। শুনলে তুমি বলবে মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম—ঋষি বিশ্বামিত্রও টলেছিলেন—তা ওহে পিনাকী, তোমার মুখের আদল স্বর্ণকার পাড়ায় কেন? ঘরে তোমার ঘর আলোকরা বউ, টসটসে যৌবন, তবু তুমি কেন? জগদীশ স্যাকরাও কি জানে না, তার কনিষ্ঠা কন্যার প্রকৃত বাবা কোন মহাজন?

যা দিনকাল পড়েছে! জগদীশ নিজেকে সইয়ে নিতে পেরেছে। এখন সে ও নিয়ে মাথা ঘামায় না।

আর পরিতোষ রায়? অন্নদা মজুমদার? হরিবিলাস, মঙ্গল, সাধুচরণ?…ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যায়। চিরকাল এই চলেছে—আবহমান ধরে আমরা যে যার ঘরে, সুযোগ পেলেই সিঁদ কাটছি। আর কেন তবে ঢাকগুড়গুড় নাকসিটকানো, আইন-কানুন আদালত ছাইপাঁশ। তুলে নাও দাদারা, বেঁচে যাই হাঁফ ছেড়ে। যার যাকে ভালো লাগে, বেছে নিক।

সতু, তুই পাগল হবি রে! কি বিড়বিড় করছিস? রোডবাবু তারক সরকার এসে বলেছিল।

উড়ো কথা। একই জবাব দিল সত্য।

সে আবার কী!

সত্য ঠোঁটে চুক-চুক শব্দ করে বলেছিল, আহা, সেদিন কি হবে?

নির্ঘাৎ বউয়ের শোকে সত্যটা পাগল হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন। লোকে আজকাল বলাবলি করতে শুরু করেছে।

তারপর সকাল সকাল ফিরে গেছে সত্য। দোকানে বুলুর মা বুলুর

জন্যে ভাত বয়ে এনেছিল, বুলু খেতে বসেছে। হেরিকেনের চারপাশে পোকা থিকথিক করছে। বুলুর মা যত্ন করে সেগুলো টিপে মারছে। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

যাবার সময় এক পলক দৃশ্যটা দেখে সত্যর হঠাৎ খুব ভাল লেগেছিল।

সত্য বাড়ি ঢুকে দেখল যমুনা আলোর সামনে বসে কী বই পড়ে শোনাচ্ছে চাঁপা ঝিকে।

কী বই ওটা? সত্য প্রশ্ন করল।

যমুনা সলজ্জ তাকিয়ে বন্ধ করল বইটা। বলল, একটা মাসিক-পত্রিকা।

অত মোটা? হাতে নিয়ে পাতা ওলটাল সত্য।

শারদীয় সংখ্যা একটু মোটাই হয়।

বিস্মিত সত্য ওর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি লেখাপড়া কদ্দূর জান যমুনা?

যমুনা মুখ নামিয়ে বলল, ক্লাস ফাইভ অব্দি পড়েছিলাম। তারপর···

আর পড়ার ইচ্ছা করে?

যমুনাও বিস্মিত চোখে তাকাল।

বল না, ইচ্ছে করে নাকি?

করে তো। পড়াবেন? মেয়েদের স্কুল আছে এখানে?

সত্য বলল, আছে। কালই দেখব'খন। তা কথাটা আগে বলতে হয়।

যমুনা বাঁকা ঠোঁটে বলল, বললে ভর্তি করে দিতেন? কিন্তু তাহলে ঘরকন্না দেখত কে?

চাঁপা সামনে রয়েছে দেখে সত্য সামলে নিল। বলল, সে দেখা যাবে।

চাঁপা উঠে দাঁড়াল এবার। বলল, তা যমুনামাসি, নাই বা হল বাবা-কাকা, বাবা-কাকার তুল্যি তো বটে। তোমার ইহকাল-পরকাল ওনার হাতে। এখন সবকিছু দেখবেন বইকি।

চাঁপা চলে গেলে সত্য আর যমুনা জোর হাসল একচোট। যমুনার হাসিটাই বেশি। তার চোখে জল এসে গিয়েছিল।…ও বলে কী? বাবা-কাকা…

সত্যর হাসি নিভেছে! বলল, বাবা-কাকা না তো কী?

যমুনা অপ্রতিভ কণ্ঠে জবাব দিল, যান, ফাজলেমির জায়গা পান না আর।

কেন যমুনা, ফাজলেমি বলছ কেন?

কেন আপনি তা জানেন না যেন।

কতকটা হার মেনে সত্য বলল, আমাকে মামা বল, তাই না যমুনা?

বলতাম, আর বলব না। তাও যদি বা বলি, সে বাইরের লোকের সামনে।

কী বলবে?

জানি নে যান! বই নিয়ে ঘরে ঢুকল।

সত্য পিছন পিছন গিয়ে বলল, জবাব দাও যমুনা।

যমুনা অন্ধকার থেকে জবাব দিল, নাম ধরে ডাকব। রাগ করবেন?

সত্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কই, কী খেতে দেবে দাও, ক্ষিদে পেয়েছে।

যমুনা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছ। একটুও নড়ে না।

কী হল? এস।

তবু তার সাড়া নেই।

একটা কিছু অনুমান করে সত্য এগিয়ে গেল তার কাছে। তারপর তার দু কাঁধ ধরে মুখটা আলোর দিকে ঘুরিয়ে দিল। পরমুহূর্তে সে অবাক হয়ে বলল, কাঁদছ? যমুনা, তুমি কাঁদছ? কেন? সত্য বার-বার তার কাঁধদুটো নাড়া দিতে থাকল। কেন, কেন কাঁদছ যমুনা?… আজ তুমি আমাকে কী দেবে বলেছিলে, সে তো তোমারই বলা যমুনা—আমি তো কোন জেদ করিনি! খেতে-পরতে দিচ্ছি বলে বুঝি এই বিচ্ছিরি দাবী থাকবে আমার, তাই ভেবেছ? ছিঃ লক্ষ্মীটি, কথা শোন। এই আমি নাক-কান মলছি—আর কক্ষনো তোমার দিকে কু-দৃষ্টে

তাকাবো না—তুমি ভয় পেয়ো না, কেমন ?

তবু পাপিষ্ঠ সত্যচরণ বলতে পারল না, আমি তোমার বাবার মত, তুমি আমার মেয়ে যমুনা—এবং বলতে যে পারল না, তা সে নিজেই লক্ষ্য করল।

অবশ্য তা লক্ষ্য করল অনেক—অনেক পরে। আলাদা ঘরে শুয়ে যখন একটার পর একটা বিড়ি টানছিল ক্রমান্বয়ে।

আর যমুনা বুঝি বা একলা থাকার ভয়ে, বুঝি প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরমে দরজা জানালা বন্ধকরা ঘরে পুরু মশারির মধ্যে সেও ঘুমোতে পারছিল না।

তেমনি একটা অস্থিরতার ঝড় রূপপুরেও বইছিল সে রাতে। সেখানে লীলাদের বড় ঘরের লম্বা বারান্দায় বসে খাচ্ছিল সুখেন। বাসিনী পরিবেশন করছিল। আর একটু তফাতে লীলা একটা মোড়ায় বসেছে কর্ত্রীঠাকুরাণীর মত। তার মাথায় একটুখানি ঘোমটা।

পোকামাকড়ের জন্যে হেরিকেনটা দূরে রাখা হয়েছে। তার অল্প আলোয় চেষ্টা করেও সুখেন লীলার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না।

কথা অবশ্য বলছিল দুজনে। অকাজের নানা এলোমেলো কথা। কিন্তু সুখেন উসখুস করছিল। আড়চোখে লীলাকে দেখছিল সে। সামনে বাসিনী, ওখানে ঘণ্টা আর আরও সব কারা বসে রয়েছে। অন্য কথা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না সে।

লীলা খুব শান্তস্বরে আস্তে আস্তে কথা বলছিল। জমির কথা, বানবন্যার কথা। পাঁকাল মাছ। পাঁকাল মাছের পেটে এখন অবশ্যি ডিম নেই আর। পাওয়া যায় কদাচিৎ। তবে রাণীচক বাজার জায়গা—রোজ মেছুনীরা নানারকম মাছ নিয়ে আসে। কিন্তু রুই-কাতলা তো মাছের সেরা। লীলার তিনটে পুকুর আছে। মাছ আছে ঠাসা। যেটা সুখেন খাচ্ছে, তার ওজন ছিল সাড়ে সাত সের। আদ্ধেকটা পড়শীদের বিলিয়ে দিয়েছে। অত কে খাবে ?

সুখেনও তার নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলছিল একই স্বরে।

প্রেস একটা কিনেছে অবশ্যি। কিন্তু নগদ দামে নয়। কিস্তিতে। মফস্বল শহরে তো ফ্ল্যাট-মেশিনের কাজ বেশি একটা হয় না। ট্রেডলেই চলত। একটা ঝকমারি হয়ে গেছে। তবে সরকারী কাজের চেষ্টায় আছে! পেলে ফ্ল্যাটের সুরাহা হয়। আবার সেদিকেও বিপদ আছে। মধ্যে মধ্যে ওটা খারাপ হয়ে যায়। মেরামত করতে মোটা টাকা খসে পড়ে তার। সরকারী কাজ নিয়ে শেষে তেমন একটা কিছু ঘটে গেলে দারুণ লোকসান খেতে হবে।

লীলা বলল, একা মানুষ, তায় মেয়ে। লোকে গ্রাহ্য করে না মোটে! বিলের ওদিকে কিছু জমি আর জলকর নিয়ে কুতুবপুরের মুসলমানদের সঙ্গে ঝামেলা চলছে। আমরা আবাদ করলে ওরা লাঙ্গল-মই চালিয়ে দেয়। ধান পোঁতে। তখন ফের আমাদের লোকেরা তা নষ্ট করে দেয়। এই বলে লীলা খিলখিল করে হেসে উঠল।

সুখেন বলল, সম্পত্তি রাখার বড় ঝঞ্ঝাট। ভাগ্যিস আমি জমি-জায়গাওলা লোক নই। তুমি হয়েছ, তুমি বুঝছ!

লীলা কেমন হাসল।···ঝঞ্ঝাটে সুখ আছে। কারুর কাছে তো হাত পাততে হয় না!

সুখেন ঢক-ঢক করে জল খেয়ে উঠে পড়ল।

ওকি? উঠলে যে? বস। বাসিনী, পায়েস দে।

সর্বনাশ। পেটে আর তিল ধারণের জায়গা নেই যে!

খাবে না তাহলে?

নাঃ।

ঘণ্টা, ওকে হাত ধোবার জায়গাটা দেখিয়ে দেয়। আলো নে সঙ্গে। আছাড় খাবে।

হাতমুখ ধুয়ে সুখেন ভাবছিল, এবার কী করা উচিত। লীলা বারান্দা থেকে বলল, এই ঘরে তোমার বিছানা দেওয়া হয়েছে।

যাক, বাড়ির ভিতরে আশ্রয় মিলেছে তাহলে। সুখেন সিগ্রেট ধরিয়ে আকাশ দেখতে থাকল।

লীলা বলল, হিম পড়ছে—বারান্দায় এস।

বারান্দায় এখন দুজনে একা। সুখেন একটা চেয়ারে বসল। তারপর বলল, এখানে এসে অব্দি আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেছি লীলা। সত্যি, ভাবতেই পারছিনে, তুমি সেই রাণীচকের···

লীলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শোও গে যাও। রাত হয়েছে।

সুখেন ঠোঁট কামড়াল। মরীয়া হয়ে বলল, আমাকে ডেকেছ কেন, এখনও জানতে পারলাম না কিন্তু।

সে হবে'খন। বলে লীলা উঠোনে নামল। বাসিনী, দুধটা জ্বাল দিয়ে রেখো আরেকবার। সকালে চা হবে—তখন দুধ পাবো কোথা?

বাসিনী বলল, উনোনেই তো চাপিয়ে রেখেছি। তা, দাদাবাবু একটু দুধও খাবেন না নাকি?

খাবে না। পায়েস খেল না তো। লীলা ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, নাকি খাবে?

সুখেন শুনে না শোনার ভান করে বলল, কী?

দুধ?

নাঃ।

টেবিলে জল ঢাকা দেওয়া আছে, দেখো। হাতপাখা···ঘন্টার মা, পাখা দিয়েছ তো বিছানায়?

ঘন্টার মা শুয়ে পড়েছিল। হয়ত ঘুমের ঘোরেই বলল, দিয়েছি।

বিছানায় শুয়ে অস্থির সুখেন তবু সারাটি রাত প্রতিটি মুহূর্তে অপেক্ষা করছিল লীলার। দরজা সে ভেজিয়ে রেখেছিল মাত্র। একটু শব্দেই সে চমকে উঠছিল। অজস্র সিগ্রেট খাচ্ছিল। তবু লীলার কোন সাড়া নেই।

কেবল পুরনো তক্তপোষের, যেন মগজের মধ্যে, ঘুণপোকার কুরে কুরে খাওয়া গভীর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

না, আছে। সময়ের শব্দ। মাথার নীচে বালিশের তলায় হাতঘড়িটায় নিরবচ্ছিন্ন টিক টিক টিক টিক টিক···ধারাবাহিক।

আর জানালার ওধারে গাছের পাতা থেকে বুঝি শিশির ঝরে পড়ার শব্দ টাপ টুপ টাপ টুপ টাপ···অন্তহীন।

সুখেন নিজের মড়ার শিয়রে বসে রাত কাটাচ্ছিল। লীলা—সেই

কামার্ত নাগরী ব্যভিচারিণী যুবতী এখন যখের খপ্পরে পড়ে গেছে হয়ত। সম্পদের সনাতন যখ তার দেহকে সকল ইচ্ছা ও তৃষ্ণাসমেত বলি দিয়ে হাতের মুঠোয় নিয়েছে আত্মাটা। চারপাশে সে বলির রক্ত ছাড়া কিছু নেই।

আর হতবীর্য ক্ষুধার্ত একটা নেড়ীকুত্তা মহাবলির হাঁড়িকাঠের চারপাশে ছড়ানো রক্ত শুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুখেন নিজেকে গাল দিচ্ছিল, কুকুর! আমি শালা একটা নিতান্ত কুকুর! আমার একটা শিক্ষা পাওয়ার দরকার ছিল।

সত্যর মত ভালো ছেলে নিরীহ সৎ-স্বামী, কম দুঃখে লীলাকে ত্যাগ করে পালায় নি! সত্যর দুঃখটা যেন বুঝতে পারছে সে—সুখেনের মনে হচ্ছিল একথা।

রাতে ঘুম হয় নি। ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সুখেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখল, মশারি ফাঁক করে মুণ্ডু গলিয়ে দিয়েছে ঘণ্টা। তার থ্যাবড়া হাত সুখেনের পায়ে। সুখেন ধড়মড় করে উঠে বসল।

ঘণ্টা একগাল হেসে বলল, বেলা হয়েছে। দিদিমণি উঠতে বললেন।

ঘড়ি দেখল সুখেন। নটা বেজে গেছে। বাইরে উজ্জ্বল রোদ। বিছানা থেকে নামতেই লীলা এল। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, এত বেলা অব্দি শুয়ে থাকো নাকি?

যার ওপর সারাটি রাত ক্ষিপ্ত থেকেছে, তার মুখটা এখন দেখেই মন প্রফুল্ল সুখেনের। জামা পরতে পরতে বলল, রাতে ভালো ঘুম হয়নি। কেন হয়নি, তা···

ঘণ্টা কথা কেড়ে বলল, আজকাল ছারপোকার বড্ড উপদ্রব হয়েছে।

ঘণ্টা, বাবুর হাত-মুখ ধোবার জল দে। লীলা আদেশ করল। তারপর ঘণ্টা বেরিয়ে যেতেই সে একটু হেসে বলল, আমি আসব ভেবেছিলে নাকি?

সাহস পেয়ে সুখেন বলল, ভাবতে দোষ নেই।

লীলা হঠাৎ চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল, একবার খুব কাছে চলে গিয়েছিলাম—ভাবতে দোষ সত্যি নেই। কিন্তু···সে থামল।

সুখেন উৎসুক হল। কিন্তু কী?

আমার আর ওসব ভালো লাগে না। ওতে কিচ্ছু নেই।

কিসে আছে লীলা?

এখনও সেটা খুঁজে পাইনি।

তুমি আমাকে খেলাচ্ছ, লীলা।

সে কথায় প্রতিবাদ না করে লীলা বলল, তোমাকে ডেকেছি শুধু একটা কথা জানতে। মুখ ধুয়ে এস। চা খেয়ে নাও। তারপর বলব।

সুখেন এক-পা এগিয়ে বলল, না। আমি এখনি শুনতে চাই। তুমি আমাকে পাগল করে ফেলেছ লীলা।

শুনলে রাগ নিশ্চয় করবে, তবে সত্যি সত্যি আর পাগল হবে না। বলতে বলতে লীলা ফের হাসল।···আমি জানি, তোমার জীবনে এমন অনেক ঘটেছে—কারণ, তোমার চেহারায় তোমার মুখের কথায় কী একটা আছে। সে-রাতে আমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলাম দেখে, যদি ভাবো, আমি বোবা মেয়ে, আমার ওই ছাড়া আর অন্য কথা থাকতে পারে না, তুমি ভুল করেছ।

সুখেন অধীর হয়ে বলল, না, তা আমি মনে করিনি। আমি জানি, তুমি অসাধারণ। কারুর মত নও।

সাধারণ-অসাধারণের কথা আসে না। লীলা জবাব দিল।···আমি যা ভেবেছ, খুব কঠিন কিছু নই। ছেলেবেলায় মা বলত, আগুন দেখে ভয় করে না, এ মেয়ের সর্বনাশ হবেই হবে। সত্যি সুখেন, আগুন দেখলেই হাত দেওয়া অভ্যাস আমার আজও আছে। পরে কষ্ট পাই।

তাহলে তুমি তারপর থেকে খুব কষ্ট পাচ্ছ লীলা—তাই তো?

পাচ্ছি।

এটুকু জানাতেই কি ডেকেছিলে?

তুমি মুখ ধুয়ে এস। চা হয়ে গেছে।

এমন কষ্ট আর কতবার পেয়েছ লীলা?

প্রশ্নটা শুনে লীলা চমকে উঠল। সুখেনের দিকে নিষ্পলক তাকাল। তারপর বলল, তোমার তাই মনে হয় বুঝি?

হওয়া স্বাভাবিক।

হ্যাঁ—সে তো ঠিকই। যে মেয়ে বড় সহজে মাঠে-জঙ্গলে ঘাসের ওপর শুয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে, সে-তো জাত ছেনাল। মজার কথা, তোমার বন্ধু এই কথাটাই একশো-মুখে রটিয়েছে।

সুখেন একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, রাগ করো না। একটু আগে তুমিও আমার উপর একই বদনাম চাপিয়েছ। কিন্তু আমার যত দোষই থাক, ভালবাসা কী আমি জানি! আমার মত ভালবাসতেও হয়ত কেউ পারে না।···

লীলা খিলখিল করে হেসে উঠল।······খুব হয়েছে। এখন চল, মুখ ধোবে। বাইরে ওরা কী ভেবে বসবে আবার।

তোমাকে আমি ভালবাসি, লীলা। বিশ্বাস করো, পাছে সতু কী ভাবে, অ্যাদ্দিন তোমার কাছে আসিনি···

ঘণ্টা এসে বলল, জল দেওয়া হয়েছে। ওদিকে চা জুড়িয়ে গেল।

লীলা বেরিয়ে গেল।

তখনকার মত আর একান্তে কথা বলার সুযোগ হল না। চা খেয়ে ঘণ্টা একেবারে বাইরের ঘরে রেখে এল ফের। সুখেন ভাবছিল, এখনই চলে যাওয়া উচিত কি-না। কিন্তু হঠাৎ সে লক্ষ্য করল, তার গায়ের চামড়া গণ্ডারের চামড়ার মত পুরু।

যা বুঝেছ, গেঁয়ো বড়লোকের একমাত্র সন্তানেরা যা হয়, লীলা তাই—অর্থাৎ খামখেয়ালী। সে যে ছেনাল নয়, এটুকু জানাতেই ডেকেছিল তাহলে! আর কিছু নয়?

সুখেনের মনে হল, লীলা যদি নিতান্ত সতুর বৌ হত—যদি না থাকত এমন বিষয়-সম্পদের উত্তরাধিকার, ওই বাজে কৈফিয়ৎটা কোনদিনই দিত না সে। বরং বরাবর একই ব্যাপার ঘটতে থাকত। সুখেন লীলাকে ইচ্ছেমত খরচ করতে পারত পড়ে-পাওয়া টাকার মত।

এটা লীলার হঠাৎ-জাগা সচেতন প্রতিঘাত। সে তার ধন-সম্পদের মালিকানাকে চালের মত ব্যবহার করছে। একথা তো সত্যি, টাকা-পয়সা মানুষকে মুহূর্তে আত্ম-সচেতন করে তোলে। আত্মসম্মানবোধ

জাগায়।

সুখেন জীবনে এই প্রথম টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পত্তির প্রতি ঘৃণায় নাক কোঁচকাল। থুথু ফেলল। আঃ, সে-রাতে লীলাকে এত ভাল লেগেছিল। স্বপ্নের পরীর মত। সেই পরী এখন তার স্বর্গরাজ্যে ফিরে গেছে—আর নিতান্ত মানুষ সুখেনের পক্ষে সেখানে পৌঁছানো যত কঠিন, প্রবেশের অধিকারও তত দুর্লভ।

দুপুরে খাবার পর সেই ঘরে ফের ডাক পড়ল সুখেনের। সুখেন দেখল, ছোট্ট কাঁসার রেকাবীতে পান নিয়ে লীলা দাঁড়িয়ে আছে। পানটা নিয়ে মুখে পুরল সে। তারপর চোখ বুজে বলে উঠল, তাহলে এবার বিদায় দাও। আর···

আর কী?

একটু উপকার করবে?

বল। সাধ্যে কুলোয় যদি করব।

কুলোবে।

কী? টাকা?

সুখেন চমকে উঠে বলল, ওকথা কেন ভাবলে?

আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লাম।

তাহলে ঠিক জায়গায় লেগেছে।

কত চাই?

তুমি দিতে পারবে কত?

আহা, কত চাও বলো। কিন্তু শোধ করবে কী দিয়ে? ভালবাসা দিয়ে নয়ত?

হেসো না। খুব ঝামেলায় পড়ে গেছি লীলা প্রেসটা কিনে।

আমাকে বেচে দেবে?

তুমি? তুমি প্রেস কিনে কী করবে? আর বেচে আমিই বা যাবো কোন্ চুলোয়?

কেন? তুমি আমার প্রেস দেখাশুনা করবে। ভালো মাইনে দেব কিন্তু।

সুখেন ওর মুখে হাসির চিহ্ন দেখছিল না আদৌ। সে বলল, ঠাট্টা করছ কেন লীলা?

বুঝেছি। মেয়েমানুষের অধীনে চাকরি করতে চাও না।

তা ঠিক নয়। যাকে ভালবাসি, তার পায়ে মাথা রাখতে দোষ দেখিনে।

ছিঃ, অত ছোট হবে কেন সুখেন!

সে তো আমার গৌরব, লীলা।

বল, রাজী আছ?

আছি।

বেশ তাহলে সেমত ব্যবস্থা করো। আমি লোক পাঠাবো শীগগীর। সবকিছু দেখে-শুনে দিন ঠিক করে আসবে। তারপর আমি নিজে গিয়ে রেজেস্ট্রীর ব্যবস্থা করব। কত টাকা লাগবে, আমার লোককেই বলে দেবে।

তোমারও শোনা দরকার।

বেশ, বল। সাধ্যে যদি কুলোয়···

সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বিদেশী মেশিন···সবিস্তারে বিবরণ দিয়ে সুখেন বলল, ঘর ভাড়া লাগে দেড়শো। আর দাম···দাম হাজার চল্লিশের মধ্যেই সর্বমোট।

এত টাকা!

তুমি কি ভাবো, প্রেস একটা ছেলেদের খেলনা?

তা ভাবি না। তবে······

তোমার লোক কে লীলা? সে প্রেসট্রেস বোঝে তো?

বোঝে বৈকি!

এখানের লোক? কী নাম?

সে শুনে তোমার দরকার নেই।

একটু-পরেই সুখেন উঠল। সঙ্গে ঘণ্টা কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসবে—সেই খালটা অব্দি। লীলা বলল, ভাগ্যে থাকলে ফের দেখা হবে। সুখেন যেন ঝড় বুকে নিয়ে ফিরল।

ছয়

খবরটা প্রথমে দিয়েছিল পিনাকী।

কিন্তু যে চালিয়াৎ লোক, ওর খবরে আমল দেয়নি সত্য। হয়ত সত্যকে নিয়ে কৌতুক করছে। এমন কৌতুকে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে সত্যর। সাদাসিদে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা এক ঝক্কিকার।

রুক্ষ কঠোর গাম্ভীর্যের মুখোস পরে তাই কাটাচ্ছিল সত্য। কী গ্রামাঞ্চলে, কী শহরে, নানা পরচর্চা আর খিস্তির জমাট আড্ডা স্বভাবত এই চায়ের দোকান। রাজ্যের গোপন কথা এখানে শোনা যাবে। সংসারে সদর-অন্দর দুটো মহাল আছে—এখানে অন্দরের খবরই বেশি রটে।

সত্য বিরক্ত হয় এতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে, এইটেই এ জায়গার ধর্ম। আঘাত লাগলে দোকান টিঁকবে না। পয়সা না আসুক দোকান রাখতেই হবে। মানুষের মুখ না দেখলে সত্য বাঁচবে না।

কিন্তু এতদিন পরে পিনাকীর মুখে লীলার একটা খবর শুনে সত্য যেন নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে গিয়েছিল। রূপপুরের খবর ধরতেই যেন জাল পেতে রেখেছে একটা। রূপপুরের লোকের শহরে যেতে হলে রাণীচক ছাড়া ভালো পথ নেই। অথচ কী আশ্চর্য শত্রুতা, কেউ তো এ দোকানে আজ অব্দি চা খেতে এল না—বাস ধরার জন্যে অপেক্ষা করার মুখে লোকে যা করে!

কথাটা ভুল হতেও পারে। রূপপুরের সকল মানুষকেই কি সত্য চেনে? ওরা তাকে চিনতে পারে। কিন্তু কে আর যেচে লীলার খবর শোনাবে তাকে···বিশেষ করে যখন এটা নিতান্ত তাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, প্রকৃত কী ঘটেছে, কেউ তেমন জানে না। লীলার চরিত্রে কালি ছিটানোয় খুব একটা কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। সত্য লীলার স্বামী না হলে কথা ছিল। যে-স্বামী স্ত্রীকে প্রকাশ্যে, এই দোষ দেয় তার মাথায় ছিট আছে বলে লোকের সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। বরং অনেকে তো বলেছিল, একি শুনছি সত্য, ছিঃ! হাজার হোক, রূপপুরের গোমস্তা মশায়ের মেয়ে।

সদ্বংশ, বড়লোক। অপবাদ দিলে নিজের আখেরই নষ্ট হবে, তার গায়ে আঁচড়টি লাগবে না।

হয়ত ধনসম্পদের প্রতি মানুষের চিরকেলে মোহ থেকেই এ ক্ষীণ প্রতিবাদ ওঠে। সত্য ভাবে।

পিনাকী শহর থেকে ফিরে বলেছিল, তোর বৌকে দেখলাম সতু, মাইরি, ছু। চোখের দিব্যি।

সত্য মুখ তুলে তাকিয়েছিল শুধু।

রিকসোয় যাচ্ছে। সঙ্গে কে একজন রয়েছে। চেনা মনে হল, কিন্তু চিনতে পারলাম না।

তা পয়সা থাকলে শখ মেটাতে যেতেও পারে শহরে। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। সঙ্গের লোকটা সুখেন নয় তো? কিন্তু লীলা তাহলে বহরমপুর যাওয়া আসা করে। কোন্ পথে যায়? একদিনও তো চোখে পড়ল না।

কিন্তু সে মুহূর্তে নিজের কাছে ধরা পড়ে গেছে সত্য। লীলা তার মগজের লুকিয়ে থাকা পোকা। হঠাৎ কুট করে কামড়ে দিয়েছে।

নিজেকে সামলে নিয়েছিল সত্য। লীলাকে সত্যিসত্যি ভালোবেসেছিল? পুরো দুটি বছর সহজাত আলসেমির মধ্যে কেটে গেছে দিনগুলো। স্ত্রীকে যে ভালোবাসতে হয়, যেন মনে ছিল না। ও ছিল তার কাপড় রাখা আলনা, শোবার তক্তপোষ, থালার অন্ন।

সেদিন যমুনা সদ্য স্নান করেছে। ভেজা এলোচুল পড়ে আছে পিঠে—অরণ্যের মত গভীর মনে হয় হঠাৎ। তখনও ব্লাউজ গায়ে পরেনি। ভেজা কাপড় মেলে দিচ্ছে উঠোনের রোদে। সত্য তাকাচ্ছিল।

এতদিনে বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছে যমুনার ছিপছিপে শরীরখানি। লাবণ্যে উজ্জ্বল টানটান চামড়ায় জলের ফোঁটা জমতে পারছে না। গড়াচ্ছে। নিটোল বাহুর দুপাশে ভাঁজ, কোমরে ভাঁজ, বুকের দুপাশে ভাঁজ—পাপড়ির মত অনেক ভাঁজে রাখা এক অলৌকিক ফুল। কেন্দ্রে তার পরাগের মত স্মিত প্রস্তুত যৌবন। প্রথম যৌবন।

সেদিন রোববার। স্কুলের ছুটি। স্কুলে ওকে কথামত ভর্তি করেছিল

সত্য। যমুনা বেশ মেধাবী মেয়ে।

চাঁপা ঝি কাজ করে চলে গেছে। বাড়িতে জনপ্রাণীটি নেই দুজন ছাড়া। যমুনা সত্যর সামনে এসে যেন একটু হেসে ঘরে ঢুকছে—হয়ত জামা পরতে, শাড়িটা ভালো করে জড়িয়ে নিতে—ঘরে পা বাড়িয়ে সত্য মুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে পেল। কী করতে যাচ্ছিল সে?

যমুনা বলল, কী হল মামা? মাথা ধরেছে?

মাথাটা দুহাতে ধরে সত্য তক্তপোষে বসে পড়েছিল। বলল, হ্যাঁ।

এই খাবার সময় তোমার মাথা ধরল? যমুনা উদ্বিগ্ন মুখে বলল। শুয়ে পড়। টিপে দিই।

থাক। তুমি ভাত বাড়ো।

মাথাধরা নিয়ে খেতে নেই। বমি হয়ে যাবে।

অতি দুঃখে সত্য হাসল।...তুমি কি ডাক্তার যমুনা?

যমুনা মিষ্টি হাসল।...এ ডাক্তারী সবাই করে। বলে সে ঠোঁট বাঁকিয়ে এক মুহূর্ত এপাশে ওপাশে ঘুরে, কি যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এভাবে, টেবিলের দরাজটা খুলল। একটা ট্যাবলেট ছিল এতে। মাথাধরার ট্যাবলেট। গেল কোথায়?

সত্য হেসে ফেলল এবার সশব্দে। মাথা ধরার? তাহলে তো খাওয়া যাবে না।

যমুনা কথায় কান না করে সত্যি খুঁজে বের করল ট্যাবলেটটা। সর্বনাশ, এবারে নির্ঘাৎ না গিলিয়ে ছাড়বে না। সত্য উঠল হন্তদন্ত হয়ে।

ওকি! খাবে না? দাঁড়াও, জল আনি।

নাঃ, তেমন কিছু নয়। ভাত বাড়ো।

যমুনা অগত্যা ভাত বাড়তে গেল। সত্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে গাল দিয়ে বলল, শালা খচ্চর। তোর দ্বারা কিস্সু হবে না।

রাতে যমুনার কাছে লীলার খবরটা শোনাল সত্য। শুনে যমুনা কোন মন্তব্য করল না। সে স্কুলের বইতে চোখ রাখল। সত্য বলল,... হ্যাঁ, মন দিয়ে পড়াশোনা কর। কোনদিকে মন রেখো না। কেমন?

কিন্তু সামনে ফের রাত্রি। একের পর এক কালরাত্রি আসে। সত্যকে কুরেকুরে খায় ঘুনপোকা। সে ছটফট করে। বিড়ি ছেড়ে সিগ্রেট ধরেছে সত্য। সকালে মেঝেয় স্তূপীকৃত পোড়া সিগ্রেট আর ছাই দেখে যমুনা বলে, মামা, অত সিগ্রেট খাও কেন? ফুসফুসে ঘা হবে দেখে নিও।

সত্য বলে, তারপর কী হবে? মরে যাবো, এই তো।

যমুনা বলে, কষ্ট পাবে।

সত্য বলে, কী কষ্ট? তারপর ফের সিগ্রেট জ্বালে। ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

যমুনা বলে, মামা, তোমার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে।

সত্য বলে, তাই নাকি?

একটু ঝুঁকে ফিসফিস করে যমুনা বলে, মামা একটা কথা বলছিলাম···

লীলার কাছে যাবার প্রস্তাব শুনে সত্য এত জোরে হাসে যে যমুনা ভয় পেয়ে যায়। তারপর সত্য বলে, তুই সে খানকিকে চিনিস না যমুনা। রাক্ষসী যদি ছেনাল হয়, তাকে কী বলে জানিস?

শূর্পনখা? যমুনাও খিলখিল করে হাসে।

ঠিক বলেছিস। সত্য গুম হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্যে।

কখনও তুমি, কখনও তুই-তোকারি, সত্যর এই অভ্যাস। তবে যমুনা জেনেছে, ওর মন যখন সরল থাকে, তখন তুইতোকারি করে। পুরুষের চোখের ভাষা তো বটেই, শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাষা ক্রমশঃ যমুনাকে শেখাচ্ছে তার বয়স। যমুনা বোঝে। বোঝে, কখন সত্য তাকে তুমি বলে।

সেদিন যমুনাই প্রস্তাব করে বসেছিল, মামা, অ্যাদ্দিন আছি—একবারও তো সিনেমা দেখিয়ে আনলে না?

সত্য সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

এবং সেদিনই সিনেমাঘরের সামনে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল লীলার সঙ্গে। পাশে সুখেন। খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ঘটনা।

মাথা উঁচু করে যমুনার হাত ধরে তাদের সামনে দিয়ে গটগট করে এগিয়ে গেল সত্য। পিনাকী মিথ্যে বলেনি।

যতক্ষণ সিনেমা চলল, ছবিতে তার চোখ কেবল লীলাকেই দেখছিল। ছবির মেয়েদের ঠোঁটের ভাঁজে, হাসিতে, কথায়—প্রতিটি আবির্ভাবে সে আনমনে লীলার আদল মিলিয়ে দেখছিল। যমুনা মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকিয়েছে। দেখেছে সত্যর মুখটা পিছনে ফেরা। যমুনার একটা হাত ঘনিষ্ঠভাবে ওর জানুতে রাখা ছিল আর সেটা আলগোছে ধরে ছিল সত্য। একটু একটু চাপ দিচ্ছিল। যমুনার মন ছবিতে ভরা, তার গ্রাহ্য নেই। কিন্তু যখনই সত্যর হাত থেমেছে, যমুনা মুখ ফিরিয়ে সত্যকে দেখেছে। সত্যর চোখ এই গরম ভ্যাপসা আবছায়ায় বেড়ালের মত জ্বলে উঠে অন্যদিকে কী খুঁজছে।

এক সময় যমুনা চিমটি কেটে ফিসফিস করল, ওদিকে কী দেখছ? পরক্ষণেই ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে হাসি তার। সে ভেবেছে, পিছনে কোথাও মেয়ে দেখছে সত্যমামা—যা স্বভাব!

অপ্রস্তুত সত্য ছবিতে চোখ রেখেছে ফের।

ফের যখন সে মুখ ফিরিয়েছে, যমুনা তার হাতটা তুলে নিল। সত্য গ্রাহ্য করল না। তখন বেশ একটু সরে সোজা হয়ে বসল যমুনা।

ইণ্টারভ্যালে আলো জ্বলে উঠতেই সত্য যেন ঘুম থেকে জাগল—চলতি বাসে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ যাত্রী যেমন সোজা হয়ে বসে।

সে চোখ মুছে হাই তুলে একটা হাতে যমুনার সীটের পিছনটা বেড় দিল। তারপর একটু সরে যমুনার গা ঘেঁষে বলল, কিছু খাবে? চানাচুর না পটাটোচিপস্?

যমুনার মুখটা থমথম করছে। দুহাত বাড়িয়ে সামনের সীটটা আলগোছে ধরে একটু ঝুঁকল সে। মাথায় পরিপাটি হালফ্যাসানে খোঁপা—ডিমালো দেখাচ্ছে মাথাটা। খোঁপা নাড়া দিয়ে সে জানাল, কিছু খাবে না।

ব্যাপার কী? সত্য তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, কী হয়েছে যমুনা? মাথা ধরেনি তো?

যমুনা মুখ তুলল।. আবছায়া কাঁপছে মুখে। গাল দুটো অসম্ভব ফোলা দেখাচ্ছে।

সত্য ফের প্রশ্ন করল, কী হল তোমার যমুনা?

কিছু না।

মাথা ধরেছে?

হ্যাঁ, তোমার যেমন ধরে!

অন্যসময় হলে হাসিতে হলটা তোলপাড় করে ফেলত সত্য। এখনও ইচ্ছে করে। কিন্তু পারল না। যমুনা রাগ করল কেন?

লীলা যে এখানে আছে, সেকথা যমুনা হলের মধ্যে ঢুকেই শুনেছে। কিন্তু এতগুলো মেয়ের মধ্যে কোন্ মেয়েটি তার লীলামামী, তার পক্ষে চেনা মুশকিল—আদতে সে দেখেইনি কোনদিন তাকে। দেখিয়ে দিতে বলেছিল। সত্য বলেছিল, এখানে দেখছি না। নিশ্চয় ব্যালকনিতে আছে।

কথাটা মিথ্যা বলেছিল। লীলা তার পিছনে তিনসারির পরে আছে, কোণার সীটে। লীলাও কি তাকে দেখছে? ঠিক তাই খুঁজছিল সত্য।

আলো জ্বললে আর সাহস হল না সত্যর মুখ ফেরাতে।

বিজ্ঞাপন দেখানোর সময় সে কোকাকোলা কিনে ফেলল দুটো। জোর করে যমুনার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, রাগ করছ কেন, তা বুঝেছি। কিন্তু যা ভাবছ, তা ঠিক নয়।

বোতলটা হাতে নিল যমুনা। ঠোঁটে নলটা চেপে বলল, রাগ করব কেন?

তোমার মামীকে লুকিয়ে দেখছি না।

বা রে! তাতে আমি রাগ করব কেন? মামী কি আমার সতীন?

কী বললে? সত্যর চোখ বড় হয়ে উঠল। দাঁত বেরিয়ে গেল।

কিছু না। ও তোমার শুনতে নেই।

বলই না শুনি?

শুনে আবার চালাকি হচ্ছে! যাও বলব না!

মামীকে সতীন বলেছ, তোমার পাপ হবে।

পাপ আবার কী?

জানো না?

নাঃ।

তবে কেন সেদিন কেঁদে ফেলেছিলে খুকি?

ভয়ে।

কিসের ভয়ে?

এবার যমুনা আশ্চর্য নির্লজ্জ কটাক্ষে ফিসফিস করে উঠল, আমি ওসব কখনো করিনি।

সত্যর দু কান গরম হয়ে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। মাথা ঘুরে উঠেছিল। অসহ্য গরমে ব্রহ্মতালু জ্বলছিল। জানুদুটো ভার বোধ হচ্ছিল। সে ক্রমশ কেন্নুইন কিংবা শামুকের মত গুটিয়ে যাচ্ছিল একটা অজ্ঞাত ত্রাসে।

তারপর দারুণ ঘৃণায় সে যমুনার দিকে তাকাল। তার দেহটাই দেখছিল সে। মনে হচ্ছিল, সামনে ফের এগিয়ে এসেছে সেই নরকের অগ্নিকুণ্ডটা—ঝলসে যাচ্ছে তার সারা শরীর।

কোকাকোলার বোতলটা হাতে ঠেলে দিয়ে যমুনা বলল, এখনও তোমার হয়নি! লোকটা বোতল নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে যে!

বোতলদুটো আর পয়সা দিতেই আলো নিভল। ছবি ফুটল পর্দায়। তখন সত্য বলল, এমন করে কথাটা বললি যে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল! তুই মরবি যমুনা।

মরব না। যমুনা শান্তস্বরে জবাব দিয়ে এবার নিজেই হাত রাখল সত্যর জানুতে। ফের বলল, তুমি তো আমার আপন মামা নও।

খুব হয়েছে। সত্য বলল। এবার যা দেখতে এসেছ, দেখ।

আমার একশোটা চোখ আছে জানো? একসঙ্গে সব দেখছি।

ঘাট হয়েছে লক্ষ্মী।

এই, মুখ ঘোরাচ্ছ কেন? ফের!

কই, না তো! ছবি দেখছি।

সামনের সীট থেকে কে খেঁকিয়ে উঠল—আঃ কী হচ্ছে মশাই, চুপ

করুন না। ঘরে গিয়ে হবে।

এবং খুব কাছেই হঠাৎ শিস দিল কে।

দুজনে সঙ্গে সঙ্গে মরা মাছ একেবারে।

সত্য বুঝতে পারেনি, আদৌ সে বাঁচতে চেয়েছে কিনা নরক থেকে। হয়ত বা নরকটাই তার ভ্রম। যমুনার পাপ থেকে বাঁচতে লীলাকে দরকার ভাবছিল, শেষে ব্যাপারটা গুলিয়ে গেল যেন। লীলার হাত থেকে বাঁচতে যমুনাকে তার হয়ত ভীষণ দরকার।

তবে সত্য যে দুটো বাঘের পাল্লায় পড়েছে, এটা বুঝল। মনের বাঘ আর বনের বাঘ। লীলা মনের বাঘ, যমুনা বনের। কাকে দিয়ে কাকে ঠেকাবে সে!

সিনেমা ভাঙলে ভিড়ের মধ্যে লীলা আর সুখেনকে সে খুঁজে পায়নি। হল থেকে যখন লোকজন বেরোচ্ছিল, ওর হাতটা শক্ত করে ধরেছিল যমুনা। বলেছিল, দাঁড়াও, ভিড় কমুক।

বাইরে বেরিয়ে সত্য বলেছিল, অনেকদিন সিনেমা দেখিনি। মাথা ধরে গেছে। বইটাও বাজে।

যমুনা তর্ক করেছিল ছবি নিয়ে। তার অসম্ভব ভালো লেগেছে। গ্রামের মেলায় ছবি দেখেছে অনেকবার। সে-ছবি এত বেশি কাঁপে—কণ্ঠস্বরও ভূতের মত শোনায়! যমুনা বলছিল। এখানে ছবি এত স্পষ্ট, গলার স্বরও অবিকল যেমনটি শোনায। সে কিন্তু বারবার ছবি দেখতে চায়। সত্যকে দেখাতে হবে। নৈলে…

নৈলে এমন রাগ করবে যে, সত্যকে ভাবিয়ে তুলবে। শেষঅব্দি খাওয়া বন্ধ করবে। তখন? সত্য কি চাইবে, সে অনশনে মারা যাক? পারবে সইতে যমুনার মলিন মুখখানি? গায়ে হাত ছুঁয়ে বলুক সত্যমামা।

সত্য রাজী। রাজী না হয়ে উপায় আছে তার?

হাঁটতে হাঁটতে ওরা গঙ্গার ধারে এল। যমুনা হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, ওই যাঃ! মাসিক-পত্রিকা কেনা হল না যে? আর, কী ওষুধ কিনবে

বলেছিলে মামা ?

তাইতো ! কিন্তু এখন দোকানপত্র সব বন্ধ হয়ে গেছে। সত্য বলল।···থাক, পরে যখন আসব···

ওষুধের দোকান খোলা আছে। ওই তো, দেশবন্ধু ফার্মেসী। যমুনা দেখাল।

এত পাকা মেয়ে। সব জানে, সবদিকে চোখ। শহরে জন্ম হলে নির্ঘাৎ মাদামকুরী হত। সত্য বলল, থাক। ভাল্লাগে না। চল। খেয়া এসে গেছে ঘাটে।

কিসের ওষুধ কিনতে চেয়েছিলে ? নৌকোয় উঠে যমুনা প্রশ্ন করল।

এ এমন মেয়ে, পৃথিবীর সবকিছু তার জানা থাকা চাই। পড়াশুনায় এত ভালো যে দিদিমণিরা তারিফ করেন। তবে ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়স ওর, ফ্রকপরা। খুকুদের দলে ওকে মানায় না। ফ্রক পরলে অবশ্যি মানিয়ে যাবার কথা—মেঘের আড়ালে সূর্য রাখা যায় অনায়াসে। যমুনার বড় অনিচ্ছা ফ্রকে।

সত্য যমুনার এই সব ব্যাপারগুলো ভাবছিল। প্রশ্নটা সে সময় শুনে এত খারাপ লাগল তার। কারণ, জবাবটা তারই জানবার কথা—সে জবাব নিজের কাছেই বীভৎস মনে হবে এখন। সত্য নিজের মনকে পবিত্র রাখতে চাচ্ছিল। পায়ের নীচে অন্ধকারে প্রবাহিনী জল, ঠাণ্ডা বাতাস, হেমন্তের আকাশে উজ্জল নক্ষত্রপুঞ্জ—যেন এ-সময় শুচিতার নিশ্বাস গ্রহণ করার সাধ যায়। পৃথিবী আর মানুষ, মানুষের জীবন হঠাৎ খুব ছোট মনে হয়। মনে হয় সংকীর্ণ অনুদার দীন।

আর চিতা জ্বলছিল গঙ্গার ধারে। হরিধ্বনি দিচ্ছিল শবযাত্রীরা।

নক্ষত্রেরা আকাশের নীচে হেমন্তের হিম জলে কাঁপছিল ঝিকিমিকি। সত্য জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিছু ভাবতে চেষ্টা করছিল। লীলা যমুনা দেহ যৌবন কাম ভালোবাসা। কাকে ফেলে এল ওপারে—কাকে নিয়ে চলেছে এপারে—জীবনে সে যেন একটা সেতুর মত স্থির থাকতে চাচ্ছে। কেন ?

কেন ? ভারী খস্‌খসে আওয়াজে সত্য যমুনার দিকে তাকিয়ে বলল,

কেন ?

কী কেন ? যমুনা অবাক হয়েছে একটু ! আজকাল সত্য অনেক সময় হঠাৎ এলোমেলো কথা বলে বসে। এও হয়ত তাই। চাঁপা ঝি তাকে বলেছে, ওকে যত্নআত্তি ভালোমত করো মা। লোকে পাঁচ কথা বলছে। কী পাঁচ কথা ? যমুনা প্রশ্ন করেছিল। বৌর শোকে লোকটা নাকি পাগল হয়ে যাচ্ছে ! হবে না ? সোমত্ত বৌ, সোমত্ত যৌবন। মুখে লাথি মারলে স্বামীর।

শুনে যমুনা হেসে বাঁচে না। যাও। ও এক সাধের পাগল—মাছ না হলে ভাত ওঠে না, মাগ না হলে রাত কাটে না।

চাঁপা লজ্জায় একহাত জিভ কেটেছিল। ও মা গো। ছি ছি, মেয়ের মুখে এ কি কথা ! বাবা-কাকার তুল্যি, গুরুজন। ও কথা বলতে আছে ? তুমি না ইস্কুলে পড়া মেয়ে ?

কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছিল যমুনার। সেই থেকে চাঁপাকে দেখিয়ে ও ভক্তিশ্রদ্ধার বান ডাকিয়ে দেয় সত্যর ওপর।

কী শুধোচ্ছ মামা ? যমুনা ফের বলল সত্যকে।

ঘাটে ভিড়েছে নৌকা। উঠতে উঠতে সত্য বলল, বলছিলাম ওষুধ কিনে কী হবে ?

কী হবে, তুমিই জানো। যমুনা ওর হাত ধরে টলতে টলতে ঘাটের মাচানে নামল।

ঘাটের ওপর ছোট্ট বাজার। বাস-স্টেশন। বাস-রিকশার বড় ভিড়। সত্য বলল, চল রিকশায় যাই, ঘন্টাখানেক লাগবে। বাস ছাড়তে দেরী আছে। মাথাও ধরেছে বড্ড। খোলামেলায় ছেড়ে যাবে।

ওরা রিকশা করে আসছিল।

রেল-লাইনের গেট পেরিয়ে সত্য যমুনার কোমর বেড় দিয়ে ধরে বলল, ওষুধটার কথা শুনলে তুমি হাসবে যমুনা।

হাসলে ক্ষতি কী ? যমুনা একটু হেলে পড়ল ওর জানুর দিকে। অন্ধকার নির্জন পথ। দুপাশে মাঠ। রিকশাটা ছুটেছে জোর—পিছনে

প্রথম উত্তর হাওয়ার বেগ।

যমুনা মরেছে। নির্ঘাৎ মরেছে। সত্য টের পাচ্ছিল। এ যমুনার ভালোবাসার বোধ নয়, এক তীব্র উদ্দাম শক্তির বন্যা যমুনার বয়সের দুকূল ভাসিয়ে ফেলতে চায়। একটা চক্ষুহীন পিশাচ তার দেহটা দুহাতে লুটে আগুনে ঝলসে খাবে চিবিয়ে। সত্য নিজেই সেই আগুনের কুণ্ড। আগুনের ধর্ম পোড়ানো—আগুনের দোষ নেই।

সত্য মুখ নামিয়ে চুমু খেল যমুনার ঠাণ্ডা বিস্ফারিত ঠোঁটে। আর যমুনার চোখের সামনের নক্ষত্রভরা আকাশটা কিছুক্ষণের জন্যে মুছে গেল। তার ঠোঁট স্থির। শান্ত। গ্রহণ করছে কিনা প্রকাশের ভাষা নেই।

তারপর এক সময় সত্য ওর ঠোঁটে গালে আঙুল বুলিয়ে দিতে গিয়ে বুঝতে পারল, গালটা ছপছপ করছে।

কাঁদছ? ফের কান্না? কেন যমুনা? চাপা কণ্ঠস্বরে কিকিয়ে উঠেছে সত্য।

যমুনা উঠে বসল সীটে। গাল মুছে জবাব দিল, ও কিছু না। রাণীচক কতদূর আর?

এখনও পাঁচ মাইল!

উঃ!

কী হল?

কিছু না।

ঘর নয়। যেন নরকের দরজা খুলে সত্য নরকের প্রহরীর মত বলল, এস। মুখ নীচু করে পাপীদের মত ঢুকল কিশোরী যমুনা। অন্ধকার ঘরে উত্তাপ ছিল প্রচুর। বাইরে অনেকটা সময় হিমে ভিজে থাকার পর এ উত্তাপ দুজনেরই ভালো লাগছিল। আর যমুনা শুয়ে পড়ল বিছানায়। নিঃশব্দে সত্য বলল, কিছু খেতে হবে। সে জবাব দিল না। সত্য তার পাশে বসে তার দুটি কাঁধ ধরে একটু ঝুঁকল। সে হাঁফাচ্ছিল।...আর পারছিনে যমুনা, অসহ্য লাগছে। তুমি ভয় করো না লক্ষ্মীটি।...দাঁতে দাঁত চেপে যাচ্ছিল তার। সে বিড়বিড় করছিল।...আমি তোমাকে

বিয়ে করব। পৃথিবী একদিকে যাক আমি অন্যদিকে দাঁড়াব তোমাকে নিয়ে। দরকার হলে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবো যমুনা। কলকাতা যাবো। সেখানে কেউ চিনবে না আমাদের। বল, তুমি রাজী। যমুনা, যমুনা, যমুনা, কথা বল। সত্য গোঙাচ্ছিল—আমি তোমাকে জোর করছি না। করব না কোনদিন। তোমার সম্মতি ছাড়া গায়ে হাত দেব না। বল, তুমি একবারটি সম্মতি দাও। যমুনা এই, শুনছ ?

যমুনা এতক্ষণে নড়ে উঠল। তারপর তীব্র অথচ অস্ফুট কণ্ঠস্বরে বলে ফেলল, না। যমুনা ছটফট করতে লাগল অজগরের গ্রাসে পাখির মত। বারবার বলতে থাকল, না, না, না।

সত্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে এল। পকেট থেকে দেশলাই বের করে হেরিকেন জ্বালল। আলোয় ভরে গেল ঘর। যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল এতক্ষণে।

সত্য আস্তে আস্তে বলছিল, মাঝে মাঝে আমার মাথাটা খারাপ করে দিস্ যমুনা, তুই বড় দুষ্টু মেয়ে। কেন অমন করিস বল তো ? সাপ নিয়ে খেলতে নেই।

যমুনা জবাব দিল না।

সাত

লীলা বলল, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে। চল, গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি কিছুক্ষণ।

রিকশো থামিয়ে সুখেন বলল, তোমার ইচ্ছে। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

লাগুক। ননীর গতর তো নয়, সইবে। বলে লীলা নামল রিকশো থেকে।

দুজনে হাসপাতালের পাশ দিয়ে আসছিল। রাস্তার দুপাশে বড়-বড় গাছ। গাছের পাতার ফাঁকে ল্যাম্পপোস্টের আলো ঝিকমিক করছে। রাস্তার ওপর কোথাও-কোথাও কিছু অন্ধকার। অন্ধকারের

সুযোগে লীলা সুখেনের হাতটা ধরে থাকছিল। আলোয় এলে ছেড়ে দিচ্ছিল। সুখেন বলছিল, তোমার অত লজ্জা কেন? লীলা কথা বলেনি কিছুক্ষণ।

বাঁপাশে জেলখানার লম্বা পাঁচিল। এতক্ষণে ঢঙঢঙ করে গেটের ওদিকে নটার ঘণ্টা বাজল। তখন লীলা বলল, দশটার মধ্যেই ফিরতে হবে। জেঠিমা কী ভাববেন।

ডানপাশে বাঁধের ওপর ওরা উঠল। একটুখানি এগিয়েই গঙ্গার দিকে নামল। ভাঙন রুখতে দীর্ঘ সমান্তরাল একটা বন রচনা করেছে সরকারী বনদপ্তর। লীলাকে ইতস্তত করতে দেখে সুখেন বলল, এ বনে বাঘ নেই।

দূরের আলোয় হলুদ একটা আভা পড়েছে লীলার মুখের উপর। মুখটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সুখেনের কথা শুনে সে হাসল। বলল, রূপপুরের ওদিকে ছেলেবেলায় বাঘ আসত শুনেছি। বাঘের ভয় গা-সওয়া।

শুনেছ? দেখনি তো?

দেখেছিলাম হয়ত।

বল কী!

বিলের ওদিকে জঙ্গল আছে। একবার পাকা বৈঁচি খেতে গিয়ে একটা ডোবামত জায়গায় নেমেছি। হঠাৎ মনে হল একপাশে বড় বড় লতার আড়ালে কী যেন শুয়ে আছে—শুকনো পাতার ওপর ডোরাকাটা গা।···

ভয় পেলে না?

পেলাম। পা টিপে টিপে সরে এলাম।

লীলা আরও গুটিকয় বাঘের গল্প বলল। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কেমন শান্ত আর অন্যমনস্ক মনে হল সুখেনের। সুখেন তার পিঠে একটা খোঁচা মেরে বলল, কী ব্যাপার? খুব চোট খেয়েছ মনে হচ্ছে! সত্যি?

দায় পড়েছে! পায়ের জুতো মাপে হল না বলে ফেলে দিয়েছি। কে কুড়িয়ে পায়ে পরল কিনা আমার সে মাথাব্যথা নেই। লীলা কঠোরস্বরে জবাব দিল।

ছিঃ, হাজার হোক স্বামী।

লীলা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ও-কথা তুললে এক্ষুনি চলে যাব।

বেশ, বলব না, এস।

দুজনে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হেঁটে গঙ্গার ধারে পৌঁছল। মাটি ভিজে হয়ে আছে সবখানে। এদিকটা অন্ধকার, কিন্তু সব স্পষ্ট দেখা যায়। বসার জায়গা খুঁজে পাচ্ছিল না ওরা। কিছুদূর ঘুরে একটুকরো ঘাসের চত্বর পাওয়া গেল। রুমাল বিছিয়ে দুজনে বসল।

লীলা, তোমার মন ভালো নেই। আমার খারাপ লাগছে।

খুব ভালো আছে।

তবে কথা বলছ না কেন?

কী বলব?

এখানে এলে কেন?

খোলাবাতাসে মাথা ছাড়াতে এলাম।

পা ছড়িয়ে সুখেন বলল, এখানে মাথা রাখো, টিপে দিই।

বাঃ, কেউ দেখবে।

কেউ কোথাও নেই।

লীলা শান্ত মেয়ের মত ওর জানুতে মাথা রাখল। পা-দুটো ছড়িয়ে দিল। তার চোখে নক্ষত্রভরা আকাশ। সে আকাশ দেখছিল।

লীলা, ফের এমন করে তোমাকে পাব, আশা করিনি। এত সরে গিয়েছিলে—উঃ, বুক ভেঙে দিয়েছিল আমার। তোমার দিব্যি।

এবার জোড়া লাগল তো ভাঙা বুক? লীলার দাঁত নক্ষত্রের আলোয় চকচক করে উঠল।

সুখেন মুখ নামিয়ে দিল।

সুখ?

কী বললে?

সুখ বললাম।

তোমাকে কী বলব লীলা?

যা খুশি।

যা খুশি! তাহলে লীলা বাদ দিয়ে রাণী বলি।

ইচ্ছে।

রাণী!

কেউ আসছে না তো?

নাঃ। কী বলতে যাচ্ছিলে যেন?

লীলা চোখ বুজে রয়েছে। দাঁতে নক্ষত্রের আলো। নিঃশব্দ হাসি ছড়ানো শান্ত ঠাণ্ডা মুখে। সে জবাব দিল না। সুখেন বারবার চুমু খেল।

পেছনে ঘন গাছপালা, সামনে নদী। নির্জন রাত। সুখেন সেই অভাবিত প্রথম রাতটার মত লীলাকে পেতে চাইছিল। তার প্রতিটি রোমকূপ থেকে দাঁত গজিয়ে লীলার শরীরে বিঁধছিল।

বাঘ যেমন করে শিকার নিয়ে বনে ঢোকে, তার ইচ্ছে করছিল সে তেমনই বাঘ হয়ে ওঠে। হঠাৎ লীলা উঠে দাঁড়াল। খুব সস্তা হয়ে গেছি না? যখন খুশি, যেখানে খুশি ·····কী ভেবেছ?

সুখেন বিরক্ত। বিরক্তি চাপতে পারল না সে। বলল, ঠিক আছে। তুমি একা চলে যাও। আর কখনো এমন করে এসো না।

লীলা হেসে উঠল।···যেতে পারব না ভাবছ নাকি?

বেশ তো যাও।

তুমি এখানে একা বসে থাকবে?

থাকব।

কী পাবে আর?

পেতে চাইনে কিচ্ছু।

টাকা?

হঠাৎ টাকার কথা কেন?

টাকাও চাও না?

সুখেন ক' মুহূর্ত গুম হয়ে থেকে বলল, ছিঃ লীলা, তুমি মাঝে মাঝে নিজেকে এত ছোট করে ফেলো কেন? আমি টাকার জন্যে তোমার ভালোবাসি না।

লীলা ওর হাত ধরে টানল। রাগ করো না, এস।

থাক মিথ্যে মায়ায় কাজ নেই। আমি এখানে থাকব কিছুক্ষণ।

বারে! একা এত রাত্তিরে ফিরব, ওরা কী বলবেন?

বলবে, প্রেসে কাজ হচ্ছিল, দেখছিলে।

কিন্তু একা কেন?

শহরের মধ্যে একাদোকা বলে কিছু নেই। এ তো তোমার রূপপুর নয়।

লক্ষ্মীটি, ঘাট মানছি, ওঠ।

উঠব, যদি কথা শোন।

কী কথা? টাকা-পয়সা নয়তো?

হাসতে হাসতে সুখেন উঠল।...টাকা তোমাকে পাগল করে দেবে, দেখছি। চল।

দুজনে হাঁটতে লাগল পাশাপাশি।

বনের মাঝামাঝি এসে হঠাৎ লীলা বলে উঠল, দুয়ো! এই তোমার সাহস! সব ফুরিয়ে গেল এরই মধ্যে?

সুখেন মুহূর্তে বুঝেছে।

রূপপুরের আদিম পৃথিবীর বনকন্যা যেন খিলখিল করে হাসছিল।

এতক্ষণে বাঘ তার শিকার মুখে নিয়ে বনে ঢুকল।

কাঁটাতারের বেড়ায় লীলার আঁচলের টুকরোটা গাছপালার ফাঁকে ছুটে আসা আলোয় ঝকমক করছিল শুধু। আহা, শাড়িটা মাত্র ক'দিন আগে কেনা—সাহা ব্রাদার্সের মালিক নিজে বেছে দিয়েছিল ওকে। টেরিলিনের টুকরো—যা বোম্বের ওদিকে কোন প্রখ্যাত বয়নকুশলীর মগজ ঘাস করে দিচ্ছিল হয়ত, এখানে এসে বনের অংশ হল।

কেউ ছিল না কোথাও। কোন মাতালও না। কেবল একটা ঘরছাড়া গাধা দাঁড়িয়েছিল এত রাতে গাছের নিচে। কাঁটাতার ডিঙিয়ে যাবার সাধ্য তার নেই।

সত্য হয়ত এই বিষম ফাঁকিবাজ গাধাটাকেই দেখে থাকবে!

বড় উদ্দেশ্যহীন তার দাঁড়িয়ে থাকা। কাঁটাতারের অর্থও সে বোঝে

না। হয়ত বোঝে না শহরের পাশে এ-বনের হেতুটাও।

ওরা যখন বেরিয়ে এল, গাধাটা ওদের দেখেছিল। হঠাৎ দুজনেরই মনে হল, কী উদ্দেশ্যে এত আয়োজন। কিন্তু ক্লান্তি চেপে ধরায় ওরা মুখ তুলে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল না। পারছিল না।

আট

কিছুদিন পরের কথা।

যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিল সত্য। মুখ তুলে সাইনবোর্ডটা দেখছিল। লীলা প্রেস! ভিতরে যন্ত্রের শব্দ। আর একফালি করিডোরের শেষ প্রান্তে টেবিলে কে নিবিষ্টমনে কাজ করছে।

সুখেন! লীলা তাহলে এখানে বাড়িও কিনেছে হয়ত। রূপপুরে সব বেচে দেয়নি তো?

সত্য রাস্তার বিপরীতে রেঁস্তোরাটায় ঢুকল। বেশ পরিচ্ছন্ন রেঁস্তোরা। এমন একটা খোলা যায় না রাণীচকে? আজকাল রাণীচকের পসার বেড়েছে। নিত্যিনতুন আপিস বসছে। ইলেকট্রিরি এসে যাচ্ছে শীগগীর। ইটভাটার পাশে টালির কারখানা খুলেছে হাটুবাবু। বাজারে মাড়োয়ারীরা চড়া দরে জায়গা কিনছে। দোকানপাট অনেক বেড়ে গেল দেখতে দেখতে। সিনেমা হলের জায়গা কিনতে এসেছিল আজিমগঞ্জের কোন জৈন ব্যবসায়ী। পঞ্চায়েত তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। এলাকাকে ফতুর করে ছাড়বে না ওরা?

তবে এমন ঝকঝকে রেঁস্তোরা একটা খোলা যায়। সামনে একফালি ফুলের বাগান থাকবে। একেবারে হালফ্যাশনের ঢঙে। অনেক জায়গায় এমন দেখেছে সত্য।

যেখানে বসেছে, সোজা প্রেসটা দেখা যায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সত্য ভাবছিল, শয়তানটাকে এখানে ডাকলে ক্ষতি কী? ওর সঙ্গে তো কোন ঝগড়া হয়নি।

কিন্তু কথা বলবে তো সুখেন?

কী? সিগারেট আনতে হবে?

নাঃ! ওই প্রেসের লোকটাকে একবারটি ডেকে দাও না ভাই!

বয়টা ইতস্তত করছিল। মালিকের কানে গিয়েছিল কথাটা। সে ধমক দিয়ে বলল, যা না ভদ্রলোক বলছেন!

ও চলে গেলে মালিক সত্যকে বলল, চেনেন নাকি সুখেনবাবুকে?

সত্য শিশুর মত সরল হাসল।

খুব সাবধান মশাই, খুব সাংঘাতিক চীজ। একটা নিরীহ গ্রামের মেয়েকে—মেয়েটার নাকি প্রচুর পয়সা আছে—তা মশাই, তাকে পটিয়ে একটা বাজে প্রেস গছিয়ে ফেলেছে। রোজই মিস্ত্রী আসছে স্ক্রু টাইট দিতে···আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে জানেন, যা দু'চারটে কাজ হয়—সবই ওর পকেটে যায়। প্রেস যার তারই থাকল—মাঝখান থেকে একরাশ টাকা মেরে বড়লোক হল।···অবশ্যি ওকে তো আজ নতুন চিনি না। জুয়াড়ির হাতের টাকা আসতে যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ।

সত্য কৌতূহল চেপে বলল, মেয়েটি এখানেই থাকে নাকি?

সে জানিনে। মালিক দাঁতে পানের কুচি সাফ করতে করতে জবাব দিল। মধ্যে মাঝে কোত্থেকে রিকশো চেপে আসে দেখি। চলে যায়। কে বলছিল, বাড়ি খুঁজছে এখানে। কিনবে।

সত্য কী বলতে যাচ্ছিল, বয়টা ফিরে এসেছে সেই সময়। সুখেনবাবু বলল, কে ডাকছে, এখানেই পাঠিয়ে দাও। হাতে কাজ আছে, ব্যস্ত।

না, নামটা বলেনি সত্য। ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু যাওয়া কি ঠিক হবে? যদি তখনই হঠাৎ লীলা এসে হাজির হয়! থাক। সত্য চায়ের দাম দিয়ে উঠেছিল। বয়টাকে বখশিস দিতেও ভোলেনি। তারপর সোজা রেডিওর দোকান। রেডিও না হলে তার চায়ের দোকান মানায় না। তাছাড়া যমুনার সাধ।

একবার দোকানে একবার বাড়ি—এই করে বাজানো যাবে। তাহলে ট্রানজিস্টার চাই।

ট্রানজিস্টারটা কিনে লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে সত্য কিছুক্ষণ উদ্দেশ্য-হীনভাবে হেঁটে বেড়াল। যমুনা আসতে চেয়েছিল। আনলে ভাল হত।

লীলা প্রেসের সামনে দিয়ে কয়েকবার আসা যাওয়া করল সে। সুখেনের মুখোমুখি হল না।

এক সময় অস্থির সত্য, ক্লান্ত আর উত্তেজিত হয়ে সোজা ঢুকে পড়েছে প্রেসে। তারপর চলে এসেছে সুখেনের মুখোমুখি। সুখেন মুখ তুলে দেখে নামাল। বলল, আয় বোস। তোর সঙ্গে কথা ছিল, সময় পাইনি যেতে।

সত্য শীতের দুপুরে চাদরমুড়ি দিয়ে ঘামছিল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সুখেন বলল, তুই আসবি আমি জানতাম।

সত্য কষ্ট করে হাসল।··আর আমিও জানতাম, তুই আমার কাছে যাবিনে।

যেতাম। কিন্তু যাবার মুখ ছিল না রে।

কেন? তোর তো কোন দোষ নেই।

তুই স্বীকার করিস?

করি।

স্বীকার করিস, লীলা আসলে একটা গেরস্থ বেশ্যা?

সত্য চমকে উঠে সুখেনের দিকে তাকাল। অভিনয় করছে না তো চতুর শয়তানটা?

তোর বৌ—তাকে বেশ্যা বলছি, রাগ করছিস হয়ত সতু।

না, রাগ করিনি। বল। তবে অন্তর থেকে বললে আরও খুশি হব।

এসব মেয়ের হাতে পয়সা থাকলে যা হয়, তাই হয়েছে। পৃথিবীটা আস্ত গিলে খেতে চাইবে। বুঝলি?

তুই ওকে চুষে নিঃস্ব করে ফেলছিস তো! নে, চুটিয়ে চুষে নে। সত্য হা-হা করে হাসল।···ব্লাডার ফাঁসিয়ে দে!

সুখেনও হাসল। তারপর বলল, তোর বৌ, আইনত ধর্মপত্নী। নৈলে আরও কিছু বেফাঁস বলতাম।

সত্য শুয়ারের মত মুখ উঁচু করে শ্বাস টানছিল। বলল, বল্, যা খুশি।

আমার সঙ্গে আর তো কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু এখনও ও তোর স্ত্রী। মাইণ্ড ছাট!

ওকে আমি ত্যাগ করব।

মুখের কথায় তো কিছু এসে যায় না সতু, আইন আছে কেন?

ও মামলা করবে? খোরপোষের দাবী করবে?

তা করতে পারে বৈকি।

তুই বুদ্ধি দিবি নিশ্চয়?

সুখেন আঙুল মটকে বলল, নাঃ। ওর মুরুব্বী আছে এখানে। শঙ্কর ভট্টাচার্যের নাম শুনিস নি? নামকরা উকিল? লীলার বাবার বন্ধুলোক।

ও। সত্য চুপ করে গেল।

ধর, যদি সত্যিসত্যি ও মামলা করে, তুই শালা আমায় জড়াবিনে তো?

জড়াবো।

কী বলবি? তোর বৌর সতীত্ব নষ্ট করেছি?

কতকটা তাই। বলব, অবৈধ প্রেম আছে সুখেন রায়ের সঙ্গে।

সুখেন সিগারেট এগিয়ে দিল। যা খুশি বলিস বাবা। আমি শালা ছু কানকাটা লোক। চালচুলো নেই। মলেও কেউ কাঁদছে না।—চা খাবি?

নাঃ।

খা না বাবা! অমন করছিস কেন? বন্ধুত্ব পুরুষের সঙ্গে পুরুষেরই হয়। আর সে বন্ধুত্ব সহজে ভাঙে না। কে একটা লীলা না ইয়ে, তার জন্যে পুরুষ হয়ে মাথা ঘামানোর কিছু দেখি না! অমন অজস্র লীলা আমি দেখেছি!··তা হ্যাঁ রে সতু, তুই তো বাবা বেশ·একটা বাচ্চামত পরী পেয়ে গেছিস দেখছিলাম। কোথায় জোটালি? খাসা জিনিস, মাইরি!

বেলেল্লা কোথাকার! ও আমার ভাগ্নী।

যাঃ শালা। ভাগ্নীর কোমর জড়িয়ে কেউ সিনেমা দেখে না। স্বচক্ষে

দেখেছি।

সত্য হাসল মাত্র।

লোক এল। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর সুখেন একবার ভিতরে উঠে গেল। ফিরে এল। ফের দুজনে একা। সুখেন বলল, আচ্ছা সতু, লীলা যদি তোর কাছে যেতে চায় নিবি? অবশ্যি, তুই স্বেচ্ছায় ওকে ছেড়ে এসেছিলি রূপপুরে। কিন্তু ধর, যদি এখন ফিরে যেতে চায়?

এ্যাদ্দিনে তো যায় নি! লোকও পাঠায় নি।

তবু এখন যদি নিজে থেকে ফিরে যায়?

নেবো না।

তা ঠিকই। ডাঁসা পেয়ারায় দাঁত বসিয়ে আছো, লীলাতে মন ভরবে কেন?

একটু পরেই সত্য উঠে পড়ল। কেন এখানে ঢুকেছিল বুঝতে পারছিল না সে। বাইরে বেরিয়ে মন খুব কটু হয়ে গেল তার। তবে এটা ঠিকই, সুখেন লীলাকে—যা ভেবেছিল—ভালবাসে না আদতে, ওকে ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করতে চায়। করুক। তাই করুক। জীবন অবশ্যি খুব ছোট—শিক্ষা পেতে পেতেই দিন ফুরিয়ে যায়।

রাস্তায় নেমে যখন সে হাঁটতে শুরু করেছে, পিছনে একটা রিকশো এসে থেমেছিল। লীলা।

লীলা দেখতে পায় নি সত্যকে।

সত্য ট্রানজিস্টারের চাবি ঘুরিয়ে গান শুনতে শুনতে খেয়া পেরোল। এতক্ষণে খুব তৃপ্তির ভাব এসেছে মনে। কাকেও যেন ভীষণ ছোট করা হয়েছে—তার শত্রুকে।

বাড়ি ফিরে কদিন ওই আশ্চর্য যন্ত্রটা বুকে নিয়ে কাটাল সত্য। যমুনা হাত ছোঁয়ালেই সে বলে, দেখো, নষ্ট করে ফেলো না। যমুনা ব্যাজার হয়।

শেষে বাগ মানাতে হয় সত্যকেই। তখন যমুনাও উপুড় হয়ে মাথার কাছে রেখে গান শোনে। পা নাচায়। সত্য পাশে বসে বলে, পাশের

সেণ্টারে হিন্দী গান আছে।

যমুনা ঘাড় ফিরিয়ে ওর বসে থাকা দেখে বলে, এই সাবধান!

সাবধান হয়েই আছে সত্য। যমুনার ছোট জঠর ওকে ভাবায়। এই যমুনাকে কোন একদিন মা হতেই হবে। কী হবে তখন? খুব কষ্ট হবে—আহা, কচি জঠরের নরম মাংসে বিষের ফোঁড়ার মত আরেকটা মানুষ পৃথিবীতে এসে সতুর মত ধাঁধার ফাঁদে আটকে যাবে।

যমুনার জন্যে মমতা যমুনার কোন একদিন হলেও হতে-পারে—ছেলের জন্যে মমতা—সত্য ভেবে অস্থির হয়।

সে কানের পাশে মুখ এনে বলে, যমুনা একটা কথা বলে দিই, কক্ষনো ছেলেপুলের মা হতে চাইবিনে।

যমুনা হাত-পা ছুঁড়ে কপট ক্রোধে চেঁচায়।

সত্য ফের বলে, তুই বিয়ে করতে চাস নে যমুনা। তার চেয়ে মরা ভালো রে।

যমুনা অবাক হয়। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। সত্যমামা কী পাগল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে?

কখনও মধ্যরাতে সে শোনে বারান্দায় সত্য হাঁটছে। খসখস শব্দ হচ্ছে। সে ডাকে, কী হল মামা?

কিছু না, তুই ঘুমো।

সত্য ছটফট করে। নিজের দেহের মধ্যে প্রতিটি কোষে ক্যান্সারের জ্বালা। অজস্র ক্ষুধার্ত ইঁদুর মাংসের জন্য ছুটোছুটি করছে।

কাম! ভয়ঙ্কর মারাত্মক সর্বনেশে এক শত্রুকে তার মধ্যে কে ঢুকিয়ে দিয়েছে! উপড়ে দিতে পারে না সমূলে? বিষের গাছটাকে?

কেউ পেরেছিল? ঋষি বিশ্বামিত্রও না। ব্রহ্মাও কন্যা সন্ধ্যার পিছনে ছুটেছিলেন!

অথচ সবাই কেমন হাসিমুখে ঘরসংসার করছে চারপাশে। এমনি করে পৃথিবী বেঁচে আছে আবহমান কাল। বেঁচে থাকবে। কামকে ধিক্কার দেবে এবং ভালবাসবে।

ভোর হয়ে আসছে। যমুনা দরজা খুলেছে সবে। ভোরে উঠে পড়তে

বসা অভ্যাস তার। চাঁপা এলে তখন বই ফেলে ঘরের কাজে ব্যস্ত হবে।

দরজা খুলে যমুনা দেখল সত্য সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেন সারাটি রাত সত্য এই বন্ধ দরজার সামনে বাঘের মত ছটফট করে ঘুরেছে!

পরক্ষণে সত্য তাকে দু হাতে ধরে ফেলেছে। উন্মূল সগুকাটা গাছ যেমন করে মানুষের উপর পড়ে যায়, ওরা দুজনে বাসি শয্যায় আছড়ে পড়ল।

এক সময় সত্য উঠল। সরে আসবার আগে সে দেখল, যমুনার নগ্ন শরীর—বাহু, বুক, জানু কেমন ধূসর হয়ে গেছে। কচি অর্জুনের উজ্জ্বল সোনালী গুঁড়ির মত মসৃণ ওই প্রত্যঙ্গগুলোর উপর কুয়াসার মৃদু আচ্ছন্নতা—এত খারাপ লাগল সত্যর। যমুনার দেহ ঘিরে এখন সহজেই গজিয়ে উঠবে উইপোকার ঢিবি। নাকের পাশের মোটা তিলে ঘটে যাবে হঠাৎ বুঝি বিস্ফোরণ। চুল হবে আগাছার ঝাড়। আর হাঁটুর নীচে পুরনো একটা দাগে, অবিকল গাছের গায়ে যেমন উদ্ভট একটা পাতার অঙ্কুর গজায় তেমনি একটা অঙ্কুর জেগে উঠবে—পারিজাত যা হতে পারত, হয়ত হবে বিষাক্ত করবী!

দুঃস্বপ্নের মধ্যে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিল সত্য। পালিয়ে যাচ্ছিল তাড়া-খাওয়া ভীত খরগোসের মত। ভোরের আলোয় সে হাইওয়েতে অনেক দূর হেঁটে যাচ্ছিল সেদিন।

মনে বড় অশান্তি।

মেয়ে বলেই হয়ত মানিয়ে নিল, সইল—সত্যর এই ধারণা। এবং শীত পুরোপুরি জাঁকিয়ে আসবার আগেই যমুনা আগের চেয়ে বাইরে-বাইরে অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছিল যেন। জনান্তিকে ওর নাম ধরে ডাকছিল সে। সব জড়তা দূর হয়ে গেছে যমুনার। সে যখন-তখন সত্যর অত্যাচার হাসিমুখে সয়। প্রতিবাদ করে না। অভ্যাস!

কেবল স্কুলটা ছেড়ে দিল, এই অস্বস্তি লাগে সত্যর। কী হবে লেখাপড়া শিখে?

ঠিকই। যমুনা তো আর চাকরী করতে যাচ্ছে না কোথাও। সত্য

আর বিয়ে করবে না—করবার পথও নেই। আইনে অসুবিধে আছে।

দিদি এসেছিল ইতিমধ্যে। খুব খুশি হয়ে গেছে। বলে গেছে, শীগগীর নিজের একটা হিল্লে করে নে সতু। যমুনার ভবিষ্যৎ তোর হাতে। এই ক' মাসেই ভীষণ চোখে-ধরা হয়ে উঠেছে। সামনে বচ্ছর দেখে-শুনে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। আহা, বাবা-মা নেই, তুই তো ওর সব এখন।

সতু নিজের হিল্লে কী করবে! সে হেসেছে। বলেছে, ও মামলা করবে শুনেছিলাম। এখনও করল না তো!

কে? দিদি বলেছিল। ছেড়ে দে খানকীর কথা। তুই একটা ঠুকে দে না!

তাই দেব ভাবছি।

দেরী করিস নে। কী সব আইন হয়েছে আজকাল!

দিদি দুজনকে বিস্তর উপদেশ দিয়ে চলে গেছে।

মাঘে জমির ফসল নিয়ে ব্যস্ত ছিল সত্য। চায়ের দোকান ছেলেমানুষ বুলুর হাতে—চলছে ভালই। ফাল্গুনে হাইওয়ের পাশে ফুল ফুটল। বাতাসে এল উষ্ণতা। পৃথিবীতে শুধু নয়, সত্যর মনে হচ্ছিল, এতদিনে তারও একটা বসন্তকাল এসে গেল। যমুনা আরও সুন্দর হয়েছে। ভীষণ সাজে। ভীষণ ভালবাসা দিয়ে পাগল করে দেয় সত্যকে। গিন্নীর মতই শাসন-তর্জনও কম করে না।

আর তখনই এল আদালতের সমন।

লীলা এতদিনে সত্যি সত্যি মামলা করল তাহলে! ডিভোর্সের দরখাস্ত একেবারে—খোরপোষের দাবী নয়। আর কী লজ্জা, সত্যচরণ তার নাবালিকা ভাগ্নীর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত—সতীসাধ্বী লীলারাণীর পক্ষে প্রত্যক্ষে সেই ঘৃণ্য জীবনযাপন সহ্য করা সম্ভব কি না, হুজুর বাহাদুর বিচার করুন। এরূপ লম্পট স্বামীর নিকট থেকে সে অব্যাহতি চায়।

কিন্তু কী সর্বনাশ, লীলা অন্য একটা আগুন জ্বালিয়ে দিল যে। রাণীচকে যারা যমুনা ও সত্যর সম্পর্ক ও আচরণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল তারা স্বভাবত নেচে উঠল। রটল যা রটা উচিত। সত্য হোক মিথ্যে

হোক, খবর ছড়ালে তা রক্তবীজ হয়ে ওঠে।

লোকের কাছে উত্যক্ত হয়ে চাঁপাও শেষ অব্দি নাকি সুরে বলেছে, হবে। অনেক কাণ্ড তো দেখেছি দুজনের—মনে খটকা লেগেছে বৈকি।

চাঁপা বাড়ি ছাড়ল সত্যর ভয়ে। হাওয়ায় গতি ফিরেছে। লীলা যাবার পর যমুনার আবির্ভাব—অথচ লোকের সময় জ্ঞানের ভীষণ অভাব দেখা গেল। হারামজাদা সতুটা নাকি নিরীহ ভালোমানুষ। মিছেমিছি বৌটাকে তাড়িয়েছিল অপবাদ দিয়ে। আসলে এই কচিগাছে বাসা বাঁধবার মতলব ছিল মাথায়। নরকেও কি এর ঠাঁই হবে!

হয়ত একেই বলে জনমত। এত মনমরা হয়ে গিয়েছিল সত্য। শক্তি যোগাল দিদি সুভদ্রা আর তার স্বামী প্রবোধ। প্রবোধ তহশীলদারী চাকরি করে। মামলার তদ্বির সেই করবে।

রাণীচকে সত্যর শত্রু কেউ ছিল না। তবু দেখা গেল, সাক্ষী এখান থেকেও পেয়েছে লীলা। শঙ্কর উকিলের স্থায়ী মক্কেল এখানে কম নেই। তাই হয়ত এটা সম্ভব হল।

পিনাকী মুখুয্যে সাক্ষী। আর সাক্ষী চাঁপা—চাঁপা ঝি। টাকা চিরকালই অসম্ভবকে সম্ভব করে।

হাটুবাবুর কাছে গিয়েছিল সত্য। হাটুবাবু নাক সিঁটকে বলেছেন, ছিঃ, এ কি শুনছি!

সত্য ক্ষোভে-দুঃখে সরে এসেছে সেখান থেকে।

আসলে লীলা রাণীচকের লোকের মনের কথাটি—দীর্ঘদিন যা তারা গোপনে রাখছিল—স্পষ্ট বলে ফেলেছে। মৌচাকে ঢিল পড়েছে।

সত্য বলল, এই আমার গ্রাম, এই আমার দেশ! যমুনা, আমরা কলকাতা চলে যাব। অসহ্য লাগছে আমাকে। নিঃশ্বাস নিতে ঘেন্না হচ্ছে। সব শালা পচে গেছে এখানে। যাবে তো আমার সঙ্গে?

যমুনা বড় বড় চোখে তাকাল মাত্র। জবাব দিল না।

সত্যি যমুনা, পৃথিবীতে আর একটি মাত্র জায়গা আছে। দরজা খোলা যে সেখানে কেউ কাকেও চেনে না, কেউ কারুর দিকে চেয়ে দেখে না। জানো যমুনা, আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে বেশ কয়েক মাস

কলকাতায় ছিলাম। বাবা ফিরিয়ে এনেছিলেন। আমার এক মেশোমশাই থাকেন শ্যামবাজারে। জানো?

যমুনা জানে না।

শত মুখে কলকাতার গল্প করে সত্যচরণ হাঁফিয়ে ওঠে। হঠাৎ অসম্ভব সুন্দর মনে হয়, ওই দীর্ঘ বিলম্বিত হাইওয়ের এতটুকু অংশ—তার ছোট্ট দোকানটা, যাতায়াতের পথের ধারে অনেক অচেনা মুখ। অনেক সত্য-মিথ্যে গল্প।

আজকাল পিনাকী আর আসে না দোকানে। আসবার মুখ নেই। তবে চেনা মানুষ অনেক আসে। তারা সত্যর মামলার খবর জানতে চায়। আফশোষ করে। সত্য কানে নেয় না। যেদিকে তাকায় মনে হয়, কাঠগড়ায় লীলা দাঁড়িয়ে আছে।

এ ছবি চোখের পর্দায় মোছে না। যখনই যমুনার কাছে যায়, আদর করতে হাত বাড়ায়, তখনই লীলা দূর থেকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, ধর্মাবতার, আমার স্বামী অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত। ধর্মাবতার, সে কন্যাতুল্য আত্মীয়ার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে।

কী হল? যমুনা বলে।

আসছি।

বসন্তের রাত্রে হাইওয়েতে সত্য হাঁটে। অনেক দূর হেঁটে যায়।

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি আদালত ডিভোর্সের রায় দিল।

পরদিনই সত্য দুপুরে ঘেমে-তেতে সাইকেলে দিদির বাড়ি হাজির। আগের দিন সন্ধ্যায় প্রবোধ ফিরেছে বহরমপুর থেকে। সব শুনেছে সুভদ্রা।

প্রবোধ বাড়ি ছিল না। সত্য সোজাসুজি বলে উঠল, দিদি, একটা কথা বলবার জন্যে এসেছি।

সুভদ্রা বঁটিতে তরকারি কুটছিল। বলল, কী কথা রে?

বল, তুমি রাগ করবে না।

রাগ করব কেন? কী কথা?

এ ছাড়া কোন উপায় নেই, তুমি মত দাও শুধু···

আঃ, কী কথা বলবি তো ?

যমুনাকে আমি বিয়ে করব।

বঁটিটা কাত করে রেখে সুভদ্রা ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, তোর মাথা খারাপ হয়েছে ? ছিঃ, ও তোর মেয়ে !

ওটা তোমার সংস্কার, দিদি। মিথ্যে সংস্কার।

সতু, কী যা তা বলছিস ! যমুনা তোকে বাবার মত দেখে।

সত্য মুখ নামিয়ে বলল, না। বাবার মত দেখে না। আমিও তাকে মেয়ের মত দেখি নি কোনদিন !

সুভদ্রা স্তম্ভিত হয়ে গেল। কথা বলতে পারল না।

সত্য গলা ঝেড়ে নিয়ে ফের বলল, লীলা মিথ্যে বলে নি একটুও। আমি···আমি যমুনাকে নষ্ট করেছি।

সুভদ্রা মুখ ঢাকল আঁচলে। সতু, তোর হাতে ওই বাপ-মা মরা কচি মেয়েটাকে তুলে দিয়েছিলাম। এ বাড়ি এসে থেকে ওকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি এতটুকু মেয়ে। আমার কোন ছেলেপুলে নেই। তোর কষ্ট দেখেই নিজের কষ্ট চেপে ওকে রেখে এসেছিলাম তোর কাছে। তুই এত নীচ প্রকৃতির, আমি ভাবিনি।

সুভদ্রা কাঁদছিল। সত্য ওর পায়ে হাত রেখে বলল, আমি···আমি দোষী দিদি। আমাকে ক্ষমা করিস। কিন্তু এতে দোষ কী রে ? আমি তো মানুষ !

সুভদ্রা গর্জে উঠল, তুই অমানুষ ! নরকেও তোর জায়গা হবে না। যা, এক্ষুনি বেরিয়ে যা। আমি আজই ওকে পাঠিয়ে দেব, যমুনাকে নিয়ে আসবে ; ছি, গলায় দড়ি জোটে না তোর !

এবার সত্য তার শেষ কথাটা বলে দিল। মুখ নামাল না। তার চোখ দুটো লাল, হাত থর থর করে কাঁপছে। সে বলল, দিদি, যমুনার পেটে বাচ্চা আছে !

সুভদ্রা বঁটিটা তুলেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই রেখে দিল। কঠোর মুখে বলল, তুই যদি জারজ না হোস, আমি যেন তোর মুখ আর না দেখি।

আর ওই হারামজাদী বেশ্যাকে বলিস, তোর মা তোকে বিষ খেয়ে মরতে বলেছে।

সত্য নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

যমুনার কাছ থেকে কিছু সাহস আশা করেছিল সত্য। যখন সে শহরের আদালত থেকে ফিরেছে, নিঃসঙ্কোচে লীলার নির্লজ্জতার খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে বলেছে, বল যমুনা, এখন কী করি!

যমুনা একটু হেসে বলেছে ওরা তো মিথ্যে বলে নি।

যমুনা! সত্য আঘাত পেয়ে চমকে উঠেছে।

তখন যমুনা ওর পাঁজরে মৃদু খোঁচা মেরে বলেছে, রাগ হল বুঝি?

তারপর ওকে পিঠের দিকে জড়িয়ে—শিশুর গালের মত গাল যমুনার। নাকে সেই আশ্চর্য গন্ধটা ঝাপটা মারে—সে ফিসফিস করেছে, ও কি আমার চেয়ে সুন্দর?

কে?

মামী।

ফের মামী?

থুড়ি সতীন। সতীনেরা সত্যি কথাটাই বলে।

কিন্তু এর জন্যে একা আমিই কি দায়ী? তুই নোস?

এই! তুই বললে জবাব দেব না। এখন আমি বড় হয়েছি না?

বেশ বাবা বেশ, তুমিই বলব।

বলব নয়, এক্ষুনি বল।

তুমিও কি দোষী নও যমুনা?

আমার কী দোষ? যমুনা ওকে ছেড়ে দেয় হঠাৎ।

তুমি কেন বাধা দাও না? কেন দাওনি প্রথমে?

দিয়েছিলাম—পারি নি।

মিথ্যে কথা।

সে তুমিই জানো ভাল করে।...যমুনা চোখ বড় করে গাল ফুলিয়ে বলে, আর সে রাতে রিকশোয় আসবার সময়? কে প্রথমে ইয়ে করেছিল, অ্যাঁ? খড়ের গাদায় জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ফেললে আগুন ধরবে না?

যমুনার এমনতর কথায় যে ঝাঁঝ, তাতে বয়সের কটুতা আদৌ নেই। ওর শ্যামলা কিশোরী শরীরে যৌবন নিজেকে মানাতে পারে না—বড় ছুরি ছোট খাপে যেমন, কিম্বা উল্টোটাও হতে পারে। হয়ত এ মেয়ে জন্মযৌবন, কৈশোর তাকে আটকাতে পারে না। কৈশোরের কণ্ঠস্বরে সেই যৌবনই কথা বলে।

তাই যেন মাঝে মাঝে ওসব গোপনীয়—বাইরের লোকের কাছে স্বভাবত যা অশ্লীল, কথাবার্তায় যৌবনের উদ্দামদীপ্ত ভাবগুলো হঠাৎ মনে হয় বেমানান; মনে হয় এ-ছাঁদে যে বকে, সে নিতান্ত চপলা অবোধ কিশোরী ছাড়া কিছু নয়। যমুনাকে সত্য তখন বোকা ভেবে বসে। এমন বোকার তুলনা সে খুঁজে পায় না। বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার জুটেছে—যমুনার দেহে যৌবন। ও তার মূল্যই বোঝে না! দেহ ছাপিয়ে বন্যার ঢল যেমন—পুরুষের ভোগের ঐশ্বর্য থরে-থরে ফুটে যেমন কিনা সবুজ বাগানে ফুল হয়েছে!

যে-নদী জানে না তার কূলভাসানো জলের মহিমা, সে-নদী শুকিয়ে যাবে এক মরশুমেই। আর যে-সবুজ বাগান জানল না একবারের ফুলে তার শেষ নয়, তার শুকনো পাতায় হবে কীটের বাসা। যমুনা মরবে। ও যে নদীর মত অন্ধ, গাছের মত মূক!

আর যমুনার শরীরে একটা কিছু ঘটে যাবে এ ভয়ে বারবার সে গোপনে ডাক্তারের কাছেও গেছে। কিনে এনেছে ছাইপাঁশ।…নতুন বিয়ে করেছি ডাক্তারবাবু, এত শীগ্‌গীর ছেলেপুলে চাইনে।…বেশ তো, আজকাল অনেক ব্যবস্থা আছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিং। ছাইপাঁশ কিনে লুকিয়ে রেখেছে। যমুনাকে—যমুনার দেহকে বিষফোটক গজানো থেকে বাঁচাতে চেষ্টা একটা ছিলই মনে পোষা।

অথচ বাক্সের ভিতর মোড়কে থেকে গেল সব জমা। চরম সময়ে তা কাজে লাগাতে পারেনি! তার ভয় হয়েছে, এতটুকু ছাড়া পাওয়ার ফুরসৎ পেলে বুঝি বা যমুনা হঠাৎ উঠে পালিয়ে যাবে। চেঁচামেচি করবে। এবং নিজের ভিতর থেকেও পাপের দেবতা চাপাস্বরে বলেছে, এই সত্তু, এই গাধা, শীগগীরি, শীগগীরি! কে এসে পড়বে এক্ষুনি।

চারপাশে অদৃশ্য কান, অদৃশ্য সহস্র চক্ষু ওৎ পেতে যেন ; যেন বা দরজার বাইরে চুপিচুপি এসে দাঁড়িয়েছে কেউ—হয়ত চাঁপা ঝি, হয়ত পিনাকী, হয়ত বা অন্য কেউ।

কিংবা লীলা।

আর ঝাপসা হয়ে ওঠা আবছায়া জগতের অদূরে আকাশের নক্ষত্রের মত তার দিদি সুভদ্রারও দৃষ্টি। ওকি, ওকি রে সতু !

কুকুর রান্নাঘরে ঢুকে যেমন করে ভাত খায়—ভীত চঞ্চল চক্ষু, গুটানো লেজ, জিভ বেরিয়ে পড়েছে—সত্য যমুনাকে গ্রাস করেছে।

…যা ইচ্ছে কর, কিচ্ছু বলব না। তোমারই পাপ হবে।

…চুপ, কথা নয় যমুনা।

কিন্তু যমুনাও সাড়া দিয়েছে। হঁ্যা, নীরবতার মাঝে সম্মতি শুধু নয়—দেহের দিকে সাড়া। দুটি বাহুতে, অধরোষ্ঠে, আকর্ষণের তীব্রতায় তার দেহের ভাষা পড়ছিল ধরা।

সেইসব সময় হঠাৎ ঘুমের ঘোরে যেমন মনে হয়, সত্য অনুভব করেছে কচি কোমল নধর সুন্দর এবং অসহায় একটা শিশু পড়ে যাবার ভয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে। মমতায় বুকের অন্ধকারে কার কান্না ভাসে চুপিচুপি শিশিরের শব্দের মত।

…কী হল !

…কী হবে !

…হুঁ, বীরপুরুষ ! ভাব দেখে তো মনে হয় রাক্ষসের মত গিলবে ! নাও, ওঠ। এত রাত্তিরে আবার নাইতে হবে। জ্বালাতন !

প্রচণ্ড শীতের রাতে যমুনা স্নান করেছে কাঁপতে কাঁপতে। সত্য বারান্দায় বসে থেকেছে চুপচাপ। কেন সে নিজেকে দমন করতে পারে না ? অন্য কেউ এক্ষেত্রে কী করত, ভাববার চেষ্টা করেছে সে। আর তখনই নিজেকে আঘাতে চূর্ণ করতে সাধ হয়েছে। ঝুলে পড়বে গাছের ডালে—বিষ খাবে—চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

পাগল, পাগল ! সত্য জীবনকে এত ভালবাসে। বেঁচে থাকবার সাধ ইচ্ছা তার এত তীব্র। এত সতর্কভাবে সে চলাফেরা করে। সাপের

ভয়ে টর্চ ছাড়া বেরোয় না রাত্রে। রিকশো চাপলে আগে রিকশোওলাকে সতর্ক করে দেয়।

কিন্তু যমুনার জন্য ভয় থেকেছে বরাবর। প্রতিবারই সে ভেবেছে, হয়ত এবারই যমুনা একটা ভয়ঙ্কর কিছু করে বসবে। দেখবে ঝুলতে তাকে উঠোনের পেয়ারাগাছে। নয়ত পুরনো কুয়োর জলে ভাসবে তার মড়া।

পালিয়েও যেতে পারে! দিদিকে সব খুলে বলতে পারে।

দুরদুর বুকে কাটাতে হয়েছে রাত্রি জেগে যমুনার পাহারায়। দোকানে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেনি। বুলু, আমি আসছি রে!

ওকি মামা, এক্ষুনি এলে, আবার যাবে?

একটা কাজ ভুলে গেছি বাবা।

ধুৎ, এমন করলে দোকান চলে?

সত্য হেসে বলেছে, দোকান কি আমার রে? তুই ওর মালিক। চালা তুই।

বাড়ির দরজায় এসে বুক ধকধক করে সত্যর। যদি সত্যি সত্যি যমুনা···

নাঃ। দরজা খুলেছে যমুনাই। হেসেছে।···একি! আবার এলে?

তোকে না দেখে থাকতে পারিনে তো!

খুব হয়েছে।

দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সত্য ওকে জড়িয়ে ধরে অজস্রবার চুমু খেয়েছে। যমুনা বলেছে, দিলে তো মুখটা পচিয়ে!

সে সাবান ঘষে ফের। ফের স্নো পাউডার মাখে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অনেকটা সময় ধরে দেখে। গালের তিলটা টেপে। ব্রণ খোঁজে। একটিও নেই।

যমুনা যেন তার মতই জীবনকে ভালবেসে বেঁচে থাকতে চায়।

শুধু একটা তফাৎ আছে এ ব্যাপারে।

সত্য মৃত্যুকে অনুভব করে, যেন বা অনুক্ষণ সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে দেখতে পায়—আততায়ীর মত—একজোড়া জ্বলজ্বলে সাপের চোখ।

যমুনা মৃত্যু আছে, তা জানে না যেন। মৃত্যুকে সে ভাবে না।

অন্ধকে করুণা করতে হয়। যমুনাকে সেইরকম করুণা করে সত্য।

আর, এই আলো-অন্ধকার চিত্রবিচিত্র বোধের সামনে সত্যকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল। অস্থির, যেন বা ক্ষুব্ধ, যেন ক্লান্তও। সেই সময় একদিন হঠাৎ বারান্দায় বসে মাথা চেপে ধরে যমুনা বমি করার চেষ্টা করেছিল। তার কয়েকদিনের মধ্যেই সত্যর ধারণা স্পষ্ট হল। সে যমুনাকে কিছু বলেনি। কিন্তু যমুনাও কি বুঝেছে?

সুভদ্রার কাছ থেকে ফিরে সত্য দেখল সদর দরজা ভেজানো আছে। তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। উঠোনে সাইকেল রেখে সে লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠল। দেখল, যমুনা ঘুমুচ্ছে।

বিকেল হয়ে গেছে। বাতাসে একটু ঠাণ্ডা ভাব। মুখের ঘাম শুকিয়ে যমুনার মুখটা বাসি ফুলের মত দেখাচ্ছিল। ঘুমের ঘোরে ওর গায়ের কাপড় এলোমেলো হয়ে গেছে। যমুনার ঘুম বরাবর বেশ গাঢ়। সত্য জানে।

মুখ হাঁ হয়ে আছে ওর। চোখের নীচে কালির ছোপ পড়েছে। আর খুব কাছে থেকে লক্ষ্য করলে তবে বোঝা যায়, ওর জঠরটা স্ফীত।

পেটের কাপড় সরিয়ে হাত রাখতেই যমুনা তাকাল। তারপর উঠে বসল। বলল, ইস, কী মানুষ তুমি! হঠাৎ না বলা-কওয়া নেই কোথায় গিয়েছিলে? দোকানে নেই খবর পেলাম। ভাবলাম……

কী ভাবলে? সত্য একটু হাসল।

বহরমপুরে গেলে বুঝি। গিয়েছিলে?

না।

কেন লুকোচ্ছ? ভাবছ, কিচ্ছু টের পাইনে?

কী টের পেয়েছ?

ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ। আবার কী?

তুমি ছাড়া আর জল কোথায় পাব যমুনা?

পাবে না আবার? আমি তো এখন…লোনা হয়ে গেছি। যমুনা হেসে উঠল। বড় সুন্দর দেখাল ওর হাসিটা। ওর মুখে মায়ের আদল—ওর হাসিতে এখন মায়ের হাসি।

না। সত্য একটু কাছাকাছি গিয়ে বলল। না, তুমি লোনা হওনি।

সে আদর করতে থাকল। একটু পরে যমুনা বলল, বারে বারে পেটে হাত দিও না, কাতুকুতু লাগে বড্ড।

যমুনা কি এত বোকা, এখনও কিছু টের পায় না? সত্য বলল, আচ্ছা যমুনা, ধর এমন যদি হয়—হঠাৎ তুমি জানলে, ছেলেপুলের মা হতে চলেছ···

ও-ম্মা-গো! যমুনা তুহাতে মুখ ঢাকল।

কেন, মা হতে চাও না?

বেশ কিছুক্ষণ তুহাতে মুখ ঢেকে পিছন ফিরে থাকার পর যমুনা বলল, আমার ভয় করে।

কিন্তু তুমি মা হয়েছ. যমুনা! তোমার পেটে বাচ্চা এসেছে।

ফের দীর্ঘ নীরবতা। সত্য কয়েকবার ডাকল। সাড়া পেল না। তারপর ফিসফিস করে যমুনা যেন দেয়ালকেই শোনাল, বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি! কবে যেন বুঝতে পেরেছিলাম!

সত্য জোর করে ওকে এদিকে ফেরাল। যমুনা নত মুখে বসে থাকল। সত্য বলল, সাবধান হওয়া উচিত ছিল। হইনি। কিন্তু ওটা নষ্ট করা দরকার। একটুখানি কষ্ট হবে তোমার। সইতে পারবে না? না, না। ভয়ের কিছু নেই। আজকাল এমন কত হচ্ছে। ডাক্তারের কাছে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ভয় করো না।

যমুনা নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল। যে কান্না সারা পৃথিবী জুড়ে অজস্র কুমারী জননী কাঁদে।

নয়

শেষ পর্যন্ত একটা ভাল বাড়ি পাওয়া গেছে। পাশে প্রাচীন খ্রীস্টান কবরখানা। সামনে বিরাট ফাঁকা মাঠ। ওপাশে রেলস্টেশন। বেশ নির্জন। অজস্র গাছপালা আছে। রাত্রে শেয়ালের ডাকও শোনা যায়। শহরের এ অংশটা এক সময় জঙ্গল আর আমবাগানে ঢাকা ছিল। দেশ

বিভাগের পর উদ্বাস্তু কলোনী গড়ে উঠেছে। সদর রাস্তার দিকে গড়ে উঠেছে অনেক নতুন সুন্দর সুন্দর বাড়ি।

এ বাড়িটা পুরানোই। কোন এক মুসলমান উকিল ছিলেন এর মালিক। ছেলেরা সব পাকিস্তানে চলে গেছে। ভদ্রলোক এখানেই ছিলেন। একা বিপত্নীক মানুষ।

হঠাৎ কী খেয়ালে ছেলেদের কাছে যাবার ইচ্ছে হল। বাড়িটা বেচে দিতে চেয়েছিলেন। শঙ্কর ভট্টাচার্যই ব্যবস্থা করে দিলেন যথারীতি। বেশ সস্তায় মিলে গেল। এ সব ক্ষেত্রে দরদাম সস্তা হওয়াই স্বাভাবিক।

সেই বাড়ি ফের নতুন করে ভোল ফেরান হল। একেবারে বদলে গেল চেহারা। ডিভোর্সের রায় চুকে যেতেই লীলা চলে এল রূপপুর থেকে পাকা-পাকিভাবে। বাড়িটা এবং জমি-জমার বেশী অংশ বেচে ফেলতে হয়েছে। যেটুকু থাকল, তা হরুর হাতে নয়, রঘু পণ্ডিতের ছেলে সজল দেখাশোনা করবে। ফসলের অংশ ছাড়া আর কোন দাবী নেই তার।

লীলার সঙ্গে বাসিনী এল। আর এল ঘণ্টা। ঘণ্টার মা রূপপুর ছেড়ে নড়তে চায় না। চাইলেও তাকে আনবার দরকার ছিল না কিছু।

আসবাবপত্র সবই নতুন কিনতে হল। শহর-জীবনের উপযোগী হাল-ফ্যাসানে জিনিসপত্র চাই বৈকি। লীলা নাগরিকা হতে মন দিয়েছে যে!

ঘটা করে গৃহপ্রবেশ পর্যন্ত চুকল কোন এক শুভদিনে। পাড়ার মেয়েরাই এসেছিল বেশি সে অনুষ্ঠানে। শঙ্করবাবু এসেছিলেন সপরিবারে। সুখেনের ভাষায়—রীতিমত পার্টি!

সুখেনের ভয় ছিল, লীলা তার গ্রাম্যতা দিয়ে মানিয়ে নিতে পারবে কিনা,—পরিবেশ তো ভিন্ন, লীলার কাছে বেশ নতুনই।

অবাক করল লীলা।

আসলে লীলার চেহারায়, চালচলনে কী একটা আছে। কখনও ঋজুতা কখনও দীপ্তি। চটুলতা কম নেই। যদিও বা চোখের তলে ময়লা জমেছে এ ক'মাসে, শরীরে কিছু অবহেলার চিহ্ন খুঁটিয়ে না দেখলে তা চোখে পড়ার কথা নয়—তথাপি একটা আলোর খেলা আছে যেন, যা তাকে অন্যের কাছে মোহময়ী করে তোলে।

এখন লীলা বেছে কথা বলে। ভাষা থেকে গ্রাম্যতা মুছতে প্রতি মুহূর্তে সচেতন। রেডিওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গায়। এমন কি অজস্র বই পড়ে সারাটি দিন। কিছু কেনা বই, কিছু চেনা-মেয়েদের কাছে সংগ্রহ করা। শহরে মোট তিনটি ছবিঘর। প্রতিটি নতুন ছবি না দেখে সে পারে না। সুখেন ওর ছায়া হয়ে গেছে একেবারে।

ওদিকে প্রেস চলছে জোর। সেটা সুখেনেরই ভাষ্য। লাভ-লোকসানের হিসেব চাইলে সে বলে, আরও কিছুদিন না গেলে বলা কঠিন। সরকারী অর্ডারগুলো ডেলিভারি দিই। বিলের টাকা আদায় হোক। তারপর বোঝা যাবে।

যা ভালো বোঝ, কর। লীলা বলে। তোমাকে অবিশ্বাস করি না তো!

সুখেন ভুরু কুঁচকে তাকায়। বলে, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা তুলছ কেন?

লীলা হাসে। কিছুক্ষণ পরে বলে, না। তুমি আমার বিশ্বাসী লোক।

শুধু 'লোক' হয়ে আর থাকতে ভালো লাগে না, লীলা। এবার একটা কিছু কর। সুখেন একদিন মরীয়া হয়ে বলে ফেলল।

সবে বর্ষা নেমেছে। ওরা বসবার ঘরে মুখোমুখি বসেছিল দুটো বেতের চেয়ারে। লীলার পরনে হালকা নীল শাড়ি আর গোলাপী হাতকাটা ব্লাউস। শুকনো রাখা খসখসে চুলে মফঃস্বলে টাটকা আমদানী করা বিচিত্র খোঁপা—পাখির বাসা গোছের। সুখেন মনে মনে হাসছিল—এবং পায়ে সাদা দু-ফিতের স্লিপার। একটা পা অন্য জানুর ওপর দিয়ে ঝুলছে—পা-টা নাচছিল। সুখেনের দিকে ফেরানো।

সত্য দেখলে ভিরমি খেত বিলক্ষণ। সুখেন মনে মনে বলছিল।

কী বললে? লীলা ভ্রূভঙ্গী করে তাকাল ওর দিকে।...লোক না কী?

শোন নি। কী ভাবছিলে? সুখেন হাসল।

কিচ্ছু না।

বলছিলাম, আর কতদিন এমন করে কাটাব?

কেমন করে?

যেমন আছি।

বেশ তো আছ! অসুবিধে হচ্ছে?

হচ্ছে বইকি। আমার তো একটা ভবিষ্যৎ আছে। যদিও এটা টাউনের ব্যাপার, এখানেও সমাজগোছের রয়েছে। চেনাজানা মানুষও আছে অনেক। কতদিন আর স্ক্যাণ্ডালের বোঝা বইব, তুমিই বল লীলা। মার্কামারা হয়ে যাচ্ছি না?

লীলা ওর মুখের দিকে তাকাল—যেন কিচ্ছু বোঝে না! বলল, কলঙ্কের কথা বলছ?

হ্যাঁ। তোমার শঙ্করজ্যাঠাই বা কী ভাবছেন? তিনি সবই জানেন।

লীলা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, উনিও বলেছেন আমাকে।

সোৎসাহে সুখেন লাফিয়ে উঠল। কী, কী বলেছেন?

তোমাকে বিয়ে করতে।

দিব্যি কর।

দিব্যি করার কী আছে? যা বলেছেন, বললাম।

তাহলে আর দেরী করছ কেন?

লীলা টেবিল থেকে মাথার কাঁটাটা তুলে নিয়ে দাঁতে কামড়াল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, কিছুদিন ভাবতে দাও।

তুমি কি আমাকে ভালবাস না লীলা?

সুখেন এমন স্বরে কথাটা বলল যে লীলা না হেসে পারল না। সে বলল, বাসি বৈকি। নৈলে এতসব করলাম কেন? ভিটেমাটি বিক্রী করে এখন পথের ভিখিরী হতেও তো বাকি রাখলাম না! কোর্টেও দাঁড়িয়েছিলাম লোকলজ্জা না মেনে। তোমাকে ভালবাসি বলেই···

থাক, থাক। খুব হয়েছে! সুখেন বাধা দিল। এরই মধ্যে একেবারে ভীষণ চালিয়াৎ হয়ে গেছ দেখছি। না লীলা, সত্যি বলছি, আর ঠাট্টাতামাসা নয়। নিজের ঘরে চুরি করার মানে হয় না। আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছি।

লীলা একই ভঙ্গীতে বলল, স্বামী হলে কিন্তু যখন-তখন টাকা চাইতে পারছ না।

টাকার খোঁটা দিচ্ছ? সুখেন গোমড়ামুখে বলল। টাকা তোমার কাছে যখন তখন নিই—একথা ঠিক।

মাইনেও নাও।

নিই। তুমি জানো না, আমার অনেক ধার আছে। জানিনে সারা জীবনে তা শোধ করতে পারব কি না!

বাঃ চমৎকার। লীলা দুলে উঠল।···বিয়ে করে তখন সব ধারের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাবে। কী চালিয়াৎ লোক রে বাবা।

সুখেন আহতস্বরে বলল, অত হীন ভেবো না আমাকে। আমার ধার আমারই।

ধার হয় কেন অত?

এখন হয় কে বলল? ওসব পুরনো ধার। জানো না তো কী অবস্থা থেকে কিসে পৌঁছেছিলাম। হয়ত কোনদিন ছেলেবেলায় শহরে এসে যে ছেলেটির কাছে বাদাম কিনে খেয়েছ, সে আমিই। কিংবা হয়ত মেরামত করেছ ছেঁড়া স্লিপার, সে এই আমিই ছিলাম। আমার পিছনে একটা ভীষণ দুঃখের দিন গেছে লীলা। সে একটা দুঃস্বপ্ন। যখনই মনে পড়ে বুক কেঁপে ওঠে। কতদিন না-খাওয়া কাটিয়েছি। কার বারান্দায় একটুকরো রুটির জন্যে···

সুখেন হঠাৎ সামলে নিল। তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল। সে হাঁফাচ্ছিল।

লীলা আস্তে আস্তে বলল, এখন তো তুমি সুখী।

এ সুখের কোন মূল্য নেই, লীলা। চোরাবালির উপর ঘর বেঁধেছি।

না। তা নয়।

কেন নয়? তোমার ইচ্ছের উপর আমার সুখের টিকে থাকা। যেকোন সময় ইচ্ছে হলে বলবে, দূর হও, চাইনে! নয় কি?

বলব না।

বিশ্বাস করিনে।

কেন? তোমাকে আমার দিতে তো কিছু বাকি নেই, সুখেন। তবু কেন অবিশ্বাস?

সুখেন একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল, রাগ করো না। আমিও একদিন সতু হয়ে যেতে পারি তোমার চোখে।

লীলা উঠে দাঁড়াল হঠাৎ।

ওকি? রাগ করে চলে যাচ্ছ?

লীলা জবাব দিল না।

এসব সময় বরাবর সুখেন যা করে, তাই করল। সে ছাড়া এমন আর কতজনই বা পারে সংসারে? একটা কুপিতা বাঘিনীকে শান্ত করার মত দক্ষ রিঙমাস্টার তার মত দেখা যায় না। দরকার হলে সে পায়ে হাত দিতেও পিছপা নয়।

কারণ সে জানে, মেয়েরা—লীলার মত মেয়েরা, হঠাৎ জমে বরফ হয়ে গেলে কতখানি তাপ দরকার হয়।

ওর বন্ধুরা বলে, সুখেনের মত মেয়েপটানে ছেলে পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। ওর অভিজ্ঞতা বড় কম নয়। একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে ওর জীবনে।

থিয়েটারে নেমে সুখেন দেখেছে, সে খুব ভালো অভিনেতা নয়। কিন্তু বাস্তবজীবনে সে অভিনয়ে পটু।

সুখেনের অভিনয় কতখানি, মাঝেমাঝে সে নিজেও বুঝতে পারে না। সত্যিসত্যি চোখে জল আসে। মনের স্যাঁতসেতে ভাবটুকু অনেকক্ষণ ঘোচে না।

ঘণ্টা আসতেই সুখেন ক্ষান্ত দিল। লীলার হৃদয় এখন দুকুলছাপানো নদী হয়ে গেছে—সুখেন জানে।

সুখেন যখন বেরলো তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। লীলাকে জয় করেই লম্বা লম্বা পা ফেলে সে হাঁটতে থাকল।

কালেকটরীর কাছে যেতেই একটা চায়ের দোকান থেকে কে তার নাম ধরে ডাকছিল।

সুখেন দেখল ফেলটুদা।

ফেলটুদা হেঁকে বললে—এই সুখো, শোন্ এদিকে।

কাছে যেতেই দেখল, পুরো দলটা বসে আছে ওখানে। প্রদ্যোৎ

অহীন তপুদা—এমন কি লালুও। আরো নতুন মক্কেল দুজন।

শ্রীমতীর কাছ থেকে এলি, তাই কি না? চালা বাবা, চুটিয়ে চালা

যান। প্রেমের ব্যাপারে গিয়েছিলাম।

অহীন বলল, দন্ত্য স টা ম করে দিন সুখেনদা।

ফেলটুদা বলল, ব্র্যাভো! আজ জোর লড়াই চলবে কিন্তু। পকেট ভর্তি করে এসেছিস তো?

সুখেন মাথা চুলকে বলল, নাঃ।

নাঃ বললে তো চলবে না দাদু; অ্যাই লালু, ধর শালাকে, চিৎ করে ফ্যাল···

একদফা জোর স্ফূর্তি হয়ে গেছে বোঝা যায়। পা টলছে ফেলটুদার দোকানের পিছনের পর্দা তুলে সেই সময় শিবুও বেরিয়েছে। শিবানী। ওরা বলে শিবু। দোকানের মালিক জগদীশের মেয়ে।

অগত্যা সুখেন দোকানে ঢুকল। ভিতরে বেঞ্চে বসে বলল, কার কাছে সিগ্রেট আছে, দাও তো! অনেকক্ষণ টানিনি মাইরি!

প্রদ্যোৎ বলল, ক্যান? মাগীকে গন্ধ লাগে নাকি?

সুখেন বলল, হ্যাঁঃ। গাঁইয়া ওই ছুঁড়িটা নিয়ে আমার হয়েছে জ্বালা!

ফেলটুদা ঢুলতে ঢুলতে মন্তব্য করল, কিন্তু জিনিস ভালো। গ্রামের জিনিস ভালো। গ্রামের জিনিস খাঁটিই হয় রে। অ্যাম আই রাইট? জেন্টলমেন···

অভিজাত পরিবারের সন্তান—এখন বড় জোর মৃত মাতঙ্গ, ফেলটুবাবুকে সবাই ভক্তিশ্রদ্ধা করে। ওরা সমস্বরে সায় দিচ্ছিল। সুখেন ডেকে বলল, শিবু, একটু জল খাওয়াবে?

দশ

লীলা সুখেনকে বলেছিল, শঙ্করবাবু বিয়ে করতে বলেছেন, এটা খাঁটি মিথ্যা কথা। লীলার বানানো। শহরে সুখেনের বদনাম আছে। গোড়া থেকেই তিনি ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব

ব্যাপারে লীলাকে সাহায্য করেছেন। এর পিছনে যা আছে, তার নাম স্বার্থ। টাকা-পয়সার স্বার্থ।

লীলা বুঝতে পারেনি বা এখনও বোঝে না তত বোকা নয়। সে জানে তার সম্পত্তি হস্তান্তরের সময় শঙ্করবাবু অনেক টাকা পকেটস্থ করেছেন। এমন কি তার বিশ্বাস, এখনও যেটুকু আছে—তা গ্রাস করার মতলব ওঁর মাথায় নিশ্চিত আছে।

কে জানে এ বাড়িটার দাম আদতে কত টাকা পেয়েছেন সে মুসলমান ভদ্রলোক! লেনদেন সবই তো শঙ্করবাবুর মারফৎ হয়েছে!

সম্প্রতি সজল এসে বলে গেছে, শঙ্করবাবুর লোক রূপপুরে আনাগোনা করছে খুব। হরুকে নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছে, ফিরে এসে মণ্ডলপাড়ায় কী সব ফিসফিসানি চালাচ্ছে—ব্যাপারটা রহস্যময়! বেনামে জমি কিনেছে কি না শীগগীর বোঝা যাবে অবশ্য।

লীলার বুক কেঁপেছিল।

দলিলপত্রের ব্যাপার সে একটুও বোঝে না। মোট কতখানি জমিজায়গা ছিল, সে ধারণাও তার স্পষ্ট নয়। হরুকে হাত করেছে বোঝা যাচ্ছে। তাহলে আর কাকে বিশ্বাস করা যায়? বাবার মত শ্রদ্ধা করে যাকে, ছেলেবেলা থেকে যাকে আদর্শ মানুষ বলে জেনে আসছে, সে যদি এমন হয়, সংসার চলবে কেমন করে?

সজল এসে গ্রামের ভালমন্দ অনেক খবর দিয়ে গেছে।

মন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল লীলার। কী আশায় সে এখানে এসে পড়ে আছে? ভালবাসা? শুধু ভালবাসা? চারপাশে অচেনা মুখ, প্রতিটি মুখে যেন ষড়যন্ত্রের ছাপ, লীলা মধ্যে-মধ্যে বড় ভয় পায় কারণে-অকারণে।

শঙ্করবাবু প্রায়ই আসেন বিকেলের দিকে। কোর্ট থেকে ফিরে সটান লীলার বাড়ি। কিন্তু আজকাল হঠাৎ যেন সুখেন তাঁর দুচোখের বিষ হয়ে উঠেছে। শুধু সুখেন সম্পর্কে হুঁশিয়ারী দেওয়া ছাড়া আর কথা নেই।

চলে গেলে লীলা ফেটে পড়ে। কেন, ওর পিছনে লাগা কেন? তুমি যে সাধু মহাত্মা, সেও আমার জানতে বাকি নেই!

বাসিনী বলে, কার কথা বলছ গো?

লীলা সব খোলাখুলি জানিয়ে দেয় ওকে। শুনে বাসিনী মাথা নেড়ে বলে, হুঁ হুঁ বাবা। তখনই মনে মনে আমি আঁতকে উঠেছিলাম! ও বুড়ো সহজ নয়—অজগর। ও নির্ঘাৎ গেলবার তালে ঘোরে। তা বুঝলে দিদি, আমি একটা কথা বলছিলাম—রাগ করবে না তো?

রাগ করব কেন? হঠাৎ লীলার চোখ ফেটে জল আসে।···ছেলেবেলা থেকে তুমি আমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছ বাসিনী—তুমি না থাকলে আমি এখানে হাঁফিয়ে উঠতাম। মা নেই, কিন্তু তুমি আছ।···

ঘণ্টার সামনেই বাসিনী বলে, মা বলেই জেনেছ বাছা। তাই তো বলছিলাম, এ পথ ভালো পথ নয়; সব তো প্রায় ঘুচিয়ে দিলে কানাকড়িতে। এখনও যা আছে তোমার হেসেখেলে চলে যাবে। রূপপুরে ফিরে চল তুমি।

যাবো? লীলা হাল ছেড়ে দেয় যেন।

ঘণ্টা বলে, দিদিমণি, ও বুড়ির কথা শুনো না। কী আছে গেরামে বলদিকি?

ওরে ছোঁড়া! বাসিনী হাঁকরায়।···শউরে বাবু হয়েছিস, তাই না? চুলে টেড়ি বাগাচ্ছিস, টিকীবাজী দেখছিস পরের ঘাড়ে—তোর আবার কী রে ড্যাকরা?···আমি দিদি হাঁফিয়ে উঠেছি। আর একটুও মন বসে না। তুমি গেরামেই চল! ও শেয়ালখেকোর কথা শুনো না।

ঘণ্টা হাহা করে হাসে।···কেনে? তখন যে শহরের নাম শুনেই পানের পিক ফেলতে আর চুলে লাঙল চষতে আনন্দে?···উ, হুঁ হুঁ, বাসিনীদির সে কি সাজগোজের ঘটা গো! যেন বামুনবাড়ির নক্ষিটি! যাচ্ছ কোথায়? না টাউনে! এরই মধ্যে সব রস শুকোল মুখ থেকে, সে কি কথা গো!

ঘণ্টা মুখে যাই বলুক লীলা দেখেছে, ও যখন তখন চুপচাপ বসে থাকে বিমর্ষমুখে। আকাশ দেখে। সামনের মাঠটায় বাচ্চা ছেলেদের মত কী খুঁজে বেড়ায়। ফিরে এসে আনমনে বসে থাকে আর হাতে তার একমুঠো ঘাস। ঘাসের ফুল খুঁটিয়ে দেখে সে। খাঁচার পাখির মত তাকায়।

কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ আর বিষণ্ণ হয়ে ওঠা বাড়িতে সুখেন এসেই প্রাণ

সঞ্চার করে। সে এসে বলে, ব্যাপার কী সব! চুপচাপ যে!

এবং তখনই লীলা বন্যায় ভেসে যেতে-যেতে একটা গাছ পেয়ে আঁকড়ে ধরার সুখে সুখী হয়। সুখেন এত অদ্ভুত সব গল্প বলে যে ওরা সবাই না হেসে পারে না।

ততদিনে সুখেন কিন্তু আরও অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

ওরা দুজনে ছবি দেখতে গিয়েছিল। শো ভাঙবার পর সুখেনের ইচ্ছে ছিল, লীলাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ বসবে। লীলা ওকে খেলাচ্ছে যেন। কথা দিয়েও কথা রাখবার কোন লক্ষণ নেই। সুখেন ভাবে, কোন জাঁকজমক হইচই বা লোক দেখানো ভড়ং করা ঠিক নয়—জানাশুনা দু'চারজন নিয়ে একটু ছোট্ট অনুষ্ঠানমত করা যেতে পারে। ব্যাপারটা তো নিছক মন্ত্র পাঠের। সে পুরুতও মনে মনে ঠিক করা আছে তার। আজ এসব কথা বলার জন্যই সে একটা উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজছিল। সুখেন জানে, ঘরের বাইরে এলে নির্জন রাতের পরিবেশে লীলা কেমন যেন আশ্চর্য বদলে যায়। তখন ওকে দিয়ে সবকিছু করানো সহজ হয়ে ওঠে।

ইন্টারভ্যালের সময় সিগ্রেট খেতে সে বাইরে এসেছিল। সেই সময় হঠাৎ সত্যর সঙ্গে দেখা।

সুখেন দেখেও না দেখার ভান করল। মুখ ফিরিয়ে সিগ্রেট টানছিল সে। সত্য তাহলে এখনও সেই মেয়েটিকে নিয়ে সিনেমায় আসে!

সত্য এগিয়ে এসে বলল, সুখেনবাবু না?

সুখেন ফিরে দাঁড়িয়ে হাসবার চেষ্টা করল। সত্যর মুখে বাবু সম্ভাষণ শুনেও নয়, ওর চেহারায় ওর কণ্ঠস্বরে কী একটা ছিল—সুখেনের বুক ছাঁৎ করে উঠেছিল। একটা ময়লা ধরনের পাঞ্জাবি গায়ে পরেছে সত্য। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। মুখভরা খোঁচাখোঁচা গোঁফদাড়ি। ওর চেহারায় দারুন ময়লা জমেছে। সবচেয়ে খারাপ লাগে চোখ দুটো। আলোর ছটায় চোখ দুটো ভীষণ উজ্জ্বল আর হিংস্র দেখাচ্ছিল। সুখেন বলল, তোকে দেখে ইচ্ছে করেই আলাপ করতে আসিনি। ভাবলাম, দেখি ও কী করে।

সত্য হাসল না। হাত বাড়িয়ে আচমকা ওর হাতটা ধরে বলল, একটু

ওদিকে চল, কথা আছে।

সুখেনের মুখ শুকিয়ে গেল। কী চায় সত্য ? সে চারপাশে তাকাল। ইন্টারভ্যালে অজস্র লোক বেরিয়ে এসেছে হল থেকে। এখানে ওখানে জটলা করছে। একটুকরো ফাঁকা জায়গার তিন পাশে দোকানপাট, অন্য দিকটায় একটা ছোট্ট ভাঙা পাঁচিল—তার ওদিকে বনদপ্তরের সেই লালিত বনটা, যার নীচে গঙ্গা। কেন ? সুখেন গলা ঝেড়ে বলল, কেন ? কী কথা ?

ভাঙা পাঁচিলের কাছে ভীষণ দুর্গন্ধ। অনেকে বসে বা দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করছে দেয়ালে। সুখেন নাকে রুমাল ঢেকে বলল, কী কথা ভাই সতু, এখানে না এলে বলা যাবে না ?

সত্য বলল, তোমাকে আমি কিছুদিন থেকে ভীষণ খুঁজছি। প্রেসে খোঁজ নিয়েছি—নেই ! জগদীশের দোকানে গেছি—নেই। আর যে সব আড্ডায় তোমাকে দেখেছি—সবখানে খুঁজেছি। সবায় বলে······

কথা কেড়ে সুখেন বলল, সে কি ! আমি তো বাইরে কোথাও যাইনি।

সত্য বলল, যাক্‌গে। শেষ আশা ছিল এখানটা। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে দেখতে এসেছিলাম। পেয়েও গেছি।

ত৺ কথাটা কী ? ওদিকে বেল দিয়ে ফেলবে। সুখেন চেষ্টা করে নিজের অস্থিরতাটুকু দমন করছিল। নে, সিগ্রেট খা ! আমরা সেই একই আছি রে ভাই—তুই আমি একই অবস্থা। দুঃখ করে কী হবে বল। মেয়েরা ওইরকমই হয়—কত দেখলাম এ জীবনে !

সত্য সিগ্রেট নিল না। বলল, তোমার কাছে আমি অনেক টাকা পাই। অ্যাদ্দিন চাই নি। এখন টাকার আমার বড্ড দরকার। দিতে হবে।

সুখেন হাসিমুখে ওর দিকে তাকাল। এই কথা ! আমি ভাবলাম, লীলাটিলা কী একটা হবে। হ্যাঁ রে সতু, সেবারও তোকে বলছিলাম, এখনও বলছি, ওকে নিবি ? দুচোখের দিব্যি, ও একটা বুনো পায়রা। জোর করে ধরলেই জব্দ—তখন দে না খাঁচায় পুরে। বল্‌ নিবি ওকে ?

সত্য বলল, টাকাটা কবে দেবে ?

সে হচ্ছে। সুখেন রুমালে মুখ মুছল। চাপাস্বরে ফের বলল, ও এখন হলে আছে। ডেকে এনে ভাব করিয়ে দেব? মামলা করেছিল, ডিভোর্স নিয়েছে—তাতে কী হয়েছে রে? আসলে তো একটা কসবী! গায়েটায়ে একটু পটালেই গলে জল হয়ে যায়।

সত্য কঠোর মুখে বলল, সুখেনবাবু, তোমাকে আমি চিনি। ওসব কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। তুমি টাকা কখন দিচ্ছ বল!

সুখেন তেতে উঠল। কী টাকা টাকা করছিস! কত টাকা পাবি তুই?

দুহাজারের বেশি।

দু'হাজারের বেশি! পাগল হয়েছিস? অত টাকা কখন দিলি আমাকে?

টাকা দেবে কি না জানতে চাই। সত্যর স্বরটা চড়া শোনাল।

সুখেন দমে গিয়ে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিল। ইন্টারভ্যাল শেষ হয়েছে। বেল বাজছে। লোকজন একে একে চলে যাচ্ছে। তেমন চেনা মুখ আশেপাশে কাকেও দেখছে না সে। আজ কোন পার্টিই আনাচে-কানাচে নেই! সে বলল, ঠিক আছে। কালপরশুর মধ্যে প্রেসে আয়। পাবি।

হঠাৎ সত্যর জেদ চড়ে গেল। সে বলল, কালপরশু নয়। আমি এখনই চাই।

বাজে বকো না। বলে সুখেন চলে আসতে চাইল। কিন্তু সত্য ফের তার হাতটা ধরল। দুজনে অল্পস্বল্প ধ্বস্তাধ্বস্তি হচ্ছিল। দোকানপাট থেকে কৌতূহলী লোকেরা এবার এগিয়ে আসছিল। দেখতে দেখতে ছোটখাট ভিড় জমে গেল।

ভিড়ে যা হয়! কেউ মজা দেখে, কেউ মধ্যস্থতা করে। কিন্তু হঠাৎ ভিড় সরিয়ে লীলা চলে এসেছে! ছবি আরম্ভ হয়েছিল ফের। কিন্তু তখনও বেশ কিছুক্ষণ সুখেনের পাত্তা নেই দেখে সে বাইরে চলে এসেছিল। এসেই সব দেখতে পেয়েছে।

লীলা সুখেনের একটা হাত ধরে টানছিল। সত্যও অন্য হাত ধরেছে সঙ্গে সঙ্গে। সে এক হাস্যকর ব্যাপার। টাগ অফ ওয়ারের কেন্দ্রে সুখেন

প্রায় মারা পড়ে আর কী!

হঠাৎ লীলা বলে উঠল, ওকে জিজ্ঞেস করুন তো আপনারা, বন্ধুকে যে টাকা ধার দিয়েছিল, সে টাকা কার? সে টাকা পৈতৃক, না নিজের রোজগার করা টাকা, না কি অন্যের টাকা? তবু টাকা ও পাবে। আমার সঙ্গে আসুক, এক্ষুনি সব দিয়ে দেব।

নাটক জমে ওঠার আগে সত্য ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল।

দুজন কনস্টেবল এসে পড়েছিল ততক্ষণে। ভিড়টা সরে গেল। তারপর সুখেনকে নিয়ে লীলা সোজা গিয়ে রিকশোয় উঠেছে। পিছনে অজস্র টিটকারী অদ্ভুত সব মন্তব্য—সুখেন মুখ নীচু করে বসে থাকল মাত্র।

বাড়ি ঢুকে লীলা বলল, এ রাত্রেই এক্ষুনি তুমি রাণীচকে যাও। টাকা দিচ্ছি। ও যতক্ষণ না পৌঁছোয়, তুমি কোথাও অপেক্ষা করো। পিনাকী-বাবুর বাড়ি যেও। তারপর ওকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে যেও।

টাকাগুলো ভিতর পকেটে রেখে সুখেন বলল, টাকাটা প্রেস কেনার সময় নিয়েছিলাম।

লীলা ধমক দিয়ে বলল, থাক। আর কৈফিয়তে কাজ নেই। যা বলছি করো।

সুখেন বেরল। কচি ছেলের মত মুখটা কাঁচুমাচু দেখে লীলার মন বিমর্ষ হয়ে গেছে।

জেলখানা ডান পাশে রেখে এগোল সুখেন। সামনে একটুকরো ফাঁকা জমির পাশে বিরাট বটগাছ। গাছটার নীচে যেতেই সে দেখল অহীন একটা সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে পথের ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলো এসে ওর সাইকেলের ওপর পড়েছিল। হাতলটা চকচক করছিল। নতুবা অহীনকে সে লক্ষ্য করত না।

সুখেন কাছে গিয়ে ডাকল, অহীন! এখানে কী করছ?

অহীন ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। যেন চমকে উঠল ওকে দেখে। সুখেনদা!

এখানে দাঁড়িয়ে কেন? জগদীশের ওদিকে যাওনি আজ?

নাঃ। অহীন কেমন হাসল। এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

বন্ধুর বাড়ি যাব। এস। যাবে?

বন্ধুর বাড়ি? নাঃ, আপনি যান।

সুখেন রসিকতা করে বলল, কেউ আসবে বুঝি? তারপর ওকে জোর করে টানল।

অহীন সাইকেলটা ঠেলে বলল, আপনি সব মাটি করে দিলেন।

তুমি ফের চেষ্টা করে দেখবে নাকি?

অহীন চলতে থাকল। বলল, নাঃ, চলুন। বন্ধুর ওখানেই যাই। ওর মাস্‌ল ক'ইঞ্চি ফুলেছে, দেখা যাবে।

অহীনের সঙ্গে দেখা হয়ে একরকম ভালই হল। সুখেন ভাবছিল। বন্ধুর ওখানে বসে ওকেই পাঠাবে বরং। ডেকে আনবে জগদীশকে। উঃ, কদিন থেকে ওমুখো হতে পারছিল না সে। হাতে বড় প্রেস থাকায় টাকা আজকাল পাওয়া সহজ হয়ে উঠেছে। কিন্তু নেবার সময় চোখ বুজে যে সর্ত করে বসে, অনেক সময় তা মারাত্মক। পুরো এক ওয়াগন সাইকেলের পার্টস মাত্র দু হাজারে পাওয়া যাচ্ছিল। লালু ঝোঁকের মাথায় ওতে রাজী হয়েছিল। কারণ তক্ষুণি হাতের সামনে করকরে নোটের বাণ্ডিল। পরে গাইগুঁই করলেও আর পাত্তা দেয় নি সুখেন। তবে সাবধান থাকতে হবে। ও জাতগুণ্ডা—তাতে এলাকার ওয়াগান ব্রেকারদের পুরো দলটাই ওর হাতে।

টাকাটা ধার দিয়েছিল জগদীশ। এক দিনের সর্তে। ভাগ্যিস, আজ সতুটা এসে পড়েছিল এদিকে।

গলিপথে কিছুদূর গিয়ে ওরা থামল। ফেলটুদা আসছে। বেশ টলতে টলতে আসছে। এসেই তো পকেটে হাত দেবে সুখেনের। সুখেন বিরস মুখে বলল, শালা ঢ্যামনা!

অহীন কী বলতে যাচ্ছিল, ওর হাত ধরে টেনে বাঁদিকে গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল সুখেন। ফেলটুবাবু ছড়ি হাতে চলে গেল। লক্ষ্যও করল না।

অহীন বলল, ওঁকে দেখে লুকোলেন যে ?

সুখেন চাপা স্বরে বলল, কাছে টাকা আছে।

জগদীশের টাকা দিয়েছেন ? অহীন প্রশ্ন করল হঠাৎ।

না আজই দেব। কেন ? ও কিছু বলছিল নাকি ?

অহীন হাসল। শাসাচ্ছিল। পুলিশকে লেলিয়ে দেবে টাকা না পেলে।

সুখেন দাঁত কিড়মিড় করে বলল, কবে শালার চালচুলোকে দিতাম উড়িয়ে ! কেবল রক্ষে করল ওই ছুঁড়িটা। একটা সুন্দর ঢাল পেতে রেখেছে মাইরি !

অহীন বলল, শিবির কথা বলছেন ? শিবিকে আপনার ভাল লাগে ?

কেন লাগবে না ? সুখেন এবার হাসল খিকখিক করে। তোমার লাগে না ?

অহীন একটা অশ্লীল উক্তি করে বসল শিবানীর নামে। সুখেন অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে। এত সুন্দর শান্ত ভদ্র ছেলের মধ্যে একটা বিষপোকা বাস করতে। কেন সে হঠাৎ অবাক হল, বুঝতে পারল না। বুঝতে পারল না, মাঝে মাঝে অহীনকে দেখে কেন তার বড্ড মায়া হয়। ওর বাবা ছিল রোডস ডিপার্টের ওভারসীয়ার। অ্যাকসিডেন্ট হয়ে মারা যায়। মা অনেক কষ্ট করে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন। সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেই হঠাৎ কলেজ ছেড়ে দিল অহীন। তৈরী পোষাকের হকারী করল কিছুদিন। প্রশ্ন করলে বলেছে, কী করি !

ঘরে তিনটি ধিঙ্গি বোন—দুজন ওর বড়, তৃতীয়টি ছোট। সবার বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। বড় দুজনে স্কুল ফাইনাল পাশ করেই ক্ষান্ত দিয়েছিল। ছোটটি এখনও ছাত্রী। তবে রমা আর শোভার চেয়ে অনু দেখতে সুন্দর। অবিকল অহীনের মত।

বন্ধুর বাড়ি রেল লাইনের ওপারে। একটু ঘুর পথেই যাচ্ছিল ওরা। জগদীশের দোকান এড়িয়ে যেতে এছাড়া আর কোন পথ নেই।

দু পাশে ছড়ানো-ছিটানো ঘর-বাড়ি। বিস্তর ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে। বড়-ছোট অজস্র গাছ চারদিকে। চওড়া রাস্তার দুপাশে শিরীষ

দেবদারুর সারি। দূরে-দূরে ল্যাম্পপোস্টে বাতি জ্বলছে। একটা পাণ্ডুর আলো—জ্যোৎস্নার মত পড়ে আছে পথে। কোথাও ছায়া জমে আছে। চলতে চলতে সুখেন বলল, দিদিদের কাজটাজ কিছু জোটাতে পেরেছ ?

না। তেমন সুবিধেমত কিছু হচ্ছে না। ছোড়দি একটা প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী অবশ্যি পেয়েছিল। সে অনেক দূরে এক অজ পাড়াগাঁয়ে। যাতায়াতের ভাল পথ নেই। তাছাড়া আবহাওয়াও ভাল না গ্রামটার। মা যেতে দিল না। মেজদি কল্যাণীতে কী একটা ট্রেনিং-এর চান্স পেয়েছে। সেপ্টেম্বরে ওদের সীজন শুরু হবে, তখন যাবে।···অহীন জানাল।

ও। সুখেন একটু কেসে বলল। যদি অসুবিধে না হয়, তোমার মাকে একবার বলে দেখতে পারো, আমি একটা কিছু দিতে পারি। মাইনে মন্দ হবে না।

কিসে ?

কাজটা বাজে। তবে নিজে হাতে তো কিছু করছে না। যারা করবার করবে, ও শুধু একটু দেখাশুনা করবে মাত্র। এখানে-ওখানে যেতে হবে কখনও।

কী কাজ ?

আমার প্রেসের সঙ্গে একটা বাইণ্ডিং কনসার্ন খুলব, ভাবছি। ঠিকে দপ্তরী দিয়ে সময়মত কাজ হয় না। অনেক মাল রিজেক্ট করে পার্টি। বেশির ভাগই তো সরকারী অর্ডার। বুঝতেই পারছ। একটু দেখা-শোনা, একটু ঘোরাঘুরি—মানে ডেলিভারীর সময় নিজে যাওয়া—ওতেই কাজ হবে।

অহীন একটু উৎসাহ দেখাল। তা, মন্দ হবে না।

সুখেন সিগ্রেট ধরাল। অহীনকেও দিল।···তুমি আমার ছোটভাইয়ের মত। এক জায়গায় আড্ডা দিই, মাল টানি, তাস-পাশাটা খেলি—তাতে কী হয়েছে ? তোমাকে দেখে খুব কষ্ট হয় আমার অহীন, ঈশ্বরের দিব্যি।

অহীন একটু হাসল মাত্র। সে সুখেনকে অগাধ টাকার মালিক

বলে জানে।

সুখেন বলল, ভদ্রবংশের শিক্ষিত ছেলে তুমি। তোমাকে বোঝাব কী ভাই, যা শালা দিনকাল পড়েছে, বলার নয়। যা হোক একটা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। কোনরকম ভ্যানিটির কোন মূল্য আজকাল নেই।

অহীন মাথা নেড়ে সায় দিল।

রমা অবশ্যি বেশ চালাকচতুর মেয়ে বলেই মনে হয়। ও পারবে। অর্ডার আনতে হলে ওকে যদি পাঠাই, তো কথাই নেই।…সুখেন নানারকম সম্ভাবনার কথা বলতে থাকল।

অহীন আজ রাতেই তার মাকে বলবে। বসে থাকার চেয়ে মাসে একশোটা টাকা—এ সুযোগ সহজে আসে না।

বস্থুর বাড়ির দরজায় এসে সুখেন বলল, কথাটা কিন্তু প্রাইভেট। অনেকে আমার কাছে এসেছে খবর পেয়ে। কাকেও পাত্তা দিই নি।

বস্থু বাড়ি ছিল। কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এল। পুরো সাড়ে ছফিট উঁচু, ডন-বৈঠক-করা শরীর, গলায় চাঁদির তক্তি, গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জী, পরনে একটা কালো প্যান্ট। ওর বেল্টটা আস্ত নিকেলের। এ শহরের খুব কম লোকই বাস্তবত বোম্বে গেছে, এমন কি বস্থু নিজেও না—তবু লোকে ওর নাম দিয়েছে বস্থু। সম্ভবত বোম্বে সিনেমার ডাকাত হিরোর সঙ্গে মিলিয়ে। এমন মূর্তি লোকে দেখেছে ছবিঘরে।

সুখেনদা যে। বস্থু হাসল। হাসিটি বড় অমায়িক।

সুখেন বলল, ভাবছিলাম, বাড়ি আছো কিনা। চল, বলছি।

বস্থু আর যাই হোক, তথাকথিত লোচ্চা বদমাইস নয়—সেরকম কোন দুর্নাম তার নেই। কিন্তু বিপদে-আপদে লোকে তার কাছে উপকার পায়! ওর একটা ক্লাব আছে। দরকার হলে চেলাচামুণ্ডাসমেত বেরিয়ে পড়ে বস্থু। তাবলে ও রবিনহুড নয়। ওর চোখে গরীব বড়লোক বলে কিছু তফাৎ নেই। অন্যের ন্যায়-অন্যায় বোধের সঙ্গে ওর ন্যায়-অন্যায় বোধের তফাৎ আছে প্রচণ্ড। কোন পক্ষ যে ও নেবে, এটা তাই আগে থেকে বলা মুশকিল। তবে যে পক্ষে দাঁড়াবে, সে পক্ষ তো বলবেই বস্থু উপকারী মানুষ!

বন্ধুর ঘরে সুখেন বসে রইল। অহীনকে পাঠাল জগদীশকে ডাকতে। টাকাটা বন্ধুর সামনে দেওয়ার উদ্দেশ্য আছে। জগদীশ যা পাজী, সুযোগ পেলে দুর্বল লোককে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়ে। ক্লাসে বসে হার হলে, টাকাটি দিব্বি যোগায়। কিন্তু দশ টাকা দশবার আদায়ের ফিকিরে থাকে। সুখেন এর আগে কম খেসারৎ দেয় নি! বেমালুম অস্বীকার করে জগদীশ বলেছে, কই, কখন টাকা দিলে? চালাকির জায়গা পেলে না? মুশকিল হচ্ছে, ওরও একটা দল আছে। লালু তো পা-চাটা কুকুর। তার ওপর পুলিশমহলে ওর খাতির অসাধারণ। সুখেন জানে, ও একটা টাউট।

তা সত্ত্বেও চোরামাল কিনল ওর সামনে, এমন কি টাকা ধারও নিল ওর কাছে—এ সাহসের একমাত্র কারণ, লালু। লালুর ব্যাপারে জগদীশ তার মরা বাবার প্রেতমূর্তির সামনেও কিছু খবর পাচার করতে নারাজ। লালুকে ও এত ভয় করে।

সুতরাং একটু আগে সুখেন যে অহীনকে বলছিল, জগদীশের শক্তি হচ্ছে তার মেয়ে শিঁবানী বা তার যৌবন সেটা নিতান্ত কথার কথা। অহীনও হয়ত তা বোঝে। ও আড্ডায় সে নতুন হলেও লেখাপড়া সবার চেয়ে বেশি জানে। তাই অনেক ব্যাপারে তার বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর বিশ্বাস ওদের সবারই আছে।

সুখেনের মনে হল, এ সময় অহীনকে হঠাৎ পাওয়াও তার পক্ষে ভাল হয়েছে। ওর বোনকে চাকরী সে দেবে। অহীনের মত ছেলেকে এই অন্ধকার পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হিসেবে পাওয়া একরকম ভাগ্যের কথা। কারণ, এ পাতালপুরীতে যারা চারপাশে থাকে, তারা মানুষের সব গুণগুলো হারিয়েই এখানে এসেছে। এমন কি হয়ত সে নিজেও। এবং এদের কাকেও বিশ্বাস করা যায় না। অহীনকে এখনও বিশ্বাস সে করতে পারে হয়ত। অহীন এখনও অনেক ভাল জিনিষ তার পকেটে নিয়ে ঘুরছে। এখনও সব খুইয়ে বসে নি।

বন্ধু সব শুনে একচোট হাসল। ব্যাটা জগাটা এমন শয়তান জানতাম না তো! কিন্তু সুখেনদা, কাজটা ভাল করেন নি। ওকে জেনে-

শুনে ওর কাছে ধার করলেন, আবার ওর সামনেই চোরামাল কিনলেন?

সুখেন বলল, ঝোঁকের মাথায় ওটা হয়ে গেছে ভাই। এ ব্যাপারটা আমার সম্পূর্ণ নতুন। এখন পস্তাচ্ছি। একে তো ওগুলো সামাল দেওয়া এক ঝক্কির, তার ওপর আমি তো এখন জগদীশের কাছে দুধেল গরু।

বঙ্কু গম্ভীর মুখে বলল, ব্ল্যাকমেল করবে বলছেন?

ঠিক তাই। সুখেন চিন্তিত মুখে বলল। আসলে কী জানো, এ ব্যাপার এর আগে কখনও করিনি। চোখের সামনে অনেকবার লালু মাল পাচারের ব্যাপারে দরদস্তুর করেছে পার্টির সঙ্গে, আমাকেও অফার দিয়েছে, উৎসাহ দেখাই নি। একবার, শুনলে হাসবে, এক বস্তা গাঁজা নিয়ে আমার প্রেসে হাজির। জলের দামে দিতে চাচ্ছিল। রাখতে পারি নি। হঠাৎ এবার কেমন লোভ হয়ে গেল।

অহীনের সাইকেলের ঘণ্টা বাজল বাইরে। বঙ্কু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। অহীন বলল, জগদীশ এল না। বলল, কী দরকার? সকালে যাব।

বঙ্কুর ইজ্জতে ঘা লাগবার কথা। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, আমার নাম করেছিলে? বলেছিলে, আমি ডেকেছি?

অহীন বলল, হ্যাঁ। সুখেনদা তো সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

সুখেন বলল, ভুল করে আমি এখানে আছি, বলোনি তো?

পাগল! অহীন জবাব দিল। তা কেন বলব?

সুখেন মাথা চুলকে বলল, শালা আঁচ করেছে ব্যাপারটা। দারুণ গভীর জলের মাছ কিনা? এখন বঙ্কু ভাই, কী উপায়? তোমার কথাই শোনা যাক।

বঙ্কু ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুখেনের কথা শুনে সোজা হয়ে বলল, মাল কোথায় আছে?

সুখেন একটু ইতস্তত করে বলল, আমার এক মাসির বাড়ি।

সেটা কোথায়?

এখান থেকে মাইলখানেক দূরে। একটা কলোনীর মধ্যে।

কিসে নিয়ে গিয়েছিলেন ?

এ যে দেখছি, উকিলের মত জেরা করে। সুখেন বিরক্তি চেপে বলল, ট্রাকে।

কার ট্রাক ?

তাও বলতে হবে ! সুখেন হাসবার চেষ্টা করল। মহীউদ্দীনকে চেনো ? তার।

ও। মাসি বিশ্বাসী ? কেমন মাসি ?

পাতানো মাসি।

এক কাজ করুন। গণশার লরীটা ওর বাড়ির দোরে আছে। এক্ষুনি মাল তাতে চাপিয়ে আমার এখানে রেখে যান। রাখবার জায়গা আছে ভাল। গণশাকে গিয়ে বলুন আমি ডেকেছি। সে এলে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সুখেন ঘেমে উঠে বলল, তারপর ? জগদীশের টাকা ?

দেবেন না। দেখি শালা কী করে ! আমি ডেকেছি, তবু এল না শূয়ারটা ! কী স্পর্ধা।

বন্ধুর চরিত্র এই রকমই। সুখেন জানে। সুতরাং নির্দ্বিধায় ওকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু পরে যে-পার্টি আসবে, তারা বন্ধুর বাড়ি থেকে মাল নিতে চাইবে কি ? জায়গাটা বড় ফাঁকার মধ্যে—কাছেই পুলিশের ফাঁড়ি আছে একটা। যাই হোক, সেটা পরে দেখা যাবে। আগে পার্টি ঠিক হোক, তারপর সে ভাবনা। তা ছাড়া বন্ধু যখন নিজে থেকেই বলছে।

সুখেন বলল, অহীন, আমার সঙ্গে চল ভাইটি।

অহীন একটু ইতস্তত করছিল। আমার খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে সুখেনদা। এক জায়গায় যাবার কথা ছিল।

বুদ্ধিমানের মত বন্ধু বলল, ঠিক আছে। ও যাক না। ওকে ছেড়ে দিন। এ কাজে একা ভালো।

দুজনে একসঙ্গেই বেরলো বন্ধুর বাড়ি থেকে। পথে এসে অহীন বলল, অবস্থা খুব ঘোরালো হয়ে উঠল মনে হচ্ছে সুখেনদা ! তখন আসবার সময়

জানলে আপনাকে আমি নিষেধ করতাম এখানে আসতে। বন্ধুর গায়ে জোর আছে, দলবলও আছে—কিন্তু ওর বুদ্ধিশুদ্ধি বড় কম। পালোয়ান হলে যা হয়, আর কী?

সুখেন সিগ্রেট ধরাল। অহীনকেও দিল। বলল, যা আছে ভাগ্যে, হোক। তুমি কিন্তু ভাই স্পীকটি নট।

অহীন হাসল। পাগল!

পরস্পর আলাদা পথে চলবার মুহূর্তে সুখেন বলল, তোমার ছোড়দির কথাটা কিন্তু ভুলো না।

এগারো

যমুনা জেগে ছিল। দরজা খুলে দিল। সত্য নিঃশব্দে বাড়ি ঢুকলে সে প্রশ্ন করল, এত রাত হল যে?

সত্য জবাব দিল না। তেমনি নিঃশব্দে জামা খুলল। ধুতি বদলে লুঙ্গি পড়ল। তারপর বারান্দার চেয়ারে গুম হয়ে বসে থাকল।

বাইরে অন্ধকার থমথম করছে। বেশ ভ্যাপসা গরম চলেছে কদিন থেকে। আষাঢ়ের অনেকগুলো দিন পেরিয়ে গেল, তবু এখনও বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে নি। যমুনা একটা হাতপাখা এনে পাশে দাঁড়িয়ে ওর গায়ে বাতাস করতে যাচ্ছিল, সত্য পাখাটা নিজের হাতে নিল। যমুনা উঠোনে নেমে গিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে আনল। বালতিটা বারান্দার ধারে রেখে বলল, হাতমুখ ধুয়ে নাও।

সত্য বসে আছে তো আছেই, জবাব নেই। হেরিকেনের হলুদ আলোয় ওকে কেমন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। যমুনা ফের বলল, কথা বলছ না যে? কী হয়েছে?

তবু জবাব না পেয়ে যমুনার রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কিছু দিন থেকে সত্য যেন আগের মত মন খুলে কথা বলে না ওর সঙ্গে। মেজাজও কেমন চটে থাকে সব সময়। সামান্য ব্যাপারেই ত্রুটি খোঁজে। যমুনা তর্ক করে না। যেন ব্যাপারটা উপভোগ করছে, এমন চপল স্বরে বলে, এবার

সব তেতো লাগছে বুঝি! মাথা দুলিয়ে ঠোঁট টিপে হেসে সে বলে, ও তো জানিই বাবা। দুদিনেই বাসি হয়ে যাবো। পুরুষ মানুষের এটা আমি হাড়ে-হাড়ে জানি।···সত্য তখন বলে, সে তো জানবেই! ভাল জেনে-শুনেই এখানে এসেছিলে। আর একথায় যমুনা হু হু করে কেঁদেছে। ঘরে গিয়ে উবুড় হয়ে শুয়ে থেকেছে। অগত্যা সত্য নিজেই রান্না করে ওকে ডাকতে গেছে—ওঠ, খেয়ে নেবে। যমুনা না উঠলে নির্বিকারভাবে সত্য নিজে খেয়ে বেরিয়ে গেছে। যমুনার তারপর না উঠে উপায় নেই। নিজেকেই তার অবাক লাগে, আস্তে আস্তে নিজের শরীরের প্রতি একটা তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি জেগে উঠেছিল যেন! তার দেহে আরেক দেহ যেন বিষফোঁড়ার মত দানা বেঁধেছে, তার জন্যে ভাবনা—ভবিষ্যতের ভাবনা, আর ওদিকে সুভদ্রা—মা বলে যাকে জেনেছে আজ আর তাকে মা ভাবতে কেন প্রচণ্ড ঘৃণা, কোনদিন ছোটবাবা এলে তার মুখোমুখিই বা হবে কেমন করে—এই সব অজস্র চিন্তা তাকে ব্যাকুল করছিল। বুঝতে পারছিল, একটা ভীষণ ফাঁদে আটকে গেছে সে। অথচ এতদিন যে লোকটিকে মনে হয়েছে তার নিশ্চিত উদ্ধার, সেও দূরে সরবার চেষ্টা করছে যেন। নারীজীবনের কিছু সত্য স্পষ্ট হচ্ছিল তার চোখে। সে ভয় পাচ্ছিল। দেখছিল, পৃথিবী আর আগের মত সহজ ও সুন্দর হয়ে নেই। এখানে মামলা আছে, ঘৃণা আছে, অপমান আছে—আর কোথাও অদূরে আবছায়াভরা কোণ থেকে কার ষড়যন্ত্রসঙ্কুল দুটো জ্বলন্ত চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। হাতে মারাত্মক সাঁড়াশি গলায় ঝুলন্ত যেন সাপ, তার চোখে চশমাও দেখতে পায়—সে অবিকল ননী ডাক্তারের মত—এবং মাঝে মাঝে যমুনার ঘুম পেলে সে এগিয়ে আসে তার নাভি লক্ষ্য করে। এমন কি নাভির কাছে ঠাণ্ডা চাপ, কে যেন চিৎকার করে কেঁদে ওঠে···এই সব অদ্ভুত ভয়াবহ দৃশ্য!

চাঁপা ঝি মেয়েদের শরীর সম্পর্কে অজানা রহস্যের ঝাঁপি খুলত তার সামনে। চাঁপার মুখেই শুনেছিল পেটে বাচ্চা এলে মেয়েরা স্বপ্নে সাপ দেখে। ঢোঁড়া সাপ।···যমুনা কি কিছু দেখেছিল? বমি করার আগে বা তারও পরে কোন রাত্রে?···গা শিউরে ওঠে। দেখেছিল যেন,

দেখেছিল !

যমুনার কান্না পেল আজ। রাগে দুঃখে সে বলে উঠল, কে মুখে তালা দিল, বল তো ? বুঝেছি, কোথাও যাওয়া হয়েছিল বাবুর। ডাক্তার-টাক্তার ওসব বাজে কথা। বেশ তো, যাকে নিতে মন হয়েছে, নিক। আমি যেদিকে দু চোখ যায়, চলে যাচ্ছি। এখুনই যাচ্ছি।

সত্যি সত্যি ঘরে ঢুকে দুটোপুটি কী যেন করতে থাকল যমুনা। তখন সত্য কথা বলল। কী হয়েছে, মেজাজ খারাপ করছ কেন রাত দুপুরে ?

যমুনার জবাব এল না এবার। সে দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বারান্দা থেকে উঠোনে নামল। তখনও সত্য চুপ করে বসে আছে।

দরজা খুলে বেরিয়ে যেতেই সত্য নেমে গেল। দরজার বাইরে যমুনা হনহন করে চলেছে। সত্য ছুটে গিয়ে ওকে ধরল। আঃ, কী করছ রাত দুপুরে ! লোকে কী বলবে ?

যমুনা বলল, যা বলার বলতে বাকি আছে নাকি ? মুখ দেখানোর উপায় রেখেছ কোথাও। যমুনা কেঁদে উঠল।…সবাইকে পর করে দিলে। কেউ আর বাড়ি আসে না ! ঘাটে নামতে লজ্জা লাগে—ওরা কী চোখে তাকায় আমার দিকে আমি কি বুঝিনে ? হাত ছাড়—যেতে দাও।

ছিঃ, পাগলামি করো না ! সত্য টানল ওকে। কোথায় যাবে ?

ভেবেছ, তুমি ছাড়া বুঝি গতি নেই আমার ? দড়ি একগাছা জুটবে না ? মা গঙ্গায় ঝাঁপ দিতেও তো পারব। ইঁদুরমারা বিষও পাওয়া যায় দোকানে। যমুনা হাঁফাচ্ছিল।

যমুনা ! সত্য ধরা গলায় ভৎসনা করতে চাইল। সে চমকে উঠেছিল। তাহলে মৃত্যুর কথাও সে ভাবতে পারে—ভেবেছে ! এত-দিনে যেন কে তার হাত ধরে মৃত্যুকে চিনিয়ে দিয়েছে। বলেছে—দেখ যমুনা, যখন সারা পৃথিবী মুখ ফেরাবে, চোখের জলে ঈশ্বরকেও পাবি না, তখন এই তোর একমাত্র সখা—তোর সবচেয়ে প্রিয়জন—মা-বাবাও ঘৃণা করেন, এর কাছে ঘৃণা নেই। এ শুধু ভালবাসে। যথার্থ মায়ের মত কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে এর জুড়ি নেই।

সত্য মাঝে মাঝে দূর থেকে সে ঘুমপাড়ানি গানের সুর শুনেছে কান

খাড়া করে। তন্ময় হয়েছে। সে সুর বুঝি যমুনাও শুনল এতদিনে। সত্য দু হাতে ওকে শিশুর মত তুলে নিল। চুমু খেতে খেতে বাড়ি নিয়ে গেল। একেবারে ঘরে গিয়ে নামাল। বলল, ছিঃ, আমাকে ভুল বুঝো না।

আস্তে আস্তে সব শান্ত হয়ে উঠল বাইরের রাত্রিটার মত—কিন্তু ঠিক তার মতই একটা ভ্যাপসা গরম দুজনেই অনুভব করছিল।

সুখেনের ব্যাপারটা শোনাল সত্য। দুজনে জোর হেসেও ফেলল। শেষে সত্য বলল, রাগ তোমার উপর হয় না, এমন নয়, খুবই হয়। আজও হয়েছিল।

যমুনা বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল, কেন রাগ হবে? কী দোষ করেছিলাম আজ?

অকপটে সত্য বলল, আজ কর নি। তবে ভেবেছিলাম, আমাকে তুমি ঘেন্না করবে। ঘেন্না করে পালিয়ে যাবে এখান থেকে।

যমুনা ফোঁস করে উঠল, তাই বুঝি? তাহলে এই তোমার মনের কথা? আমি পালাই, তোমার বেশ মজা হয়, তাই না? বেশ—শুনে রাখো, যাও পালাতাম, আর পালাচ্ছি নে। দেশে মানুষ নেই? বিচার নেই? মামীর মত তোমাকে জব্দ না করে নড়ছি নে। কালই যাব তোমার হাটুবাবুর কাছে।···

সত্য হেসে বলল, নাঃ, ও একটা কথার কথা বলছিলাম। কিন্তু সত্যি বল তো যমুনা, আমাকে তোমার ঘেন্না করে না?

যমুনা বলল, তোমার করে, তা বুঝতে পারি। আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি কি পুরুষ মানুষ?

সত্য বলল, তোমারও নিশ্চয় করে!

যমুনা মুখটা ফিরিয়ে জবাব দিল, আগে করত না, খুব মায়া লাগত। এখন আর লাগে না একটুও।

সত্য ওর হাতটা ধরে বলল, কেন যমুনা? তোমাকে নষ্ট করেছি বলে?

না। মুখ তুলে সোজাসুজি তাকাল যমুনা। তীব্র জ্বলন্ত চোখে

তাকিয়ে বলল, না, সেজন্যে নয়।

কী জন্যে?

জানি নে, যাও!

বল লক্ষ্মীটি!

চাপা স্বরে ফিসফিস করে উঠল যমুনা। ফের ওর চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। বলল, তুমি আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাও, আমি যাব না।

কেন যাবে না?

আমার বুঝি ঘর-সংসারের সাধ থাকতে নেই? যমুনা তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল।··আমার ভবিষ্যৎ নেই? সাধ-আহ্লাদ নেই। আরও পাঁচটা মেয়ে যা চায়, আমার তা চাইবার বয়স হয় নি?···কিন্তু তুমি কী চাও, আমার জানতে বাকী নেই।

কী চাই আমি?

ন্যাকা! বোঝো না কিছু! তুমি চাও, আমি চিরজীবন তোমার রক্ষিতা হয়ে থাকি। ছেলেপুলে হবে না, বউ রাখার ঝঞ্ঝাট থাকবে না—বেশ ওপরে-ওপরে ফুর্তি চালিয়ে যাবে। বাঃ, চমৎকার! সেটি কিছুতেই হচ্ছে না, বলে রাখলাম! আমার জীবনটা নষ্ট করতে তোমাকে দেব না!···যমনার কান্না আবার বেড়ে গেল।

সত্য ঘামছিল। আস্তে আস্তে বলল, সে তো ঠিকই। বার বার মাথা নাড়ল সে। বলল, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, যমুন। এও একটা কথা। কিন্তু কী করব বল তো?

কেন বিয়ে করছ না আমাকে?

সত্য ওর কথার ঝাঁজে মুখ নামাতে বাধ্য হল। বলল, বিয়ে!

হ্যাঁ, বিয়ে। যমুনার ঠোঁট ব্যঙ্গে কুঞ্চিত হল কথাটা বলতে।···লজ্জা করবে বুড়ো বয়সে টোপর পরতে? আমার কিন্তু করবে না। সব লজ্জা তো তুমিই গিলে খেয়ে ফেলেছ।

সত্য একটু হাসল।···নাঃ। তা কেন?

পষ্টাপষ্টি বলে দিচ্ছি, সাত দিনের মধ্যে বিয়ে না করলে, আমি

তোমার নামে মামলা করে আসব মামীর মত। যমুনা উঠল। বাইরে গিয়ে বলল, নাও, ওঠ। হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।

সত্য গৃহপালিত পশুর মত ওর আদেশ পালন করছিল।

বারো

প্রেসের লাগোয়া একটা ঘরে সুখেন থাকে। বেশ সাজানো-গোছানো ঘর। লীলা প্রেসে এলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কম্পোজিং দেখে, ছাপানো দেখে, এটা-ওটা নিয়ে প্রশ্ন করে—ওরা বুঝিয়ে দিলে বোঝবার ভান করে, তারপর সুখেনের ঘরে গিয়ে ঢোকে। বিছানাতেও শুয়ে পড়ে অপরূপ ভঙ্গীতে। সুখেন পাশে বসতে গেলে অমনি বলে, এই সাবধান, এখন আমি তোমার মনিব না? তারপর দুজনে বসে গল্প করে। এক সময় লীলা হাই তুলে উঠে পড়ে। বলে, চলি। ও বেলা যেও।

এক সময় গা-ভরা সোনার অলঙ্কার থেকেছে লীলার, সিঁথিতে থেকেছে ঘন উজ্জ্বল সিঁদুর—ডিভোর্সের পর তার বেশ বদলেছে। গলায় মিহি চেন, হাতে দুটো বালা মাত্র। সিঁথিতে সিঁদুর পরে না আর। বরং এ বেশে সুখেনের নাকি ভালই লাগে খুব।

লীলা বাড়িতে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল সুখেনের জন্য। রাণীচক যেতে শেষ বাস রাত এগারোটা। ওদিকে সাঁইথিয়া থেকে যে বাসটা আসে, তা রাত বারোটা পঁচিশে রাণীচক পৌঁছায়। সুতরাং রাতেই ফিরে আসবার অসুবিধে নেই।

তবু সুখেনের পাত্তা নেই। তার ফিরে এসে আগে লীলাকে খবরটা দেবার কথা। কিন্তু পরদিন দুপুর হয়ে গেল, তবু সুখেন গেল না। তখন লীলা প্রেসে চলে এল।

হেড কম্পোজিটার খগেন বলল, বাবু কাল সন্ধ্যায় বেরিয়েছেন, এখনও আসেন নি। লোকজন এসে ঘুরে যাচ্ছে। খুব অসুবিধে হচ্ছে কাজের।

স্বল্প পরিসর জায়গায় সুখেনের হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিল। চেয়ারে নরম গদী। লীলা বসল। আগে এটা বারান্দা ছিল। এখন কাঠের দেয়াল ঘিরে ঘর উঠেছে।

লীলা বসে থাকতে থাকতে অনেক লোক সুখেনের খোঁজে এল। চলে গেল। লীলা বিরক্ত মুখে বলল, খগেনবাবু, শুনুন!

কালিমাখা হাত দুটো ন্যাকড়ায় ঘষে নিয়ে খগেন এল।

ও কোথায় কোথায় থাকে, খোঁজ নিয়েছিলেন?

খোঁজ এখনও নিই নি। খগেন জানাল। প্রায়ই তো এমন হয়। তবে বলছেন যখন, পাঠাচ্ছি।

কোথায় থাকে ও? কি করে বেড়ায়?

খগেন লীলার প্রশ্নের ভঙ্গীর জন্য নয়, সুখেনের নিষেধ রয়েছে—একটু বিরক্ত হল। ঘাড় চুলকে বলল, কালেকটরীর ওদিকে একটা চায়ের দোকানে মাঝে মাঝে বাবু বসেন, জানি। একটা আড্ডা আছে কিসের যেন।···

কী করে ওখানে?

আজ্ঞে, তা ঠিক জানিনে। খগেন একটু সতর্ক হল এবার।

ভিতর থেকে মেসিনম্যান কানাই বলল, আজ্ঞে মা, উনি পার্টির কাছে যাতায়াত করেন তো, পথে হয়ত বসেন ওখানে। সরকারী আপিসের কাছেই দোকানটা, আপিসে বিলের টাকা আদায়ে গেলেও ওখানে বসেন। খগেনদা কী সব বলে, বুঝিনে!

ঠিক আছে। লোক পাঠান ওখানে। লীলা আদেশ করল।

লোক সাইকেলে বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সুখেনের আবির্ভাব। লীলাকে দেখে সে চমকে উঠেছিল। শুকনো হাসি মুখে রেখে সে বলল, কী ব্যাপার?

লীলা গম্ভীর মুখে বলল, তোমার ব্যাপারটাই আগে শুনি।

ঘরে চল, বলছি সব। সুখেন দরজার তালা খুলে পর্দাটা টেনে দিল।

লীলা বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে বালিসটা জানুতে রাখল। বলল,

টাকা দিয়েছ? নিল?

সুখেন একটা সিগ্রেট বের করে জ্বালাতে গিয়ে হাসিমুখে তাকাল লীলার দিকে। বলল, খাব?

লীলা ভ্রূ কুঁচকে বলল, আমার কথা কি শোন নাকি যে হুকুম চাইছ?

নাঃ, সিগ্রেট খাওয়া ছেড়েই দিয়েছি তুমি বলার পর। সুখেন সিগ্রেট জ্বালল। উঃ কী পাজী লোক রে বাবা! টাকা নেবে—তাও কত রকম নবাবী কায়দা। তারপর অবশ্য নিল।

পিনাকীবাবুর সামনে দিয়েছ তো?

সুখেন মাথা নাড়ল। নাঃ। বাস থেকে নেমেই দেখি, ওর সেই চায়ের দোকানে আলো জ্বলছে। দেখলাম ব্যাটা আমার আগের বাসেই হাজির হয়েছে। তারপর···

লীলা রুদ্ধশ্বাসে বলল, তারপর?

বললাম, এই নাও টাকা। নিল।

কোন কথা বলল না?

বলত। আমি ফুরসত দিই নি। উঠে এসেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে।

লীলা একটু চুপ করে থেকে বলল, বাস আসতে তো দেরী ছিল। ততক্ষণ কোথায় ছিলে?

রাস্তায় পায়চারী করছিলাম।

লীলা মুখ নামিয়ে বালিসের কোণের কোঁচকানো ঝালরটা সোজা করছিল। মুখ তুলে কেমন একটু হেসে ফের বলল, কোন কথা বলল না তোমাকে?

নাঃ। বলবার আর থাকল কী যে বলবে! আর তাছাড়া···সুখেন থামল।

তাছাড়া কী?

ও তোমার শুনতে নেই। কাল সিনেমাহলের সামনে তোমার নামে যাচ্ছেতাই বলছিল, পাছে তেমন কিছু বলে—আমার শোনা কঠিন হবে। রাণীচক ওর নিজের দেশ—আমার বিদেশ। তাই আমিও কেটে পড়েছিলাম।

লীলা তীব্রস্বরে বলে উঠল, কাল আমাকে গাল দিচ্ছিল, তা তখন বললে না কেন ? ওর মুখে জুতো মারতাম না ! নচ্ছার পাপী কোথাকার ! নিজের মেয়ের তুল্য—ভাগ্নী—তাকে যে নষ্ট করতে পারে, সে কী !

ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে লীলা স্তব্ধ হল। সুখেন বলল, ছেড়ে দাও। ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক কিসের ? যা খুশি করুক।

লীলা নিজেকে সামলে নিল। বলল, খুব ভাবনায় ছিলাম এলেনা দেখে। শত্রুর দেশে গেলে অত রাত্রে ! তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে থাকল।

সুখেন এবার কাজের কথায় এল। একটা ফোন রাখা দরকার। ফোন না থাকায় খুব অসুবিধে হচ্ছে। শহরে সবচেয়ে বড় প্রেস। ছোট প্রেসগুলোরও ফোন আছে, লীলা প্রেসের নেই। সামান্য কিছু টাকা চাই মাত্র। আর···

সুখেন যার কথা বলতে যাচ্ছিল, সে এসে গেছে সে মুহূর্তে। তারপর দুহাত তুলে নমস্কার করেছে—প্রথমে সুখেনকে, তারপর লীলাকে। লীলা চোখ বড় করে তাকাচ্ছিল।

সুখেন বলল, এর কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। পরিচয় করিয়ে দিই। রমা, ইনিই প্রেসের আসল মালিক। যার নামে প্রেসের সাইনবোর্ড।

এটা গ্রাম্যতাদোষও হতে পারে, লীলা রমার সঙ্গে কোন আলাপ না রেই উঠে পড়েছিল। যা ভালো বোঝে সুখেন করবে—তার অমত নেই। া অবশ্য একটু অপমানিত বোধ করছিল ! লীলা প্রেসের মালিক—র অধীনেই চাকরী করবে—সুতরাং এ ব্যবহার খুবই স্বাভাবিক ওপক্ষে ; কন্তু লীলার চলে যাবার মধ্যে অন্য কী একটা ছিল ! রমা মেয়ে, তার চোখে এটা লুকানো যায় নি।

পরে সুখেন রমার কাজ প্রেসের উন্নতিতে কতটা সহায়ক, ব্যাখ্যা করেছিল লীলার কাছে। লীলা বলেছিল সে তো ভালই। কিন্তু তুমি সাবধান !

সুখেন হেসে বাঁচে না। লীলা, আজকাল সব জায়গায় মেয়েরা ছেলেদের পাশাপাশি কাজ করছে। সে যুগ আর নেই। মেয়ে পাশে

থাকলেই যে সর্বনাশ ঘটে যায়, এ ধারণা ভুল প্রমাণ হয়েছে। আস্তে আস্তে সব দেখবে। এ তো শহর, গ্রামাঞ্চলেও এটা ঘটছে।

লীলা কী বুঝল, সেই জানে। কিন্তু একটা ভালো ফল হল সুখেনের পক্ষে। লীলা বিয়ের দিন ঠিক করতে বলেছে। এ মাসেই। যে কোন শুভদিন।

ওদিকে জগদীশ লোক পাঠাচ্ছে প্রতিদিন। সুখেন বস্থুর কাছে যায়। বস্থু বলে, খবরদার। সুখেন দেখেছিল, বস্থুর কাছে সেরাত্রে যাওয়া কী মারাত্মক ভুলই না হয়েছে! নিজের প্যাঁচে নিজেই আটকে গেছে সুখেন। টাকা অবিশ্যি গোপনে দেওয়া যায় জগদীশকে। বস্থুর কানে তা সে তুলবে না নিশ্চয়। কিন্তু যদি কোনক্রমে কথাটা বস্থু জানতে পারে, সুখেনের বিপদ অনিবার্য।

শেষে মরীয়া হল সুখেন। সামনে বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেছে। সব দিক থেকে নিরাপদ থাকা তার বড্ড দরকার এখন। অথচ মাথার উপর দু দুটো খাঁড়া ঝুলছে। বেশি টাকার লোভে মালটা আটকে রেখেছিল। ঝাড়তে পারলে জগদীশের টাকা অনেক আগেই শোধ হয়ে যেত। জগদীশ চটবার সুযোগই পেত না।...সে না হয় দুদিন আগে আর পরে, লীলার টাকাটাও যদি দেওয়া যেত। দেবার ব্যাপারে বস্থা-টস্থা একশো হাঙ্গামায় জড়াতে গেল কী আক্কেলে! ব্ল্যাকমেল—হ্যাঁ জগদীশের পাল্লায় যারা কোনক্রমে পড়েছে, তারাই জানে হাড়ে-হাড়ে সেটা। এমনকি ফেল্টুদা আর গার্লস্কুলের এক দিদিমণির এক 'লদকালদকি' কেন্দ্র করে শুয়ারটা ফেল্টুবাবুকেও শুষতে কসুর করে না। সুতরাং বস্থাকে তার দরকার ছিল। অথচ এদিকে আরেক বিপদ—মাল ঝাড়বার সুবিধে হচ্ছে না। পার্টি আসছে—কিন্তু বস্থার বাড়ি থেকে মাল নিতে কেউ রাজী হচ্ছে না। পাশেই কলকাতা শিলিগুড়ি হাইওয়ে—একফার্লিং দূরে পুলিশ ফাঁড়ি—বস্থা যত আশ্বাসই দিক পার্টি ভরসা পায় না। যদি বা পায়, লরীওয়ালারা রাজী হয় না। এবং এভাবে ক্রমে ক্রমে মালের কথা অনেকগুলো কানে চলে গেছে। অতি শীগ্‌গীর একটা কিছু করা দরকার। যেকোন মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

শেষে ঝুঁকি নিতে চাইল সুখেন। বন্ধু চটুক, লালুর আশ্রয় নেবে। তাছাড়া জগদীশ ব্ল্যাকমেল করে সুবিধে করতে পারবে না। বড় জোর পুলিশকে জানিয়ে দেবে, সুখেনের নামটা পুলিশের লিস্টে উঠবে। এলাকায় ওয়াগন ব্রেকিং সমস্যা নিয়ে ওরা মাথা ঘামাচ্ছে। তার ওপর আছে সীমান্ত এলাকা দিয়ে মাল চালাচালির ব্যাপার। সীমান্তও বেশি দূর নয়। পুলিশ এ নিয়ে বিব্রত। এর সঙ্গে নাকি আরও এক ফ্যাকড়া জুটেছে। একটা আন্তর্জাতিক চোরাকারবারিদের দল—সারা ভারতবর্ষে যাদের কাজকর্মের ঘাঁটি ছড়িয়ে রয়েছে—অতি সম্প্রতি তারা এ মফঃস্বল শহরেও যোগাযোগ রেখেছে বলে খবর পেয়েছে পুলিশ। এমনকি গ্রাম অঞ্চলেও তাদের এজেন্ট রয়েছে। বিদেশে যারা তীর্থ যাত্রায় যায়, কিম্বা যে সব লোক জাহাজে চাকরী করে, তাদের মাধ্যমে এই সব এজেন্টরা কাজকারবার চালাচ্ছে।···হ্যাঁ, জগদীশ বড় জোর পুলিশের খাতায় ওর নামটা তুলে দেবার ভয় দেখাবে, সুখেন ভয় পাবে না, তখন সত্যিসত্যি হারামজাদা সুখেনকে তালিকাভুক্ত করে দেবে। তারপর পুলিশ ওর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কিছু জ্বালাতনও করবে না, এমন নয়। কিন্তু সুখেন যদি আর ওপথে পা না বাড়ায়! সুখেন ভাবল এ দায়টা উদ্ধার হলে আর নয় বাবা! এ লাইনে সে বড্ড আনাড়ী, তা বোঝাই গেল এ ঘটনায়।

টেরিলিন সার্ট-প্যান্ট এবং টাই পরে বেশ ডাঁটের সঙ্গেই সুখেন জগদীশের দোকানে গেল। আশেপাশে বন্ধুর লোক আছে কি না গ্রাহ্য করল না সে। সন্ধ্যার দিকে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। প্যারেড-গ্রাউণ্ডের বিরাট ময়দানে জল চকচক করছে। রাস্তার পাশে প্রকাণ্ড সব শিরীষগাছ থেকে তখনও টিপ্‌টিপ্‌ করে জল ঝরছে। পীচের পথে স্টেশনের দিকে রিকশো যাতায়াতের বিরাম নেই। কিন্তু পথচারী কদাচিৎ চোখে পড়ে। রেণকোটে নিজেকে ঢেকে সুখেন হনহন করে এগিয়ে গেল। তারপর বাঁপাশে নামল।

জগদীশের দোকানে আলো জ্বলছে। কাছে গিয়ে দেখল আড্ডার সকলেই হাজির যথারীতি। শুধু অহীন নেই। সুখেনকে দেখে প্রথমে ফেলটুদা হাত বাড়ালেন। আয় বে শালা, তোর কথাই হচ্ছিল। ও

জগা, তোর কুটুম্ব এসেছে রে, শীগ্‌গীর বেরো।

লালু কোণের দিকে বসেছে। টেবিলে পা তুলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে আছে সে। চোখ খুলে একবার সুখেনকে দেখেই ফের বুজল।

প্রদ্যোৎ বলল, ভগবান যে চোপাহান মাইনষেরে দেছে, তা কি খালি মাগির লগে লদকালদকি করবার তরে—জিগান তো ফেলটুদা পাঁঠাটারে।

সুখেন হাসল। টুপি আর রেণকোটটা ভাঁজ করছিল সে।

তপুদা ওরফে তপন ভদ্র বলল, আজ সুখেন আমাদের মাল খাওয়াবে, বুঝে কথা বলিস পদু।

প্রদ্যোৎ চটে বলল, খবরদার পদু কইবি না! মা বাবা সাধ কইর‍্যা নামখানা রাখছেন (মা বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে) শুনছিস এমন নাম? তোগ্‌গো ঘটিগো খালি ঘেন্টু, ফেলটু চান্টু হঃ।

আরেক কোণ থেকে শচী ধমকাল, এই বাঙাল, থামবি? আমরা মাল খাব।

ফেলটুবাবু পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে নিল। বাহুতে সোনার তক্তি চক্‌চক্‌' করতে থাকল। বলল, সুখেন, শুনছিস আমার পোষ্যপুত্রদের আব্দার? ভাল চাস্‌ তো এক ফোঁটা নয়—চল্‌, রিকশো করে দুজনে সাও মশাইয়ের দোকানে যাই, তারপর সোজা আমার বাড়ি। আজ কী বার রে লালু?

লালু চোখ বুজেই বলল, শনিটনি হবে।

শিবানী বেরিয়ে এসে বলল, না, বেস্ম্যুৎবার। তারপর সুখেনকে দেখেই চমকে যাবার ভান করে বলল, এই মা গো! আমি ভেবেছি বুঝি না জানি কে! অপূর্ব লাগছে কিন্তু। বৌদির কাছ থেকে এলেন নিশ্চয়!

ওরা হেসে উঠল।

সুখেন পর্দা তুলে ভিতরে গেল।

ফেলটুবাবু বললেন, শিবি, ভেতরে গিয়ে দেখ। নচ্ছারটা হয়ত পটাচ্ছে ওকে। খবরদার, তোরা আর এক পয়সাও ধার দিবিনে সুখেনকে। ও শালা নির্ঘাৎ দেউলে হয়ে গেছে।

তপু একটু ঝুঁকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, শিবি, সুখেন টাকা দিয়েছে?

শিবানী ঘাড় নাড়ল।

প্রদ্যোৎ বলল, দিতেই ঢুকছে ঘরে। না দিয়া বাঁচবে নাকি?

লালু একটু হেসে বলল, জানিস, বন্ধু বারণ করেছিল টাকা দিতে?

তপন বলল, তাই নাকি? তুই শুনলি কোত্থেকে? সুখেন বলেছে তোকে?

লালু বলল, না। আমি শুনেছি।

ফেল্টুবাবু বলল, বন্ধু? ও কেমন করে জানল রে? ওকে সুখেন বলেছিল নাকি?

লালু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, হ্যাঁ। কাজটা অন্য কেউ করলে ওইখানে ওর মুণ্ডুটা সাইনবোর্ড করে রাখতাম।

সুখেন বেরিয়ে এল হাসিমুখে। বলল, কই কে যাবে দোকানে? তারপর পকেট থেকে একদলা নোট বের করল সে।

ফেল্টুবাবু টাকাগুলো ছিনিয়ে নিয়ে বলল, শচী তুই যা। বৃষ্টিবাদলার দিন। দুটো বড় খোকা আনিস। বাকি টাকায় কী হবে রে? ছোট খোকা?

রেঁস্তোরা কিম্বা হোটেল থেকে মাংস আসুক। ওরা জানাল।

শচী চলে গেলে ফেলটুবাবু বলল, এই যাঃ। সোডা বলা হয় নি। সুখেন, একটা টাকা দে।

টাকা নিয়ে প্রদ্যোৎকেই যেতে হল। হঠাৎ লালু উঠে বলল, আমার বরাতে নেই। কাজ আছে।

সে কী রে! ফেলটুবাবু ওর হাত ধরে টানল। লালু ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। এক পাশে ওর স্কুটারটা ঠেস দেওয়া ছিল। সেটা দাঁড় করিয়ে সুখেনের দিকে তাকিয়ে 'পরে দেখা হবে' বলে সে স্টার্ট দিল। তারপর আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল।

লালু না থাকলে এরা বেশ স্বস্তি বোধ করে। প্রদ্যোৎ বলল, হঃ! আইজ সাংঘাতিক রকম একটা হবে দাদারা। কাইল শুনবাইনি। জোর বাধাইবে শালা। আওয়াজ শুইনাই বোঝা গেছে।

সুখেন মনে মনে নাক কান মলছিল। আর নয়! জগদীশ শান্তভাবে টাকা নিয়েছে। রাগ করে নি একটুও। বলেছে, তুমি আমার ছেলের মত সুখেনবাবু। আর যার সঙ্গে করি, তোমার সঙ্গে কি বদমাইসি করতে পারি? বন্ধুর কাছে যাবার কোন দরকার ছিল না।

দুষ্টু লোকের মিষ্ট কথা। সে যাই হোক, এখন বন্ধুর বাড়ি থেকে মালটা সরাতে হবে। এ ব্যাপারে লালুর সাহায্য চাইত। হঠাৎ লালু চলে গেল। আজ রাত্রেই ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু রাত গভীর হলে জোর বৃষ্টি নেমেছিল আবার। আর, তখন প্রত্যেকেই চোখের সামনে হলুদ কুকুর দেখছে—ফেলটুবাবু যা দেখতে পান, সুখেন বেঞ্চে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে—দরজায় প্রথমত ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে জগদীশ। শেষ অবধি চারটে বড়খোকা (বিলিতী), একটা চোলাই আমদানী করতে হয়েছিল। সুতরাং সবাই একেবারে আকণ্ঠ।

আজ আর ইচ্ছে থাকলেও খেলা মুশকিল। জগদীশই মূল খেড়ি। সে ভিতরে গিয়ে আর বেরোতে পারে নি। শিবানীর এই শেষ পর্যায়টা সামলানোর দায় রয়েছে।

সে একে একে সকলকে বের করে দিয়েছিল—প্রায় ধাক্কা দিয়ে গালমন্দ করে তাড়ানো, যেমন সে বরাবর করে থাকে। কেবল সুখেন থেকে গেল। তার কোন সাড়া ছিল না।

চলে যাবার পর বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ শিবানীর নামে খিস্তি করছিল। শিবানী এতে অভ্যস্ত। তারপর তাদের সাড়া পাওয়া যায় নি।

শিবানী পর্দা সরিয়ে ভিতরে যাচ্ছিল, হঠাৎ কাপড়ে টান পড়ায় সে ফিরে দাঁড়াল। দেখল, সুখেন হাসছে। ওর কাপড় ধরে আছে সে।

ছাড়। শিবানী চাপা গলায় বলল। বাড়ি যাবে না?

সুখেন নিঃশব্দে হাসছিল। বলল, কী ভেবেছিলে? খুব মাতাল হয়ে গেছি—কোন সাড়া নেই···

শিবানী ঠোঁটে আঙুল রেখে ভিতরের দিকে কটাক্ষ হানল।

সুখেন ফিস্‌ফিস্ করে বলল, ও কাঠকপাট হয়ে গেছে। তারপর ওকে

টেনে পাশে বসতে বাধ্য করল সে। শিবানী বসল।

তার কোমর জড়িয়ে সুখেন বলল, অনেক দিন তোমাকে কাছে পাইনি। কী ভেবেছিলে বল তো?

শিবানী মুখ নামিয়ে বলল, আর কী ভাবব! যা পাবার পেয়ে গেছেন, আমার সঙ্গে কী!

চুপ! বাজে বলো না। সুখেন ওকে জড়িয়ে ধরল। আমি এখনও তোমাকে তেমনি ভালবাসি।

থামুন, খুব হয়েছে।

জগদীশ মাতাল হয়ে পড়ে থাকলে সুখেনের কণ্ঠস্বর—তার শরীর, জগদীশের মেয়েকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় স্বর্গের দিকে। শিবানী এর বেশি কিছু আশা করে না। তার চোখে পৃথিবীটা খুব ছোট। তাই মাঝে মাঝে পৃথিবীর বাইরে স্বর্গের দিকে যেতে ভালবাসে। পৃথিবী ওর চোখে স্বর্গ নয়। হবে না কোনদিনও। তাই।

তেরো

সুখেন ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ তার মুখটা সাদা দেখাল কয়েক মুহূর্ত। পরক্ষণে একটু হেসে নিজেকে সামলে নিল সে। বলল, খুব ব্যস্ত নাকি? পরে আসব বরং।

লীলা বলল, এদের সঙ্গে গল্প করছি। জরুরী কাজ নেই তো তেমন? বাইরের ঘরে গিয়ে বস। যাচ্ছি।

নাঃ। সুখেন বারান্দায় গেল।

লীলা পিছনে এসে বলল, বরং বাসিনীর কাছে গিয়ে গল্প কর কিছুক্ষণ। পাশের বাড়ির মেয়েরা আলাপ করতে এসেছে। ওদের ফেলে আসা যায় নাকি?

বাসিনী ডাকল, অ-জামাইদাদা···পরক্ষণে জিভ কেটে বলল, আগে হতেই জামাইদাদা বলছি, রাগ করছেন না তো গো?

ঘণ্টা উঠোনের পাশে ফুলগাছের গোড়া সাফ করছিল। একগাল হেসে বলল, বুড়ির কাছে যাবেন না, পানের পিকে রাঙা করে ফেলবে।

বরঞ্চ আমার কাছে বসুন। একটা চেয়ার আনছি।

বাসিনী মুখঝামটা দিল, মরণ! ছোঁড়ার বুড়ি ছাড়া কথাটি নেই। ক্যানে রে ড্যাকরা, তোর মামাসি কি যোয়ান হয়ে আছে নাকি? তুইও কি বুড়ো হবিনে রে শেয়ালখেকো?

অন্য সময় হলে এগুলো সুখেনের পক্ষে উপভোগ্য ছিল। কিন্তু এখন সে যেন তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে বেঁচে যায়। কারুর কথার জবাব না দিয়ে সে সদর ঘরে গিয়ে বসল। টেবিলে পত্রিকার পাতা ওলটাল। ছবি দেখতে চেষ্টা করল। তারপর উঠল।

মুখ বাড়িয়ে ঘন্টাকে বলল, ওকে বলো, আমি ওবেলা আসছি।

চলে গেল সুখেন।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লীলা ওকে সাইকেলে যেতে দেখছিল। ব্রততী বলল, এই, বিয়ের আগে অত করে দেখতে নেই বরকে।

লীলা লজ্জিত হেসে মুখ ফেরাল।

ব্রততীর চোখ সবদিকেই থাকে। সে এবার কনককে চিমটি কেটে বলল, এই! কনকদি, তোমার আবার কী হল? উনি না হয় বরকে দেখছেন। তুমি কাকে দেখছ?

কনক এক সময় এখানকার মেয়েই ছিল। ব্রততীর পাশের বাড়ি এক বুড়ো ভদ্রলোক থাকেন। তাঁর বউমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। কলকাতায় থাকে এখন। ব্রততীর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে ওর। যে কদিন এসেছে, ব্রততী তার গাইড।

ব্রততীর কথা শুনে কনক হাসবার চেষ্টা করল মাত্র। তার মুখটা হঠাৎ অসম্ভব ফ্যাকাসে দেখাল। একটু পরেই সে দুহাতে মাথাটা ধরে মুখ নামিয়ে দিল হাঁটুর কাছে।

ব্রততী কাছে এসে একটু ঝুঁকে বলল, কী হল কনকদি? শরীর খারাপ করছে নাকি?

কনকের চেহারায় যা আছে, তাতে যে কোন মানুষই জানবে কোথাও ওর একটা রুগ্নতার ব্যাপার রয়েছে। বয়স খুব বেশি নয়—হয়তো পঁচিশের এদিক-ওদিক; কিন্তু অবিবাহিতা মেয়েদের সহজ লাবণ্যটুকু

চোখে পড়া কঠিন। দেহের গঠনে যার আপাতদৃষ্টে কোন ত্রুটি নেই—মুখশ্রী থাকার মত একটা ডিমালো মুখও আছে, এবং চোখের টানা ভাবটুকুও যার সরলতার প্রতীক, কোথাও যেন তার একটা আশ্চর্য অসামঞ্জস্য চোখে না পড়ে পারে না। খড়ি-খড়ি ত্বকে পোড়খাওয়া মালিন্য—যেন এক আবছায়া ওকে ঘিরে থাকে সব সময় ; সে আবছায়া ওর দারিদ্র্যের না হতেও পারে। জীবনে গভীর দুঃখবোধ অনেক মেয়েরই তো থাকে। যন্ত্রণাও সয়েছে বহু মেয়ে—দৈহিক বা মানসিক। কিন্তু কনকের মধ্যে যা আছে, তাকে বিষাদ বলা যায় হয়ত। এবং এ মেয়ে দুঃখকে ঔদাসীন্য দিয়ে প্রতিহত করতে যত পটু, তেমনি যেন সুখকেও। এটা নিস্পৃহতা বলা কঠিন। কিন্তু হঠাৎ এমনি করে বিস্ফোরণ ঘটে তাকে দেহের দিকে রুগ্ন করে ফেলে।

কিছু হয়নি আমার। কনক মুখ তুলে বলল। মাথা ঘুরছিল। মধ্যে মধ্যে ঘোরে।

লীলা জোর করে ওকে শুইয়ে দিল বিছানায়। মাথার কাছে টেবিল ফ্যানটা চালিয়ে দিল। তারপর বলল, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিন। কেমন ?

সুনন্দা নিবিষ্টমনে একটা গহনার ডিজাইনের ক্যাটালগ দেখছিল। সে একটা ডিজাইন দেখিয়ে এবার বলল, লীলাদি, বিয়ের দিন এটা দেখতে চাই আপনার কানে।

কোনটা ? ব্রততী দেখে ঠোঁট কুঞ্চিত করল।···ধুস্। একেবারে সেকেলে। কই দাও, আমি পছন্দ করি।

ক্যাটালগ নিয়ে ওরা মেতে রইল কিছুক্ষণ। কনক চুপচাপ শুয়ে রয়েছে। ধবধবে মসৃণ সিলিঙে তার দৃষ্টি—অস্বাভাবিক—হিষ্টিরিয়ার রোগীর মত।

এক সময় ব্রততী ওকে ডাকল। কই, ওঠ কনকদি। পারবে তো যেতে ?

কনক ওঠবার চেষ্টা করল। লীলা বলল, আহা, হাসপাতালে তো নেই, ঘরেই আছে। ও থাক না। পরে আমি রেখে আসব'খন।

সন্ধ্যা নামছিল।

ব্রততী বলল, ঠিক আছে কনকদি। তুমি পরে এসো বিশ্রাম করে। আমি যাই। পড়াশুনো আছে। সুনন্দা, থাকবি না যাবি?

সুনন্দা উঠে দাঁড়াল। এই যা! আমার একটা ভীষণ কাজ রয়েছে যে। একেবারে ভুলে বসে আছি।

ব্রততী কটাক্ষ করল, অশোক আসবে বুঝি?

যাঃ! সুনন্দা পায়ে স্লিপার গলিয়ে বলল, তোর মত আমি দিনরাত্তির প্রেমে হাবুডুবু খাই নে!

ব্রততী ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, দেয়ার ওয়াজ এ কিং নেমড অশোকা দ্য গ্রেট···

ওরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। বাইরে ফের ব্রততীর গলা শোনা গেল, তোমার বৌদিকে খবরটা দিয়ে যাবো কনকদি।

লীলা কনকের মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসল। দুটো বালিশ মাথায় রেখে যথার্থ রোগীর মত শুয়ে আছে কনক। লীলা বলল, কতকটা আপনার মতই একটা বিচ্ছিরি অসুখ ছিল আমার। গ্রামে ছেলেবেলা কাটিয়েছি—সে তো শুনেছেন ভাই। গ্রামের ব্যাপার বুঝতেও পারছেন। বলে লীলা একটুখানি হেসে নিল। তারপর কথাটার জের টানল।··· প্রথম প্রথম ওইরকম মাথা ঘুরত। তারপর ফিট হয়ে যেতাম। সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড—বুঝলেন? ওরা বলত, ভূতে ধরেছে। মাঠে জঙ্গলে দিনরাত্তির ঘুরে বেড়ায় সোমত্ত মেয়ে, কোন ঠাঁই-অঠাঁই মানে না—বাগে পেয়ে ধরে ফেলেছে!

লীলা আরও জোরে হেসে বলতে থাকল, অনেক মাদুলী কবচ থান-টান হল। ওঝাও এল শেষ অব্দি। ধূপের ধুয়ো জ্বালস। আসনপিঁড়ি করে বসাল। নিজে বসল সামনে। তারপর বুঝলেন ভাই··কী সব দুর্গন্ধ জিনিস নাকের কাছে ধরল···ইস!

কনক শুনছিল। ঠোঁটে একটু হাসি। বলল, তারপর?

লীলা চোখ বড় করে বলল, তারপর কী হয়েছিল, কিচ্ছু জানতে পারিনি। পরে শুনলাম, ভূতের নামও বলেছিলাম। কেন ধরেছে, তাও

মুখ দিয়ে বের করেছিল নাকি।

কনক প্রশ্ন করল, কী নাম ছিল ভূতের?

মধু পণ্ডিত।

ভূতও পণ্ডিত হয় নাকি? কনক খিলখিল করে হেসে উঠল।

না। মধু পণ্ডিত ছিলেন গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাই। তিনি মারা গিয়ে নাকি ভূত হয়েছিলেন।

তারপর কী হল?

তারপর নাকি দাঁতে একটা জলভরা পেতলের কলসী নিয়ে দৌড়ে গিয়েছিলাম—ঠিক যেখানটিতে আমাকে ধরেছিল। একটা ডোবার পাশে মস্ত তেঁতুল গাছের নীচে। খুব তেঁতুল খাওয়া অভ্যেস ছিল ছেলেবেলায়।

কনক লীলার দিকে স্থির তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। যেন লীলার জীবনটাকেই বোঝবার চেষ্টা করছিল সে। লীলা বাসিনীকে ডাকছিল চা দেবার জন্যে। হাতের ইসারায় নিষেধ করে কনক বলল, ফিটের অসুখ আমার নেই। হলে হয়ত ভালই ছিল।

কেন? ফিটের অসুখের নাম করতে নেই, ভাই। লীলা গুরুজনের মত কথাটা বলল।

কনক বলল, মন্দ কী। কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্ত থাকা যেত।

লীলা একটু সন্দিগ্ধভাবে বলল, সে কি! ফিটের অসুখ থাকলে কী হয়, আমি জানি! কিছু ভালো লাগে না—না খেতে, না পরতে। জীবনটার যেন কোন মানে থাকে না।

কনক দার্শনিকতা করে বলল, জীবনের মানে থাকে নাকি! আপনি জীবনকে হয়ত আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। কিন্তু বলুন তো ভাই, আপনি কী চান, কী পেলে সুখী হন বুঝতে পারেন?

লীলা তর্কের সুরে বলল, পারি বৈকি। বুঝতে না পারলে বেঁচে আছি কেন? একসময় বুঝতে পারতাম না বলেই মরার সাধ হত। জানেন, কতবার সাধ করে মরতে চেষ্টা করেছিলাম?

কনক কেমন হাসল—দুর্বোধ্য হাসি। তারপর বলল, তর্ক করে

বোঝাতে পারব না। আমি অবশ্যি কোনদিনই মরবার চেষ্টা করি নি। মরবার কথা মনে এলেই ভীষণ ভয় পাই। অথচ জীবনের কিছুই বুঝতে পারিনে।

লীলা স্বাভাবিক মেয়েসুলভ তর্কের উৎসাহে বলল, তাহলে এতসব মানুষ বেঁচে আছে, এদের বেলায় কী বলবেন? সব্বায় আপনার মত? তারাও তো মরতে ভীষণ ভয় পায়। তা বলে তারা জীবনের মানে কী, বোঝে না?

কনক শান্তস্বরে বলল, আমি আমার কথা বলছি।

লীলা জয়ের গৌরবে বলল, সবায় জানে তারা বেঁচে আছে কেন। বলবেন, জীবন বলতে —মেয়েদের কথাই আমরা অবশ্য জানি, ওরা চায় ঘরসংসার, চায় ছেলেপুলের মা হতে। এও তো একরকম মানে জানা। এছাড়াও মানে আছে।

কনকের চোখটা কিছু উজ্জ্বল দেখাল। সে বলল, কী সেটা বলতে পারেন ভাই?

লীলা আত্মস্থ হবার ভঙ্গীতে জবাব দিল, কিছুটা পারি বৈকি।

কনক একটু হেসে বলল, পুরুষ-মানুষকে ভালবাসা? তাই বলতে চান তো?

জবাবে লীলাও একটু হাসল মাত্র।

কনক বলল, হয়ত আপনি কাকেও ভালবাসেন। গভীরভাবেই বাসেন। তাই আপনার চোখ অন্ধ হয়ে আছে।

কেন অন্ধ থাকবে? যাকে ভালবাসি, তাকে জানি।

কতটুকু জানেন?

যতটুকু জানা দরকার।

একটু চুপ করে থেকে কনক বলল, একসময় আমিও আপনার মত একজনকে অন্ধভাবে ভালবাসতাম। তার সঙ্গে বিয়েও হয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে জানতে পারলাম, তার প্রেমপাত্রী শুধু একা আমি নই। আরও এমন আছে। ছিলও অনেক। এমনকি আর একটা বিয়েকরা বৌ পর্যন্ত ছিল। তার নাম ছিল নাকি সুধা।

লীলা আঁতকে উঠে বলল, সর্বনাশ !

সেই সুধাকে সে বিষ খাইয়ে মেরেছিল। খুব বড়লোকের মেয়ে ছিল সুধা। সম্পত্তির লোভে হয়ত এই কীর্তি করেছিল সে। শেষে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে পুলিস ওকে অ্যারেস্ট করে। মামলা হয়। শেষে খালাস পায়।

ওকে বলেননি যে একথা আপনি জানেন ?

বলিনি। বলে নিজের জীবনে অশান্তি ডেকে আনতে চাইনি। গভীর প্রেম কিনা ? কনক ব্যঙ্গ করে হাসল ফের।

তারপর ?

ব্যাপারটা জানবার পর কিন্তু ভীষণ ভয় পেলাম। আমিও বাবার একমাত্র সন্তান—খুব ভালো না হলেও আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না বাবার। এখানেই একটা ভালো ব্যবসা ছিল তাঁর। বাবা মারা গেলেন। ও সেই ব্যবসার দায়িত্ব নিল। বেশ চলছিল দিনগুলো। কিন্তু ওই যে বলেছি, ভয়—ওকে খুব ভয় করতে শিখেছিলাম সে ঘটনা শোনার পর থেকে। যখনই অসুখ হত, মনে হত, ওষুধের শিশিতে বিষ এনে দিচ্ছে। অস্বস্তিতে ঘুমোতে পারতাম না। সে কী ভীষণ যন্ত্রণা, বুঝতে পারবেন না ভাই। দিনের পর দিন মৃত্যুভয় নিয়ে বেঁচে থাকা ! রাতদুপুরে ও ঘরে ফিরে আমার পাশে এসে বসেছে, গায়ে হাত রেখেছে —অমনি চমকে উঠেছি, গলা টিপে ধরবে না তো ? ওষুধের শিশি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। ওকে অন্য ঘরে শুতে বলেছি। তারপর একদিন···

লীলা কাঠ হয়ে শুনছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। ডাকল, বাসিনী, শোন !

কনক উঠে বসল। বলল, থাক্ ওকথা। এবার আমি যাই ভাই, অনেকক্ষণ আজে-বাজে কী সব বললাম। রাগ করেন নি তো ?

লীলার মুখটা থমথম করছিল। সে শুকনো হাসল। বলল, না। রাগ করব কেন ? সব জেনে রাখা ভালো জীবনে।

বাসিনী এসেছে। কনক বলল, ওকে বলুন না, একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে। ওখানে একটা দোকানে কতকগুলো ইতরের আড্ডা আছে।

লীলা বলল, না, আমিই যাচ্ছি। বাসিনী, দরজায় শেকল তুলে এখানেই বস তুমি। সুখেনবাবু যদি আসে, বাইরের ঘরে বসতে বলবে। আমি এখুনি আসছি।

পথে নেমে কনক বলল, আপনার বিয়ে কবে?

লীলা বলল, দিনসাতেক দেরী আছে। থাকবেন তো এ কটা দিন? থাকলে ভীষণ খুশি হব।

কনক ওর হাতটা হাতে নিয়ে বলল, থাকতে পারলে খুশি হতাম। আপনাকে আমার কী ভীষণ ভালো লেগেছে বলার নয়। তা না হলে, ওইসব ছাইপাঁশ শোনাতাম ভেবেছেন? তবে একটা কথা—আপনার মনের জোর আছে খুব—আমার চেয়ে অনেক বেশি। আপনি সুখী হবেন।

লীলা অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল। মোড়ে এসে বলল, আপনার স্বামী এখন কোথায়?

বহরমপুরেই আছে। যাবে কোথায়?

বারে! এখানেই আছেন ভদ্রলোক? লীলা একটু উৎসাহিত হল হঠাৎ। জানেন, বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে লোকটাকে। মুখোমুখি পেলে ওঁকে যা বলতাম! এমন ভালো মেয়েকে পেয়েও যে ভালো হতে শেখেনি, সে কি মানুষ! তবে দিদি, সবসময় গোবেচারা ভীতু সাজলেও চলে না। মেয়েদের আর কিছু নেই, হাতে নখ, মুখে দাঁত তো রয়েছে!

কনক হেসে উঠল সশব্দে। যা বলেছেন! আপনি হলে দাঁত নখ দিয়ে আক্রমণ করতেন বুঝি?

. করতাম। আমি রূপপুরের বুনো মেয়ে। ননীর পুতুল হয়ে মানুষ হইনি।

সে যখন ছিলেন, তখন ছিলেন। এখন তো শহরের মেয়ে!

মোটেও না।

বেশ দেখা যাবে, কী করতে পারেন।

লীলা একটু চমকে উঠল। কেন? দরকার হবে না দাঁত নখের—

বলতে বলতে সে হেসেও ফেলল শেষে।

কনক কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটল। একটু ইতস্তত: করছিল যেন—কয়েক বার মুখ তুলে কী বলতে গিয়ে বলল না। অবশেষে বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ লীলার সামনে দাঁড়াল। লীলা বলল, আসি।

কনকের ঠোঁট কাঁপছিল হঠাৎ। একটা কথা বলব, রাগ করবেন?

রাগ কেন করব? বলুন না?

আপনি নিজের জীবনটা নষ্ট করবেন না, ভাই।

কেন ও কথা বলছেন কনকদি?

বলছি। কনক অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলল। কারণ জেনেশুনে আরেকটি মেয়েকে সর্বনাশের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখলে দুঃখ পাই। আমার সেই স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করলেন না তো?

করি নি। স্বামীর নাম বলতে নেই—বলবেন না তো!

যখন স্বামী ছিল, তখন ছিল। এখন আর কী! তাছাড়া, আজকাল স্বামীর নাম অনেকেই বলে। ওটা একটা সংস্কার।

বাধ্য হয়েই লীলা প্রশ্ন করল, কী নাম ছিল ওঁর?

কনক বলল, নামটা সুখেন রায় হলে যেন অবাক হবেন না ভাই তারপর মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে থাকল। লীলা দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিল মাত্র।

চৌদ্দ

শত্তুর, শত্তুর সব! বাড়াভাতে ছাই দিয়ে বেড়ানো ওদের অভ্যেস। ওরা কারুর ভালো দেখতে পারে না। নিজের জীবনে বুদ্ধির দোষে কষ্ট পেয়েছে—সে কষ্ট অন্যের জীবনে ওরা দেখতে চায়। এত হিংসুটে আর স্বার্থপর এই মেয়েগুলো। তখন ওকে পাত্তা দেওয়াই ভুল হয়েছে আমার। কেন যে ছাই এদের সঙ্গে মিশতে গিয়েছিলাম! আয়নার সামনে বসে নিজের প্রতিমূর্তিকে বলছিল লীলা। সে সাজগোজ করছিল। এত মারাত্মক সাজবে যে কনকদের মুণ্ডু ঘুরে যাবে। এমন কি ওর সামনেই

সুখেনের হাত ধরে বেড়াতে বেরোবে। ডাঁইকরা খোঁপায় ফুলের মালা জড়িয়ে, ছু হাত খোঁপার কাছে রেখে, বারবার ঘুরেফিরে নিজের বুক আর কোমরের কাছটা দেখছিল সে। ইস্, এমন সুন্দর স্বাস্থ্য থাকলে ওরা কী করত, লীলা ভেবে পায় না।

রাত্রে সুখেন আর আসে নি। পরদিনও বিকেল পর্যন্ত তার পাত্তা নেই। তখন প্রেসে ঘণ্টাকে পাঠিয়ে লীলা সাজতে বসেছিল। ইচ্ছে ছিল, ব্রততীদের সঙ্গে কনক আসে ভালো; তা না হলে কনকদের ওখান হয়েই সে সুখেনকে নিয়ে যাবে। কনককে একবার ডাকবে। সুখেন কি করে তখন, দেখা যাবে। এবং লীলা সেই সম্ভবপর সাক্ষাৎ কল্পনা করে খুব হাসছিল।

কিন্তু ঠিক এই সুখেন তো? যদি তা না হয়।

সুখেন এলেই সোজাসুজি প্রশ্ন করবে বরং। কনককে তুমি চেনো?

কোন কনক?

বারে, কাল বিকেলে ওই কোণে যে মেয়েটি বসেছিল, ময়লা রঙ রোগামত মেয়ে?

কই, না তো! (এ ছাড়া কী বলবে সুখেন—দোষী হলেও এ জবাব তাকে দিতেই হবে।)

চালাকি করো না। এবং কনকের কাছে শোনা সুখেনের পূর্ব ইতিহাস শুনিয়ে দেবে লীলা।

সে আমি নই। অন্য কেউ হবে। সুখেন দৃঢ়কণ্ঠে বলবে।

তখন লীলা অক্লেশে বলবে, হলেও ক্ষতি নেই। আমি ভয় করিনে তোমাকে। ভারি তো একরত্তি মানুষ! সুখেন হাসবে। ওর সেই আশ্চর্য সরল হাসি—শিশুর হাসির মত।

লীলা তুলে রাখা অলঙ্কারগুলো দেখছিল। সিঁথি শূন্য থাকতে মানায় না। আর কয়েকটা দিন মাত্র, তারপর যেন সারা শহরে আগুন ধরিয়ে দেবে, এমন প্রচণ্ড ধারণা নিয়ে সে দেহের যেখানে যেটি পরতে হয় অলঙ্কারগুলো ধরে রাখছিল। দেখছিল। রেখে দিচ্ছিল।

তারপর হয়ত জেদে, হয়ত অন্যমনস্কতায়, কখন সিঁদুর কৌটো খুলে,

চিরুণীর ডগায় পুরনো অভ্যাসমত সিঁদুর নিয়ে সিঁথির কাছে চলে গেছে তার অসাবধানী হাত।

সেইসময় স্বয়ং শত্তুর এসে হাজির।

অন্য কেউ হলে অপ্রস্তুত হেসে হাত নামিয়ে নিত লীলা। সব লুকিয়ে ফেলত ক্ষিপ্রহাতে। বলত, এস ভাই, বস। কিন্তু কনক!

কনককে নির্লজ্জ লাগছিল লীলার। তার উপস্থিতি—তার অস্তিত্ব—যেন একটা ভিখারিণীর মত; চোখের দৃষ্টিতে বড় লোভ যেন। ড্রেসিং টেবিলে স্তূপাকৃতি অলঙ্কার, প্রসাধনের কৌটো, সোফার উপর উজ্জ্বল রঙিন কয়েকটা শাড়ি আর ব্লাউস, আর টেবিলের প্রান্তে আজই রেখেছে সুখেনের ফোটোটা—ঘরের দেয়াল থেকে যেটা কেড়ে নিয়ে এসেছিল সে। সবকিছুর ওপর যেন কনকের লোভার্ত দৃষ্টি পোকার মত কিলবিল করছে। তুমি বলেছ, জীবনের মানে নেই। বলেছ, ঘর-সংসার চাও না, চাও না ছেলেপুলের মা হতে, চাও না পুরুষকে অন্ধভাবে ভালবাসতে। অথচ আমাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছ। ও তোমার মনের কথা নয়। মুখের কথা।···

কনক বলল, যাবার আগে দেখা করতে এলাম।

লীলা জিনিসপত্র গোছানোর ভান করছিল। জবাব দিল, আজই?

হ্যাঁ। আর···কনক একটু চুপ করে থেকে বলল, আর, কাল ঝোঁকের মাথায় কীসব বলেছি, হয়ত মনে কষ্ট পেয়েছেন। সেজন্যে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

লীলা বিজয়িনীর মত হাসল।···ক্ষমা কিসের? আমি কিছুই মনে করিনি আপনার কথায়।

কনক বলল, সে তো বুঝতেই পারছি। আপনার মনের জোর আছে ভাই।

লীলা জবাব দিল না। জানালার দিকে তাকাল। ঘণ্টা এখনও আসছে না কেন? সুখেনই বা কোথায়? সুযোগ হাতের নাগালে এসে গেছে। এখন সুখেন এসে পড়লেই কনককে যা জব্দ করা যেত। কনককে অপমান করার জন্যে তার মন ছটফট করছিল।

লীলা বলল, ঠিক সময়েই এসেছিলেন কনকদি। কদিন থেকে গেলে

ভালো করতেন। দেখতেন, আপনাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছিল কে, সেই ভয়ঙ্কর লোকটা এখন আমার ভয়ে অস্থির। আমিই না কোনদিন বিষ খাইয়ে মেরে ফেলি ওকে!

কনক তীব্রদৃষ্টে তাকাল ওর মুখের দিকে। আমাকে ঠাট্টা করছেন আপনি! ভাবছেন, সব বানিয়ে বলেছি!

লীলা হাসল। ওতে কিছু আসে যায় না আমার—সত্য হোক বা মিথ্যে হোক। আর কনকদি, শোধ নিতে দিন না আপনার হয়ে। ওকে শিক্ষা আপনি দিতে পারেন নি, আমাকে দিতে দিন।

নিষেধ করছিনে ভাই। কনক মুখ নামাল।

দাঁড়িয়ে কেন? বসুন। লীলা সোফার উপর থেকে কাপড়জামাগুলো সরিয়ে ওর বসবার জায়গা করে দিল।

না, চলি। কনক বসল না।

আজই যাবেন? আপনার ঠিকানাটা রেখে যান। লীলা কলম আর প্যাডটা এগিয়ে দিল।

সে বৌদির কাছে পাবেন, ব্রততীরাও জানে।

বুঝেছি, আমাকে ঠিকানা দিলে কিছু ক্ষতি হবে।

হতে পারে। তবে সে আমার নয়, আপনার।

আপনাদের সুখের সংসারে আমার স্মৃতি না থাকাই ভালো, ভাই লীলা।

এবার আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন কিন্তু।

ঠাট্টা ভাবলে আপনিও ক্ষমা করবেন।

ঘন্টা এল হন্তদন্ত হয়ে। জানাল, দাদাবাবু পেরেসে নাই। কাল থেকে যান নি ওখানে। কোথায় গেছেন, কেউ বলতে পারল না। লীলা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একথা শুনে।

কনক এবার জোরে হেসে উঠল। দেখলেন? আমি এখানে এসেছি আবার, কাল স্বচক্ষে দেখে গেছে! তাছাড়া একটা সুন্দর দাঁও পাবার মুখে এ অঘটন। ওর দেখা আর জীবনে পাবেন কিনা সন্দেহ। আচ্ছা চলি।

লীলা হঠাৎ জ্বলে উঠল। তীব্রস্বরে বলল, ওকে অপমান করার অধিকার আর আপনার নেই কনকদি।

পর্দা তুলে এক পা বাইরে এক পা ঘরে, কনক মুখ ফিরিয়ে বলল, অধিকার আছে। বলব না ভেবেছিলাম, কিন্তু বলে যাওয়াই ভাল। সুখেন এখনও আইনত আমার স্বামী।

লীলার সামনে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে গেছে যেন। গায়ে আঘাত লাগলে যেমন হিংস্র জানোয়ার মুহূর্তে দাঁত নখ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে কনককে টুকরো-টুকরো করার ইচ্ছায় সে পা বাড়াতে যাচ্ছিল। পর্দা তুলছিল। পরক্ষণেই তেমনি হঠাৎ তার সারা শরীর অবশ হয়ে এল।

ওখানে ঘণ্টা বাসিনীকে হাত মুখ নেড়ে ফিসফিস করে বোঝাচ্ছে, দিদিমণির সঙ্গে ওই মেয়েটার জোর ঝগড়া লেগেছে। বাসিনীর হাঁ করা লাল মুখ থেকে লাল লালা গড়িয়ে পড়ছে দেখে ঘণ্টা 'ছ্যাস্তেরি পানখাকি' বলে নিবৃত্ত হল। আর বাসিনীও অভ্যাসমত পাল্টা গাল দিল, থাম্ শেয়ালখেকো!

পনেরো

বৃষ্টি না এলে আর বসে থাকত না রমা। কিন্তু বৃষ্টি থামল একেবারে সাতটার কাছাকাছি। আজও সুখেনের পাত্তা নেই। একটা জরুরী অর্ডার নিয়ে এসেছে সে। পঞ্চায়েতের ব্যাপারে একগাদা ফরম আর খাতাপত্র খুব তাড়াতাড়ি ডেলিভারী দিতে হবে। অথচ সেই পাঁচটা থেকে বসে থেকেও সুখেন এল না। খগেন বলে গেছে, প্রেসে ঢুকেছেন যখন, প্রুফ দেখাটাও শিখে নিন দিদিমণি। ওই অভিধান বইতে আছে। আর বাবুর টেবিলেও দেখুন, কিছু দেখা প্রুফ রয়েছে। খুব সহজ। রমা বসে থেকে ততক্ষণ প্রুফ দেখা শিখছিল।

দেয়াল ঘড়িতে সাতটা বাজলে সে হাই তুলে তাকাল। ওদিকে বৃষ্টিও থেমেছে। সে উঠতে যাচ্ছিল। খগেন ফের এসে বলল, এই মেসিন

প্রুফটায় চোখ বুলিয়ে দিন তো দিদি। ভুলটুল আছে নাকি···

রমা হাতে নিয়ে দেখল, বিয়ের পদ্য। পাত্রের নাম সুখেন্দ্রচন্দ্র রায়, পাত্রী লীলারাণী ঘোষ···সারবন্ধ প্রজাপতি, দুজন অপ্সরা মালা হাতে, বন্ধুদের সম্ভাষণ···আরে! নামগুলো সব চেনা যে! কপি দেখে রমা জানল, রচনা অহীনের। তারই হাতের লেখা। রমা ফিক করে হেসে বলল, সুখেনদার বিয়ে?

খগেন উঁকি মেরে দেখছিল। সেও এক গাল হেসে বলল, সে জন্যেই তো আপনাকে দেখতে দিলাম।

কানাই পিছন থেকে হঠাৎ ছোঁ মেরে টেবিল থেকে কাগজগুলো তুলে নিয়ে গেল। রমা অবাক। কানাই যেতে যেতে দাঁত কিড়মিড় করে খগেনকে বলছে, বাবু ওটা ছাপতে নিষেধ করেছিলেন না! যত বয়স হচ্ছে, ছেলেমানুষী বাড়ছে না কী?

রমা অপমানিত বোধ করছিল। চাইলেও পারত—অমন করে ছোঁ মেরে নিল লোকটা!

ওদিকে মেসিনের শব্দ শুরু হলে খগেন উঁকি মেবে চাপাস্বরে বলল, বাবু তখন তো বেশ সবাইকে শুনিয়ে ছাপতে দিলেন পদ্যটা। হঠাৎ কী হল কে জানে! কাল সন্ধ্যেবেলা নিষেধ করছিলেন মনে পড়ছে। ভুলে গিয়েছিলাম দিদিমণি, কিছু মনে করবেন না। বাবুর খেয়ালের অন্ত নেই।

পিছন ফিরে কানাইয়ের উপস্থিতিটা একবার দেখে নিয়ে সে ভিতরে চলে এল আবার। রমা বুঝতে পারছিল, সবতাতে নাকগলানো অভ্যাস আছে লোকটার।

খগেন কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, কিছু শুনেছেন? বিয়ে ভেঙে গেল নাকি!

রমা অহীনের কাছে শুনেছিল, প্রেসের মালিক এবার সুখেনবাবুর বউ হচ্ছে। মাত্র এইটুকুই। সে বলল, নাঃ, কিছু শুনিনি তো!

খগেন নিরাশ মুখে চলে গেল।

রমা উঠতে যাচ্ছিল, সেই সময় দরজার কাছে রিকশো থেকে লীলা

নেমেছে। নমস্কার করে সংকীর্ণ পথে যতদূর সম্ভব সরে দাঁড়াচ্ছিল রমা। কিন্তু লীলা এসেই তার হাত ধরল। বলল, আমি আসছি, আপনি চলে যাচ্ছেন? আসুন।

ভিতরের দিকে লোকজন মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। সামনে খগেনকে দেখেই লীলা বলল, সুখেনবাবুর খবর জানেন? কিছু বলে যায় নি কাল?

খগেন মাথা চুলকে বলল, বলেছিলেন। বিয়ের পত্তটা মেসিনে উঠেছিল। প্রুফও তোলা হয়েছিল। কিন্তু ম্যাটার নামাতে বলছিলেন। ওটা ছাপা হবে না।

বিয়ের পত্ত? লীলা ডাকল, কানাইবাবু, শুনুন।

ততক্ষণে খগনের দিকে অভ্যাস মত লক্ষ্য রেখে কানাই মেসিন থামাচ্ছিল। এবার প্রায় খরগোসের মত ছুটে এল। প্রণাম করে বলল, আসুন মা। বাবু হঠাৎ কাল বাইরে গেছেন।

লীলা ক্রুদ্ধস্বরে বলল, বাইরে! কোথায়?

কানাই হাতের তালু ঘষতে ঘষতে বলল, লালগোলার সাইডে কোথায় গেছেন যেন। ভুলে গেছি জায়গাটার নাম। বলেছেন, ফিরতে দিন দুই দেরী হতে পারে।

লীলা ধমক দিল, ঘন্টাকে বলেন নি কেন? কষ্ট করে এতদূর আসতে হল আমাকে!

কানাই যুক্ত করে বলল, আজ্ঞে মা, আপনি ছাড়া কাকেও বলতে নিষেধ ছিল।

রমা বাগে পেয়ে বলল, উনি ছাড়া কাকেও বলতে নিষেধ ছিল। এখন কিন্তু আমিও শুনলাম। বলে সে হেসেও উঠল।

লীলা বুঝতে পেরেছে, ততদিনে বোঝা উচিত ছিল তার, এই কানাই লোকটি খুব সোজা নয়। হয়তো সুখেনের অনেক গোপন খবর সে রাখে। সে বলল, ওদিকে কেন গেছে সে?

সে জানিনে মা।

তাকে প্রেস চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, মাসে মাসে এ জন্যে মোটা মাইনে দিতে হয়। লীলা বলল। অথচ যখন খুসী চলে যাবে

কাজ নষ্ট করে। ব্যাপারটা কী?

রমা লুকিয়ে হাসছিল। ওখানে খগেনের ঠোঁটেও এক ঝিলিক হাসি দেখা গেল। সে বলে উঠল, বিয়ের পত্তটার জন্যে তো খরচ হত না কিছু। নিজের প্রেস। নিজের ইয়ে ··বেশ ভালই হয়েছিল পত্তটা। না কী রমা দিদিমণি? বাবু বড্ড খামখেয়ালী লোক!

লীলা বলল, কানাইবাবু, পদ্যটা দেখি।

কানাই কুইনিনগেলা মুখ নিয়ে ভিতরে গেল। তারপর পত্তটা নিয়ে এল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে লীলা বলল, ঠিক আছে। ছাপুন। কত ছাপবেন?

খগেন বলে দিল, হাজার পাঁচেক।

কানাই ট্যারা চোখে খগেনকে দেখে নিয়ে একটু হেসে বলল, পাঁচ হাজার! টাউন শুদ্ধ লোকের হাতে দিতে হলে তাই ছাপতে হবে বইকি।

লীলা রমার দিকে তাকিয়ে বলল, কত ছাপা যায় বলুন তো?

রমা চিন্তিত হবার ভান করছিল। মনে মনে সে ভীষণ হাসছিল। বলল, কত আর ছাপবেন? নিমন্ত্রিতদের দেবেন তো! তাছাড়া আর বেশি ছেপে কী লাভ?

লীলা বলল, কিছু বেশি ছাপতে হবে। গ্রামের দিকে পাঠাতে হবে কিছু। তাছাড়া আত্মীয়স্বজনও তো আছেন নানা জায়গায়। ঠিক আছে, হাজার পাঁচেকই ছাপুন। ভাল কাগজ চাই—হলুদ রঙের। সোনালী হরফে ছাপা হবে। বুঝেছেন?

কানাই বিনীতভাবে মাথা নেড়ে কাগজটা তুলে নিল। বলল, কবে নাগাদ চাই?

কালকের মধ্যেই। লীলা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল।

তাহলে তো কাগজ আনতে হয়। বাবু নেই। টাকার কী হবে? কানাই মাথা চুলকোচ্ছিল।

লীলা বলল, কাল সকালে আমার কাছে লোক পাঠাবেন। টাকা নিয়ে আসবে। কত টাকা?

আপাতত শ'খানেক।

ঠিক আছে। পাঠাবেন। এই বলে লীলা রমাকে ডাকল, আসুন। বাড়ি যাবেন তো?

রমা বলল, হ্যাঁ। সুখেনবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। একটা আর্জেন্ট ডেলিভারীর অর্ডার নিয়েছি। কী হবে-টবে, কিচ্ছু জানি নে।

লীলা ডাকল, কানাইবাবু, আসুন। আপনি ভাই ওকে বুঝিয়ে দিন না কী করতে হবে। বলে একটু হেসে আবার বলল, প্রেস কিনেছি যখন, আমাকেও তো কিছু জানতে শিখতে হবে। না কী বলেন?

আবার কানাই এল। রমা ব্যাগ খুলে কাগজপত্র বের করে দুজনকেই বোঝাতে থাকল এবং এসব ব্যবস্থা করে লীলা যখন বেশ খুশি মনে উঠতে যাচ্ছে, তখন দেয়াল ঘড়িতে আটটা বেজে উঠেছে।

রিকশো ডাকতে লোক পাঠিয়ে লীলা রমাকে বলল, আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে যাব।

রমাও খুশি হয়েছিল। ভদ্রমহিলাকে যদিও একটু জেদী মনে হয়, হয়তো বা এটা শিক্ষাসহবতের অভাব—কিন্তু বেশ আন্তরিকতা আছে ব্যবহারে। সরল বলেও মনে হয় রমার। তাছাড়া তার আরও ভালো লাগল এই ভেবে যে, উনি নিজেই যদি সব দেখাশুনা করতে থাকেন, অন্তত সুখেনের দিক থেকে যেটুকু দ্বিধা বা আতঙ্ক মনের ভিতর উঁকি মারছিল, একেবারেই থাকবে না। মনে সাহস পাচ্ছিল রমা। সুখেন অহীনের আড্ডার লোক। অহীন গোল্লায় গেছে। সুখেন কী তাও বেশ বোঝা যায়। পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়, তা সত্ত্বেও রমার মনে হয়েছে লোকটা খুব চতুর আর ফিকিরবাজ।

রিকশো এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। ওরা উঠতে যাচ্ছিল। সেই সময় বন্ধু এল।

এত লম্বা আর এমন বলিষ্ঠ শরীর লীলা আগে কখনও দেখেনি। সে একটু অবাক হয়ে ওকে লক্ষ্য করছিল। বন্ধু চিতাবাঘের চামড়ার মত একটা শার্ট গায়ে দিয়ে কালো প্যাণ্ট পরে এসেছে। ওদের গ্রাহ্য না করে সে সোজা ভিতরে চলে গেল। লীলার একটু রাগ হচ্ছিল, কে

লোকটা, এমন করে বলাকওয়া নেই, সোজা ঘরে গিয়ে ঢুকবে। কিন্তু বুকটা কেমন ছাঁৎ করেও উঠেছিল তার। সুখেনের বন্ধু কি এরাই নাকি! কোন বন্ধুর সঙ্গে সুখেন এতদিন তার পরিচয় করিয়ে দেয়নি! তারা কেমন লীলা দেখেনি। ভেবেছিল, তারা বুঝি সবাই রাণীচকের ওই লোকটার মত ভীতু গোবেচারা—গোবেচারা আর বদমাইস—তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু বন্ধুকে দেখে যেন তার সে ভুল ভেঙেছে। রমা ডাকল, আসুন দিদি।

লীলা বলল, যাই।

রিকশোয় বসতেই বন্ধুর চড়া গলা শোনা গেল। সুখেনদা এলেই বলবে, তক্ষুণি যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। নয়ত, ভীষণ বিপদ হবে ওর। বুঝেছ? বলবে, বন্ধা এসেছিল নিজে।

লীলা চমকে উঠেছিল! পরক্ষণে স্বভাবসুলভ ক্রোধে তার ইচ্ছে করছিল, এক্ষুনি নেমে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে আসে লোকটাকে। এত সাহস যে ঘরে ঢুকে শাসিয়ে যাচ্ছে।

লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে রমা বলল, ছেড়ে দিন। ওর নাম বন্ধা বন্ধুও বলে লোকে।

লীলা ফিসফিস করল, গুণ্ডা বুঝি?

রমা হাসল। কে জানে! মারামারি করে বেড়ায় শুনেছি।

রিকশো চলছিল। পর্দাটা তোলা ছিল। ফেলে দিয়ে লীলা বলল, কোনদিকে আপনাদের বাড়ি, রিকশোওলাকে বলে দিন।

ওয়াটার ট্যাঙ্কের কাছে এসে রমা বলল, ডানদিকে চল।

দুজনে কোন কথা বলছিল না আর। রাতের শহরে চারপাশে অজস্র আলোর বাইরে আকাশ বোঝা যায় না। দুপাশে বিরাট গাছ। পথে বৃষ্টির জলে আলো ঝিকমিক করছিল ছায়ার খাঁজে। একটু ফাঁকায় এসে লীলা বলে উঠল, ওই লোকটা থাকে কোথায়?

রমা বলল, রেললাইনের ওপারে কোথায় যেন। কেন?

লীলা বলল, এমনি বলছি।

রমা বলল, বুঝেছি। ব্যাপারটা জানতে চান তো ? ঠিক আছে। আমার ভাই অহীনকে বলব। সে ওসব খবর রাখে।

যেখানে রমা রিকশো থামাল, ঘরবাড়িগুলো সেখানে ছড়ানো ছিটানো—অজস্র গাছপালা তার আনাচে-কানাচে দাঁড়িয়ে আছে। সদর রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট থেকে যা আলো ছড়াচ্ছে, তা দিয়ে এত বেশি অন্ধকার মোছা যায় না। রমা সন্তর্পণে হাঁটুর কাছে কাপড়ের গোছা ধরে রিকশো থেকে নামল। খোয়া ভরতি লালচে পথে অজস্র গর্ত—সেগুলোয় জল চকচক করছে। হাসিমুখে রমা বলল, তাহলে চলি দিদি।

কী যেন চাপা অস্বস্তি বুকে নিয়ে বসেছিল লীলা। রমা নেমে গেলে হঠাৎ সেই অস্বস্তিটা বাগে পেয়ে গেছে তাকে। খুব একা লাগছিল নিজেকে। সে বলল, কোন্ বাড়ি আপনাদের ?

এখান থেকে দেখা যাবে না। রমা অন্ধকারের দিকে আঙুল তুলে বাড়ি দেখাচ্ছিল। ওই যে ওখানে।

অন্ধকার হয়ে আছে। যেতে পারবেন একা ?

খুব পারব। রমা ফের হাসল।···মিছেমিছি দেরি করিয়ে দিলাম আপনার। চলি দিদি।

নেমে ওর সঙ্গে বাড়ি অব্দি যেতে ইচ্ছে করছিল লীলার। কিন্তু রমা তাকে ডাকল না—বরং এড়িয়ে গেল যেন। তাই সে মনে মনে একটু ক্ষুব্ধও হল। রিকশোওলাকে বলল, চলো।

রিকশোওলা প্যাডেল ঠেলতে গিয়ে টের পেল চেন পড়ে গেছে। সে নামল সঙ্গে সঙ্গে। অস্ফুটস্বরে রাস্তাকে গাল দিল। সেই সময় লীলা দেখল, রমা যেদিকে গেছে, সেদিক থেকে কে একজন আসছে। খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছে সে।

রিকশো ফের গড়াচ্ছিল, পিছনে লীলা শুনল, দিদি, এই যে, শুনুন।

লীলা মুখ ফেরাল।

ছোড়দিটার কাণ্ডজ্ঞান নেই। কিছু মনে করবেন না। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আপনি······

আমি অহীন—রমা আমার দিদি।

ও! ঠিক আছে, আমি যেতে পারব ভাই।

নিঃসঙ্কোচে অহীন প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পাশে বসে পড়ল। লীলা কিন্তু খুশিই হয়েছে—ভীষণ খুশি। একা যেতে হচ্ছিল বলে নয়, অহীনের সঙ্গে তার আলাপ করার ইচ্ছা এত সহজে মিটে যাবে, ভাবতে পারেনি। রমার প্রতি বিরক্ত হয়েছিল সে।

অহীন বলল, আমার ভদ্রতাজ্ঞান আছে ভাববেন না যেন। এটা মায়ের আদেশ।

লীলা হাসতে হাসতে বলল, আপনার মায়ের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল।

ছোড়দিটার কাণ্ডজ্ঞান নেই। অহীন ফের রমার দোষারোপ করল।··· রিকশোওলা রেগে যাবে, নয়ত আপনাকে নিয়ে যেতাম। থাক্, সে পরে একদিন হবে'খন। তাছাড়া রাত্তির হয়েছে। বিষ্টিবাদলা লেগে গেলে আরও দেরী হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অহীন ফের বলতে লাগল, ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে আলাপ করার। জোর কপাল আজ। সুখেনদার কাছে আপনার কথা কতবার শুনেছি।

লীলা বলল, তাই নাকি! সুখেনবাবুর সঙ্গে গেলেই পারতেন যে-কোনদিন।

অহীন যুক্তকরে বলল, আমাকে আপনি-টাপনি করবেন না দিদি। আমি আপনার ছোটভাই।

লীলা হেসে ফেলল ওর ভঙ্গী দেখে।···বেশ। তুমিই বলব।

বলব না—বলুন এক্ষুনি।

ছেলেটি তো বেশ। লীলা আরো খুশি হল। বলল, একটু আগেই রমা তোমার কথা বলছিল। আমারও একটু জরুরী দরকার ছিল তোমার সঙ্গে। চল, যেতে-যেতে বলছি।

অহীন একটু বিস্মিত হল।···আমার সঙ্গে? কী কথা বলুন তো!

কী বলবে এবং কিভাবে বলবে, লীলা ভেবে পাচ্ছিল না। সুখেনের

জীবনের যে আরো একটা প্রচ্ছন্ন দিক আছে, যা টের পাচ্ছিল একটু করে, স্পষ্ট বুঝতে চায় সে। লীলা জানে না, এতে তার কতখানি ক্ষতি বা লাভ হবে। সে তো বন্যায় ভেসে চলেছে! সুখেন—সুখেন তার কাছে যেন বা একটা অবলম্বন মাত্র, খুব প্রিয় অবলম্বন। তার নীচে মাটি আছে কি নেই—কী দিয়ে সে তৈরী, জেনে কী হবে!

কী হল? বলছেন না যে?

বলি। লীলা শান্ত কণ্ঠে বলল।···তুমি তো ওই গুণ্ডামত লোকটাকে চেন, বম্বা না কী নাম·····

কেন বলুন তো?

আজ প্রেসে গিয়েছিল। সুখেনবাবুর খোঁজ করছিল লোকটা। ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লাগল? একটা আজেবাজে ধরনের লোক যে ভঙ্গীতে ঢুকল আর কথা বলল, আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল।

অহীন একটুখানি গুম হয়ে থাকার পর বলল, বম্বা অবশ্যি গুণ্ডা নয়।

তাহলে ওর সঙ্গে সুখেনবাবুর কী দরকার?

অহীন জোর হাসল।···কী সর্বনাশ! গুণ্ডা ছাড়া বুঝি কারুর সুখেনদার কাছে কাজ থাকবে না?

সুখেনের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে, হঠাৎ মুখ ফসকে যাওয়া এই কথাটায় তা বুঝি প্রকট হয়ে গেছে। সত্যি কি সুখেন সম্পর্কে একথা ভাবে সে? যদি না ভাবে, কেন এ কথাটা বলে বসল অহীনের সামনে? লীলা অপ্রস্তুত কণ্ঠে জবাব দিল, তা বলছি না। লোকটাকে আমার খারাপ লেগেছে। খুব অভদ্র। শাসাচ্ছিল প্রেসে ঢুকে।

বম্বাটা এমনি। অহীন বলল।··ওর বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন নেই। তবে খুব ভালো ছেলে লীলাদি, যাকে বলে গুড বয়। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। আর সুখেনদার নানারকম কাজকারবার থাকে হয়ত—আমিও সবটা জানিনে।

লীলা কথা কাড়ল।···কী কাজ থাকে এত? প্রেসটাই তো ঠিকমত চালাতে পারে না।

অহীন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না লীলাদি,

একটা কথা বলব ?

বল। কিচ্ছু মনে করব না।

সুখেনদার সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে। পত্তটা কিন্তু আমিই লিখেছি।

লীলা ক্রমশ ক্লান্তিবোধ করছিল। শুধু ছোট্ট 'ও' বলেই সে থামল। পথ যেন শেষ হচ্ছে না। এবড়োখেবড়ো খালডোবা ভরতি পথে রিকশোটা প্রচণ্ড লাফাচ্ছে। রিকশোওলা সীট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে প্যাডেল ঠেলছে। লোকটা রীতিমত হাঁফাচ্ছিল।

পীচের পথে এসে অহীন বলল, রাগ করলেন না তো ?

রাগ করব কেন ?

ওরে বাবা। বিয়ের পত্ত খারাপ হলে মেয়েরা ভীষণ চটে যায় দেখেছি।

লীলা ওর ছেলেমানুষীতে হাসল। কিন্তু অসম্ভব একটা ক্লান্তি তাকে অবশ করে তুলেছে ততক্ষণে। কোন মন্তব্য করল না সে। অহীনের কাছে অনেক কিছু জানার ছিল। অহীনকে সে সব প্রশ্ন করতে সংকোচ যতখানি, ততখানি এই ক্লান্তি—বাড়ির কাছাকাছি এসে সে বলল, তুমি তো সুখেনবাবুর সঙ্গে আড্ডা দাও শুনেছি। ও কোথায় গেছে, জানো ?

অহীনের মুখটা গম্ভীর দেখাচ্ছিল। আলো পড়েছে রিকশার মধ্যে। নির্জন হয়ে এসেছে পথ। কালো পীচের পথ ভিজে চকচক করছে। অহীন বলল, সুখেনদার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি আজ। বোধহয় বাইরে কোথাও গেছেন। যা ব্যস্ত মানুষ !

ব্রেক কষল রিকশোওলা। লীলা অবাক হল একটু। ঠিক বাড়ির সামনেই থেমেছে রিকশো। সম্ভবত চেনে রিকশোওলাটা। পরক্ষণেই লীলা তাকে বলতে শুনল, আরে সুখেনবাবুর কথা বলছেন তো ? আজ বিকেলবেলা গঙ্গার পাড়ে দেখেছি ওনাকে।

লীলা জেরার সুরে বলল, কী করছিল গঙ্গার পাড়ে ?

আবছা আলোয় হাসছিল রিকশোওলা। বড় বড় ভাঙা দাঁত—লালচে রঙের। চওড়া কালো মাড়ি। সে বলল, বেড়াতে বেরিয়েছিলেন

হয়ত। জঙ্গলের কাছে দেখছিলাম।

রুদ্ধশ্বাসে লীলা বলল, একা?

আজ্ঞে, সঙ্গে যেন জগদীশের মেয়েকে দেখেছি···

অহীন বলল, চলুন। বিষ্টি পড়ছে, ভিজে যাবেন।

বাসিনী প্রতীক্ষা করছিল। দরজা খুলে রেখে সে দাঁড়িয়ে ছিল। লীলা ঘরে ঢুকে ব্যাগ থেকে একটা এক টাকার নোট বের করে বাসিনীকে বলল, দিয়ে এসো।

অহীন দাঁড়িয়ে ভিজছিল। বাসিনীর হাত থেকে টাকাটা নিয়ে সে রিকশোওলাকে দিল। রিকশোওলা কোঁচড় থেকে কৌটো বের করে বলল, বাবু ফিরবেন তো? আসুন, নিয়ে যাই।

অহীন বলল, নাঃ। তুমি কেটে পড়ো বাবা।

লীলা ডাকছিল। ভিজছ কেন? চলে এস।

থাক্। আমি চলি।

বিষ্টিতে ভিজে কোথায় যাবে? এস।

অহীন গেল। পরক্ষণে সে অবাক হয়ে গেল। সাজানো গোছানো সুন্দর ঘর। তার মধ্যে একটা ছবি—টেবিলে দাঁড় করানো আছে ছবিটা। ছবিতে সুখেনকে দেখছিল সে। এমন সুন্দর ঘরে তাকে অসম্ভব সুন্দর লাগছিল। ঠোঁটের কোণে নিষ্পাপ হাসি তার। অহীন আড়চোখে লীলার দিকে তাকাল। লীলাও যেন ছবিটা দেখছিল। এবার মুখ ফিরিয়ে বলল, বসো আসছি। তারপর ভিতরে চলে গেল।

ছবির আরো কাছে গিয়ে হঠাৎ অহীনের চোখ দুটো জ্বালা করছিল। স্বভাবসুলভ কৌতুকে সেই জ্বালা করা ভাবটি মিশিয়ে সে শুধু বলে উঠল, শালা খচ্চর!

পরক্ষণে পিছনে ঘণ্টা এসে ডেকেছে তাকে।···দিদিঠাকরুন ভেতরে যেতে বললেন আপনাকে।

গরিলার মত লোকটাকে দেখে অহীন চমকে উঠেই হেসে ফেলল। বলল, চল।

পরদিন সকালে জগদীশের দোকানের সামনে স্তূপীকৃত সাইকেলের

পার্টস পড়ে আছে। পুলিশ কর্ডনের বাইরে দাঁড়িয়ে লোকেরা ভিড় করছিল ভোরবেলা থেকে। ঝকঝকে নতুন সব পার্টস। চৌধুরী সাইকেল স্টোর্সের নামে কলকাতা থেকে যে এক ওয়াগন মাল বুক হয়েছিল, তা স্টেশনে পৌঁছবার পরই খোয়া যায়। এতদিন বাদে অদ্ভুতভাবে তার হদিশ মিলল।

গণেশ 'আগরওয়ালা ট্রান্সপোর্টে' ট্রাক চালায়। সে বলল, আগেও বলেছি,এখনও বলছি, আজকাল রোড ট্রান্সপোর্টের এত সুবিধে থাকতে কেন বাবা রেল-টেল একশো হ্যাঙ্গামা!

জগদীশের মুখের দুকষায় ফেনা—দাঁতে ব্রাশ ঘষছিল। জবাব দিল, ট্রাকেও কোন গ্যারান্টি নেই বাবা। চুপ করো।

গণেশ দমে গেল। তা বটে জগাদা। সিঙ্গিদের এক ট্রাক মাল দশদিন আগে স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে রওয়ানা দিয়েছে। আজও পৌঁছল না। তবে কথাটা হচ্ছে, সব্বার সমান নয়.

যেমন তুমি। কাঁধে হাত রেখেছে লালু।

গণেশ চমকে উঠে হাসল মাত্র। সে রাত্রে মালগুলো বস্গার বাড়ি সেই রেখে এসেছিল। সে গতিক দেখে আস্তে আস্তে তক্ষুনি কেটে পড়ল। লালুর চোখ আর কানের সংখ্যা কম নয়, সে জানে

জগদীশ চোখের ইসারায় ডাকছিল লালুকে।

লালু এগিয়ে দোকানে ঢুকে অভ্যাস-মত হেলান দিয়ে বসল। চোখ দুটো বুজে থাকল সে। পাশেই সুখেন বসে আছে। হাতে চায়ের গেলাস।

সুখেন বলল, লালুর জন্যেই বসে আছি।

লালু চোখ খুলে তার মুখটা একবার দেখে নিয়ে ফের চোখ বুজল। বলল, বদহজম হল সুখেনবাবু?

হ্যাঁ। ধুর, ওসব আমার পোষায় না।

রাত্রে আন্দাজ করতে পারিনি। মাল কিন্তু যা আছে, কমসে কম হাজার দশেক পাওয়া উচিত ছিল আমার। কী বলেন?

সুখেনের মুখটা কাগজের মত শাদা হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। সে কোন

জবাব দিল না। জগদীশ এসে গেছে ভিতরে। যে ছোকরাটা চা করছিল, তাকে ডেকে বলল, লালুকে চা দে।

লালু টেবিলে পা তুলেছে। জগদীশকে দেখে বলল, গুরু সুখেনবাবু ডুবেছে।

জগদীশ বাইরে ঝুঁকে একরাশ থুথু ফেলে বলল, আমরাও ডুবব না কে বলল? বম্বার মাথাটা মোটা। তবে এখন সুখেনবাবুই ভরসা। নিজে বাঁচুন, আমাদেরও বাঁচান।

সুখেন ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, তোমাদের কী হবে? বম্বা কারুর নাম নিশ্চয় করছে না। করলে এভাবে মাল ফেলে দিয়ে যেত না!

জগদীশ তীব্রদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, ফেলেছে কিন্তু আমার দোকানের সামনে। এটার কী মানে?

লালু খিকখিক করে হাসল।···শালা বুদ্ধু কাহেকা। অনেক টাকা পেত!

সুখেন চুপ করে থাকল। বম্বা কী করবে, সে বুঝতে পারছে না।

জগদীশ চাপা গলায় বলল, থানার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে শীগগীর। আগুন জ্বলতে দেরী নেই সুখেনবাবু। এখন টাকা চাই।

সুখেন বলল, কে টাকা দেবে? আমি?

তাছাড়া আর কে?

আমি কেন দেব?

বেশ। দেবে না। ডুববে।

লালু সুখেনের কাঁধে হাত রেখে বলল, আপনার বিয়ে কবে?

সুখেন ঘামছিল। পা বাড়িয়ে অনেকদূর চলে এসেছে সে। এতখানি আসতে পারার সাহস তার ছিল না। বড়জোর একটু-আধটু নষ্টিফষ্টি, মদ খাওয়া, মেয়ে নিয়ে ফুর্তি, কখনও জুয়াখেলা—তার বেশি নয়। হঠাৎ এর সীমানা পেরিয়ে গেছে নিজের অজ্ঞাতে। তার নিজের কতকগুলো ক্ষেত্র আছে—যেখানে সে শক্তিমান—এবং অনায়াসে সব সামলে নিতে পারে। সেগুলো বদমাইসী হতে পারে, কিন্তু অনেক নিরাপদ। সেখানে লালু জগদীশরা নেই। বম্বা নেই। কনকদের মত প্রেমকাতর মেয়েরা

আছে। লীলা আছে। বড়জোর শিবানীও থাকতে পারে। প্রেম ভালোবাসার ব্যাপারে আর যাই হোক, জগা বা লালুর শাসানি তাকে শুনতে হবে না—এটা নিশ্চিত। কারণ মেয়েগুলো সত্যি সত্যি তার জন্যে পাগল হয়ে থাকে। অথচ এই ব্যাপারটা···

কী হল? বিয়েতে নেমন্তন্ন নাই বা করলেন, জানতে দোষ কী?

বিয়ে? সুখেন একটু হাসল।···হয়ত হচ্ছে।

হয়ত মানে?

জগদীশদা এইমাত্র যা বলল, শুনে বিয়ে তো মাথা থেকে পালাচ্ছে! সুখেন পরিহাসের চেষ্টা করছিল।

আপনার হবুগিন্নীর তো টাকার অভাব নেই। নিয়ে আসুন না। নাকি আমরাই যাব ওনার কাছে?

তোমরা যাবে মানে?

টাকার জন্যে।

সুখেন জ্বলে উঠেছিল। পরমুহূর্তেই নিভে গিয়ে জোর করে হেসে বলল, পাত্তা পাবে না। ভীষণ জংলী। ওদের গ্রামটা একেবারে জঙ্গলের পাশেই।

সে আমরা দেখব। এটা তো আমাদের জায়গা। ওনার সেই গ্রামটাম নয়।

লীলাকেও শাসাচ্ছে যেন। সুখেন ক্রমশঃ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। এতদিন মিশেও লোকগুলোর পরিচয় সে পায় নি।

শেষ অব্দি টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উঠতে হল তাকে। হন হন করে সে হাঁটছিল। আপাতত প্রেসে যেতে হবে। তারপর···লীলার কাছে লোক পাঠাবে। প্রেসের অজুহাত দেখিয়েই অন্ততঃ শ' পাঁচেক টাকা সে চেয়ে পাঠাবে।

কিন্তু দেবে তো লীলা? কনক এসেছিল হঠাৎ। মাঝে মাঝে এখানে সে আসে শুনেছিল। কিন্তু এমন সময়ে এসে পড়বে, লীলার বাড়ি যাবে—ভাবতেও পারে নি। লীলা কি জানতে পেরেছে সব কথা? কনক যদি সব ফাঁস করে থাকে, লীলা এর পরেও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, এটা

আশা করা ভুল। লীলা ঝোঁকের মাথায় কাজ করে বসে। বড্ড খামখেয়ালী সে। তাকে বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন।

চৌমাথার কাছে আসতেই অহীনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

অহীন বলল, আশ্চর্য মানুষ! কাল কোথায় ছিলেন? কাল অনেকটা রাত্তির অব্দি বৌদির ওখানে ছিলাম। বৌদি বলেনি?

বৌদি মানে?

বৌদি মানে বৌদি। অহীন সিগ্রেট জ্বালল।

ও। আমি কাল একটু ব্যস্ত ছিলাম। তুমি ওর ওখানে গিয়েছিলে নাকি?

দুজনে হাঁটছিল পাশাপাশি। অহীন বলল, কাল অনেক রাত্তিরে ছোড়দির সঙ্গে উনি বাড়ি ফিরছিলেন। ছোড়দিকে নামিয়ে একা যাচ্ছিলেন। সঙ্গে গেলাম এগিয়ে দিতে।

আমার কথা বলছিল নাকি? কী বলেছ?

আমি কিছু বলিনি। রিকশোওলাটা বলে দিল।

সুখেন দাঁড়াল।···রিকশোওলা? সে কী বলল? আমাকে চেনে নাকি?

চেনে। কাল বিকেলে গঙ্গার পাড়ে কোথায় শিবানীর সঙ্গে আপনাকে দেখেছিল।

গুম হয়ে চলতে থাকল সুখেন। কিছুদূর গিয়ে মুখ খুলল সে।···বস্তা মালগুলো জগদীশের দোকানের সামনে ফেলে দিয়ে গেছে রাত্রে। শুনেছ?

শুনেছি। শুনেই যাচ্ছিলাম।

তবে এদিকে আসছ যে?

আপনার সঙ্গে যাবো না বলছেন?

পাগল! এস। হাত ধরে সুখেন টানল।···লীলা কী বলছে টলছে?

আমি তো সদ্যপরিচিত। আমাকে কী বলবে। তবে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। আপনি বেচারীকে খুব কষ্ট দিচ্ছেন সুখেনদা। এটা বোধ করি ঠিক নয়।

সুখেন মুখ নামিয়ে শ্রান্ত মানুষের মত হাঁটছিল। বলল, আমি নানা ব্যাপারে জড়িয়ে আছি রে ভাই—আমার দ্বারা কিস্যু হবে না। তুমি বিশ্বাস করো, অ্যাদ্দিনে একটা শক্ত জায়গা মিলেছিল। ভেবেছিলাম এবার খুব সাদাসিদে ভালোমানুষটি হয়ে যাবো। নির্বিবাদে ঘরকন্না করব। ভাগ্যে সেসব নেই।

কেন নেই? আপনি ঠিক হোন—তাহলেই ভাগ্য ঠিক হবে।

তা হয় না। ঘরকন্নার পথে কাঁটা পড়ে আছে, বেশ বুঝতে পারছি।

আমি কিন্তু বুঝতে পারছিনে, সুখেনদা।

ইচ্ছে করলেও কতকগুলো ব্যাপার মানুষ ছাড়তে পারে না। দেখ, ওকে বিয়ে কবার প্রস্তাব বল, বা জেদ বল, সেটা আমারই পক্ষ থেকে প্রথম উঠেছিল। এখনও আছে সেটা। যদি ওকে ফাঁকি দিতে চাইতাম, তাহলে তো বিয়ের কথাই তুলতাম না! সত্যি অহীন, এবার আমার ঘোর হিসেবী মানুষ হতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু······

কিন্তু কী?

লীলার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে, অহীন। ও আমার জন্যে সব ছেড়ে এখানে চলে এসেছে। অথচ এখনও শিবানীর মত মেয়ের দরকার হয় আমার। এ না হলে আমার চলবে না। জীবনটা নীরস হয়ে যাবে।

এটা কোন কৈফিয়ত হল না। অহীন গম্ভীর মুখে বলল।···চারপাশে তো অজস্র ভালো ভালো মেয়ে আছে, তা বলে কেউ বৌ নিয়ে ঘরসংসার করছে না—তা তো নয়। এই করেই সবাই বেঁচে আছে!

আছে। আমিও ছিলাম।

ছিলাম মানে?

সুখেন হাসল।···এ বয়সে বেশি জানতে চেয়ো না। মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

আপনার তাহলে সত্যি সত্যি বৌ ছিল একসময়? শুনেছিলাম, বিশ্বাস করিনি। ছেলেপুলে হয়নি?

নাঃ। এর আগে আমার একবার নয়—দুবার বৌ জুটেছিল।

সব ফাঁস করে দিলেন! লীলাবৌদিকে যদি বলে দিই?

ও জানে হয়ত।

কী সর্বনাশ!

অহীন হাসছিল। সুখেনও ওকে সব ফাঁস করে দিয়ে হালকা বোধ করছিল যেন। হতাশা আর ক্লান্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে সে লীলার কথা ভাবতে-ভাবতে পাগল হয়ে যাচ্ছিল কদিন থেকে। ইচ্ছে করছিল, লীলাকেও সব খুলে বলে ক্ষমা চেয়ে নেয়। একটা সুন্দর সহজ জীবন তাকে প্রলুব্ধ করেছে কতদিন ধরে। এত কাছে এসে ভরাডুবি হবে, সে ভাবতে পারে নি। কনককে লালার ওখানে দেখার পর এক অসহ্য অস্বস্তি তাকে উত্যক্ত করে মারছে। সে ছটফট করছে, প্রকাশ করার সুযোগ পায় না। স্মৃতি তার চোখের ঘুম কাড়ছিল।

প্রেসের সামনে এসে অহীন বলল, লীলাবৌদির কাছে আপনি আগেও যা ছিলেন, এখনও তাই। শীগগীর তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। ভীষণ ভাবছেন আপনার জন্যে।

সুখেন শান্ত সুবোধ ছেলের মত ঘাড় নেড়ে প্রেসে ঢুকল। অহীন চলে গেল।

রমা তার অপেক্ষা করছিল সকাল থেকে। বলল, একগাদা অর্ডার নিয়ে বসেছি। জানিনে, বকবেন না কী।

গম্ভীর মুখে সুখেন বসল।

কানাই এসে বলল, কাল মা-মণি এসেছিলেন। আপনাকে খুঁজছিলেন।

কী বলেছ?

লালগোলার ওদিকে গেছেন বলেছি।

লালগোলা? আমি তোমাকে কাঠগোলা বলেছিলাম।

কানাই একগাল হাসল।...যা মাথায় এল বলে দিলাম।

ঠিক আছে। যাও।

সকালে লোক পাঠিয়ে শতখানেক টাকা আনিয়েছি। কাগজ কিনতে হবে।

কী কাগজ? কিসের জন্যে?

বিয়ের পত্রটা ছাপতে বলে গেছেন। পাঁচ হাজার ইম্প্রেসন।

অতি দুঃখেও সুখেন হাসল।···ঠিক আছে।

বলে পাঠিয়েছেন, এলেই যেন বাবু ওঁকে দেখা করেন।

করব।

কানাই চলে গেলে রমা বলল, যে অর্ডারগুলো এনেছিলাম, বৌদি সব সাপ্লাই দিতে বলে গেছেন!

কই দেখি, কী অর্ডার।

কিছুক্ষণ ব্যস্তভাবে কাজে ডুবে থাকল সুখেন। একটু পরেই রমা বেরিয়ে গেল। সুখেন তার ঘরে ঢুকল। জামা-কাপড় বিশৃঙ্খল হয়ে আছে গায়ে। খুলল না। ধূপ করে শুয়ে পড়ল সে। আপাতত জগদীশকে টাকা দিতে হবে। তারপর অন্য ভাবনা।

কিন্তু এ অবস্থায় ফের লীলার কাছে টাকা চাওয়া যাবে কি? কোন উপলক্ষ্যে চাইবে সে?

সুখেন অসহায় হয়ে গেছে হঠাৎ। তার নিজের তো অনেক টাকা থাকা উচিত ছিল। থাকে না। কোন দিকে সব গলে যায়, কে জানে! হঠাৎ আসে, হঠাৎ চলে যায়। আজ এখনই যদি লীলা তার ওপর বিরূপ হয়ে প্রেস থেকে তাড়িয়ে দেয়, সুখেনের পথ ছাড়া আশ্রয় নেই। প্রেসটা লীলার নামে যত টাকায় বিক্রী করেছে, প্রায় সবটা আগের কোম্পানীকে পরিশোধ করতেই গেছে।

শঙ্কর ভট্টাচার্য খুব ঝানু লোক। লীলা বিন্দুমাত্র ঠকার সুযোগ পায় নি। তা না হোক, শুধু সুখেন চেয়েছিল প্রেসটা তার হাতে থাকলেই চলবে। আছেও হাতে। অথচ কিছু করা যাচ্ছে না। ফুর্তি করা আর হিসেবীর মত কারবার চালানো দুটো এক সঙ্গে যে পারে—সে সব্যসাচী। সুখেনও এক সময় সব্যসাচী ছিল। অথচ আস্তে আস্তে একটা হাত যেন অবশ হয়ে আসছে। সামনে এমন সহজ সুন্দর শোভন জীবনের হাতছানি —কিন্তু পিছনে আশে-পাশে অজস্র উত্তেজনা—এই সব শিবানীরা। তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে যেন।

লীলাদের পাড়ায় কনকের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় আছে, সে

জানত না। কনক কোনদিন তাকে বলে নি। সে কলকাতা চলে গেলে সুখেন নিরাপদে দিন কাটাচ্ছিল। এতদিনে জানা গেল, কনক মাঝে মাঝে বহরমপুরে আসে। কেন আসে? এখনও কি সুখেনের জন্যে কোন আশা আছে তার?···সে খুবই অসম্ভব লাগে। সুখেনকে তো সে বিশ্বাস করত না! অসুস্থ হলে তার হাতের ওষুধ খেতে চাইত না। অথচ সে যেন এখনও সুখেনের কামনা করে।

সুখেনের হাসি পেল। সে—যাকে বলে, কতকটা লেডিকিলার। মেয়েরা—বিশেষ করে বড়লোকের মেয়েরা এত সহজে এই সব লোকের পাল্লায় পড়ে যায়। শিবানী পড়ে না। শিবানীরা ঠকে না। তারা জানে, সুখেনরা কী চায়। তারা ইচ্ছে থাকলে তা দেয় এবং তার বেশি আশা রাখে না। নিজেকে মেরে তার ওপর তাজমহল ওঠাবার স্বপ্ন দেখে না।···আসলে জীবনে সুখে থাকার সহজ উপায় হচ্ছে, সব রকম মোহ ত্যাগ করে বাঁচা। সুখেন জানে, তার সঠিক বয়স আটত্রিশ পেরিয়ে যাচ্ছে—লীলা জানে তার বয়স আটত্রিশ নয়—আটাশ হয়ত তারও কম। এইটাই হচ্ছে মোহ। প্রদীপের শিখার চেয়ে আলোর ছটা বড় বিপজ্জনক। চোখ ধাঁধিয়ে রাখে।

সুখেন হাত বাড়িয়ে বালিশের নীচে থেকে একরাশ কাগজ তুলে দেখছিল। তার ভিতর থেকে একটা ছবি বেরিয়ে এল। লীলার। কিছুক্ষণ ছবিটা দেখার পর সেটা বিছানায় রেখে সে উঠল। স্যুটকেশ খুলল। কাপড়চোপড়ের নীচে অনেকগুলো ছবি রয়েছে। সেগুলো এনে চিৎ হয়ে শুল ফের। দেখতে থাকল। প্রথমেই কনক।

কনককে সেদিন একবার ঝটিতি দেখেছে। স্পষ্ট চেহারা মনে ভাসে না। তবে এটা ঠিক—কনক রোগা হয়ে গেছে আগের চেয়ে। রঙটা ময়লা হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক সেটা।

ছবিটা বেশ কয়েক বছর আগে হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিল। তখনও সর্বস্ব খুইয়ে কম্পোজিটার বেশে প্রেসে ঢোকেনি সুখেন। স্যুটকেশ হাতড়াতে গিয়ে এটা বেরিয়ে পড়েছিল। তখনও ছবিটা এমনি করে সে মাঝে মাঝে দেখেছে। যেন খুঁজতে চেষ্টা করেছে কিছু। কী খুঁজেছে—স্পষ্ট বুঝতে

পারত না। এখনও পারছে না। বড়লোকের বাড়ির জামাই—অজস্র সুখের পর সেইসব কষ্টের দিনগুলোতে সে যেন ছবির মধ্যে স্মৃতির সুখ পেতে চাইত। সে সুখ নিতান্ত আহার-মৈথুনের সুখ। ছবি তাকে ফের লোভী করে তুলত।

আজ স্মৃতি তাকে অন্য কী সুখের স্বাদ দিচ্ছিল। সে কনকদের ঠকাতে পেরেছিল, না নিজেই ঠকে আসছিল? আজও সে লীলাকে ঠকাচ্ছে—নিজেও ঠকছে না কি? এমনি করে চিরদিন তাকে বেঁচে থাকবার দিব্যি কে দিয়েছে?

ঘুমে জড়িয়ে আসছিল চোখ। সারাটি রাত আজ ওপারে এক আড্ডায় জেগে কাটিয়েছে। সারা রাত মদ আর তাস খেলা। সন্ধ্যার দিকে শিবানীকে নিয়ে ঘুরেছিল। মনটা ভরে ছিল ওই দিয়ে। ক্লান্তি ছিল, দুর্ভাবনা ছিল। জগদীশ-লালু-বম্বার ভয়ে পাশাপাশি একটা অন্য আড়াল সে খুঁজতে গিয়েছিল। ওপারে কাঠগোলায় একটা আড্ডা বসে। টুলু ওরফে নীরেনের পার্টি ওপারের রাজা। টুলুবাবু কাঠগোলার মালিক। পয়সাওলা লোক। বদমাইসীটা তার সবটাই শখের ছাড়া অন্য কিছু নয়। লালু চটলে টুলুরা অবশ্যি সহায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সেটা এপার নয়, ওপার।

গতিক দেখলে ওপারে গিয়ে থাকতে আপত্তি কী! সুখেন ভেবেছিল।

ঘুমের মধ্যে একটু একটু করে ডুবে গেল সুখেন। হাতের ফটোটা বুকে উপুড় হয়ে পড়ে রইল আঙুলের ভাঁজে। অন্যগুলো তার পিঠের নীচে আশেপাশে ছড়িয়ে আছে এলোমেলো। সুখেন স্বপ্ন দেখছিল। শরতকালের ঘননীল আকাশে পায়রার ঝাঁক। অনেক ঘুড়ি। সাদা লাল নীল এবং হলুদ। শুধু হলুদ।

চোখ থেকে হলুদ ছোপগুলো মুছে সুখেন তাকাল। তারপর ধুড়মুড় করে উঠে বসল। কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারল না সে। স্বপ্নের মধ্যে ছেলেবেলাকে ফিরে পাওয়ার স্নিগ্ধ বিষণ্ণতাটুকু তখনও তার মনে। অথচ সামনে এখন লীলা এসে দাঁড়িয়ে আছে। সুখেন হাসবার চেষ্টা করছিল। এই লীলা একবার তাকে একটা গল্প বলেছিল। রূপপুরের

কোথায় কেনা জঙ্গলের ভিতরে লীলা নাকি একটা ডোরাকাটা মস্ত ভুল বাঘ দেখেছিল দুপুরবেলা। আলোছায়ার ঝালরে একটা নিতান্ত ছবি। সত্যিকার বাঘ হলে কী করত লীলা জানে না—তবে এই ভুলটা তার খুব ভালো লেগেছিল নিজের কাছে। সে তখন সেই ঝালরের পাশে দাঁড়িয়ে গাছপালাকে শুনিয়ে বলেছিলঃ এই আমার বাঘ। এখন লীলার বয়স হয়েছে। বহুকাল সে জঙ্গলে যায় নি। এখন হয়ত ভুল বাঘ দেখায় তার সুখের চেয়ে রাগই বেশি হবে। ছেলেবেলার মত তার ওপর শুয়ে বলবে নাঃ সোনা আমার ঘুমোও।

সুখেন হাসবার চেষ্টা করছিল। অথচ এতদিন পরে লীলাকে তার কেমন ভয় করছে জেনে নিজের ওপর ক্ষুব্ধ হচ্ছিল। খুব দুর্বল হয়ে গেছে সে। ক্লান্তি বোধ করছে। নিজেকে চাকর মনে হচ্ছে।

লীলা বসল না। দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখটা থমথম করছিল। সে বলল, রমা কতকগুলো অর্ডার এনেছিল। ছাপা হয়েছে সেগুলো?

সুখেন অবাক হল। চোখে চোখে তাকিয়ে থাকার পর বলল, কানাই বলতে পারে।

তুমি পার না কেন?

কৈফিয়ৎ তলব করছ?

করা উচিত। আমার সবকিছু এখন প্রেসেই আছে।

সুখেন একটু হাসল।...বেশ তো, অন্য লোক রাখো—যে আমার চেয়ে যোগ্য।

দরকার হলে তাও রাখতে হবে।

লীলা ঘুরে দাঁড়াল। পা ফেলবার মুহূর্তে সুখেন বলল, আরে! তুমি যে ভীষণ কাজের লোক হয়ে উঠেছ দেখছি। শোন—

বল।

রাগ করেছ?

লীলা জবাব দিল না। সময়টা বড় খারাপ সুখেনের। ছত্রাকার ছড়ানো ফটো—সাবধানে শরীর দিয়ে আড়াল করেছে যথাসম্ভব। নতুবা উঠে গিয়ে ওর হাত ধরে টেনে আনত। সুখেন ফের বলল, কাজের লোক

আমিও কম নই। কাজের কথাই বলতে চাই, শোন। এই বাড়িটা বদলাতে হবে শীগ্‌গীর।

কেন?

কুলোচ্ছে না। আরও জায়গা দরকার।

বেশ, বাড়ি দেখ। ভালো বাড়ি হওয়া চাই। যা ভাড়া হবে, হোক।

ভালো কিছু পেতে হলে সেলামী লাগবে।

কত লাগতে পারে?

আমার ঠিক ধারণা নেই। হাজার থেকে দু হাজার তো বটেই! তবে তোমার উকিল ভদ্রলোককে এতে জড়িও না। সুখেন দাঁও হাতে পাবার উৎসাহে বলতে থাকল।···বাড়িওলারা আইনের লোক দেখলেই ঘাবড়ে যায়। তাছাড়া, আমি যে-বাড়ির খোঁজ জানি, তার মালিক আবার ভীষণ ভীতু লোক···

কথা কেড়ে লীলা বলল, আমি নিজে কথা বলব।

ভদ্রলোক থাকেন লালগোলার ওদিকে। তুমি অদ্দুর যেতে চাইবে? বরং আমিই যাই।

কানাই এসে গেছে ইত্যবসরে। সাবধানী কানাই পর্দার ওদিকেই দাঁড়িয়ে আছে অবশ্য। কেশেছে। তারপর ডেকেছে। বাবু!

পর্দা তুলে লীলা বলল, কী?

মালিককে কানাই ঢুকতে দেখে নি। তা সত্ত্বেও সুখেনের দরজায় পর্দা ঝুললে কতদূর পা বাড়ানো উচিত সে জানে। কানাই সলজ্জ হেসে প্রণামান্তে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে একটা ঝকঝকে রঙীন কাগজ তুলে দিল লীলার হাতে। সেই বিয়ের পদ্য!

কানাই চলে গেল। লীলা খুঁটিয়ে পড়ছিল। অবশ্য আলো ঘরে খুব কম। চোখের জ্যোতি না থাকলে পড়া রীতিমত কঠিন বৈকি। একটুখানি উঠে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে দিল সুখেন। আগাগোড়া দৃশ্য ও ঘটনাটা সে উপভোগ করছিল।

সুখেন লুকিয়ে হেসে বলল, কী ওটা?

কতকটা সুখেনের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে লীলা বেরিয়ে গেল। কাগজটা পায়রার মত উড়ে মেঝেয় গিয়ে পড়লে সুখেন ঝটিতি এক পলক পড়ে নিয়ে আগে ছবিগুলো বিছানার নীচে সামলাল। তারপর পর্দা তুলে বাইরের অফিস ঘরে গেল। দেখল, লীলা ঠিক প্রেসবাবুদের মত গদীআঁটা চেয়ারে বসে পড়েছে। গম্ভীর মুখে কাগজ দেখছে। এখন একটা চশমা হলেই ভীষণ মানিয়ে যায়।

হ্যাত্তেরি গেঁইয়া! মনে মনে বিলক্ষণ বিরক্ত সুখেন। যেন একটা কিম্ভুত সঙ নিয়ে তার জ্বালা হয়ে যাচ্ছে—ঠিক এই ধরনের তাচ্ছিল্য-মেশানো রাগ ও বিরক্তি তার মনে। সে বলল, ওই পদ্যটা যারা ছাপতে দিয়েছে—তাদের বর বেচারার মুখটা মনে পড়ে আমার কষ্ট হচ্ছে। কনেটি অবশ্যি ভীষণ সুন্দর—বরের মনে তাই প্রচণ্ড লোভ। অথচ···

আরও কী বলত সুখেন। কিন্তু লীলা উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ চলতে থাকল। দরজার নীচে গিয়ে একবার দাঁড়াল। পথের দুদিকে যেন রিকশো খুঁজল সে। তারপর এগিয়ে গেল হনহন করে। হাতের ছাতিটা খুলে তীব্র রোদ থেকে মাথা বাঁচিয়ে লীলা হেঁটে যাচ্ছিল। শ্লিপারের পিছনে তার পায়ের অসম্ভব সাদা তলাটা বার বার কালো পীচের ওপর ছটা বিকিরণ করছিল। সুখেনও এগিয়ে গেল।

ওয়াটার ট্যাঙ্কের কাছে এসে ডাইনে ঘুরল লীলা। গঙ্গার দিকে গেছে এই রাস্তাটা। সুখেন জেলখানার সীমানা পেরিয়ে ছোট বাঁধের ওপর লীলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

লীলা যেন চমকানোর ভান করল তাকে দেখে। ছাতিটা ঘোরাচ্ছিল সে। থামল হঠাৎ। সে বলল, তুমি কোথায় যাবে?

এসব ক্ষেত্রে সুখেন যা করেছে, তা করা ছাড়া উপায় নেই। একটুখানি জলের ফোঁটার দরকার চোখে, মুখটা দারুণ ফ্যাকাসে আর করুণ হবে, শেষ অব্দি অজস্র প্রলাপ খরচ করতে হবে। তাতে কাজ না হলে—এখন গঙ্গা তো কূলে কূলে ভরে আছে, সুখেন সাঁতারও জানে!

কিন্তু কোনটাই দরকার হল না। সুখেন কিছু বলার আগেই লীলা হেসে ফেলেছে।

হেসেছে, কারণ সুখেনকে সে যা দেখতে চেয়েছিল, সুখেন তাই। তারপর দুজনে পাশাপাশি আবর্জনার স্তূপ ভেদ করে যে সরু পায়ে-চলা পথটা গঙ্গার পাড়ে চলে গেছে, সে পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। আপাতত কোন কথা বলছিল না কেউ। ওদের দুপাশে সরকারী অরণ্য। আজ আকাশ পরিষ্কার থাকায় রোদ বড় উজ্জ্বল। গাছপালাগুলোকে স্নানের পর সতেজ দেখাচ্ছিল। অজস্র পাখি ডাকছিল। ওখানে ভরা গঙ্গায় নৌকোর দাঁড়ের শব্দ হচ্ছিল। জলের ঢেউ-এর শব্দ। জল ভাঙার শব্দ। স্টীমারের বাঁশি। শঙ্খচিলের চিৎকার। আর এখানে গাছের নীচে ঘন ছায়া।

কিছুক্ষণ পরে সুখেন চমকে উঠে বলল, লীলা, তুমি কাঁদছ ?

চোখের জল মুছবার চেষ্টা না করে লীলা জবাব দিল, কান্না আমার আসে না। আমি কাঁদতে পারিনে।

কিন্তু তুমি কাঁদছ !

বাবা মারা গেলে আমি নাকি কাঁদি নি। অবশ্যি তখন আমার বয়স খুব কম।···লীলা শান্তকণ্ঠে বলল।···তবু মা বলত, আমার মত নিষ্ঠুর মেয়ে নাকি দেখা যায় না। তারপর মাও মারা গেল। এখন আমার বয়স হয়েছে। খুব কাঁদা উচিত ছিল। রূপপুরে ওরা আড়ালে আমার নিন্দে করেছে—আমার বুক নাকি পাথরে তৈরী। লীলা হাসছিল।·· তারপর রূপপুর ছেড়ে আসবার দিনও সবাই কেঁদেকেটে একাকার করছিল, আমি কাঁদতে পারলাম না।

তাহলে···সুখেন আঙুল দিয়ে তার চোখের নীচে থেকে জলের ফোঁটা তুলে এনে দেখাল। তাহলে এগুলো কী লীলা ?

কিছু না। রাগ হলে আমার এমন হয়। অনেকবার হয়েছে! ও যখন সে রাত্রে রূপপুর থেকে চলে আসে···

কে ? সতু ?

হ্যাঁ। ঠিক এমনি হয়েছিল সে রাত্রে।

কী সর্বনাশ! এ তোমার রাগের অশ্রু ?

ন্যাজলেমি করো না। ভালো লাগে না।

তুমি সত্যিই খুব অদ্ভুত মেয়ে। যত ভাবি, তত বেশি ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

কী ইচ্ছে করে?

সুখেন টেনে টেনে উচ্চারণ করল, ভা—ল—বা—স—তে।

লীলা তীব্রদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, কনক নামে তোমার একটা বৌ আছে?

হঠাৎ ওই প্রশ্নে সুখেন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আছে নয়—ছিল।

আগে বলনি!

বলিনি—শুনলে তুমি আমাকে কী ভেবে বসতে।

আমাকে তুমি ডিভোর্সের মামলা করতে বলেছিলে। নিজে আগে করনি কেন?

বেশ, এখন করব। কালই করব।

কিন্তু এতদিন করনি কেন?

আইনগত অসুবিধে ছিল।

কী অসুবিধে?

সুখেন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল, বিয়ের সময় একটা রেজিস্টার্ড ডিড করা হয়েছিল। সে সব অনেক জটিল ব্যাপার। কনককে ডিভোর্স করতে হলে আমাকে অনেক টাকা দিতে হবে। যৌতুকে একটা সম্পত্তি পেয়েছিলাম তার সমান মূল্য। সে অনেক অনেক টাকা।

সে সম্পত্তি কী করেছ?

বুড়ো আঙুল নাচিয়ে সুখেন বলল, উড়ে গেছে। একটা ব্যবসা করতে গিয়ে ফতুর হয়েছিলাম। কনক অবশ্যি তখন আমার কাছেই ছিল।

লীলা হেসে ফেলল। উঃ কত কাণ্ডই না করেছ এ বয়সে! ধন্য তুমি।

সুখেন মুখ নামিয়ে অপরাধীর মত বলল, জীবনে উন্নতি করতে চেয়েছিলাম।

পরমুহূর্তে লীলা ফের ওকে চমকে দিল।…কিন্তু সুধাকে বিষ খাইয়ে

মেরেছিলে কেন?

সুখেন থমথমে মুখে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, মানুষের জীবনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহু ব্যাপার ঘটে যায়। কিন্তু যা রটে, সবটাই যে সত্য নয়—এটা তোমার বোঝা উচিত লীলা। তুমি কচি খুকীটি নও।…আমি যদি বলি, তুমিও সতুকে বিষ খাইয়ে মারতে চেয়েছিলে। সতু সেটা টের পেয়ে তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল।

লীলা মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল। তারপর মুখ নামিয়ে বলল, হলেও হতে পারে। কিন্তু সে তো তোমার জন্যে। তুমিই দায়ী। কেন সে রাত্রে আমাকে ডেকে নিয়ে আমার সর্বনাশ করেছিলে?

তুমি গেলে কেন?

নিশির ডাকে মানুষ অমনি করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—এটা জানি।

জেনেও বেরিয়ে গিয়েছিলে কেন?

আমার খুশি।

সুধাকে বিষ খাওয়ানোও আমার খুশি।

লীলা এবার ওর হাত ধরে টানল। বস। তুমি ঝগড়া করছ, আমি করি নি।

নাঃ। আমি যাই।

কোথায় যাবে?

যেখানে খুশি। তোমার প্রেস তুমি বুঝে নেবে এস।

প্রেস আর প্রেস! আমার আর ওসব ভালো লাগছে না একেবারে। যা খুশি করো। আমি যাই।

কোথায় আর যাবে? জগদীশের মেয়ে ছাড়া আর কে জুটবে তোমার?

সুখেন হাসবার চেষ্টা করে জবাব দিল, লীলা তো আছেই শেষ অব্দি।

লীলা নেই।

তার বিয়ের পদ্য আছে।

ও একটা শখ। আমার বিয়েতে পদ্য ছাপা হয় নি। তাই একবার

দেখলাম কেমন লাগে ওসব।

হার মানছি। বলে সুখেন ধপ্ করে বসে পড়ল পাশে। এ একরকম অদ্ভুত লড়াই। দুটো সঙ যেমন রাঙতার তরোয়াল নিয়ে লড়াই করে। তা ছাড়া কি? সুখেন তবু মনে মনে বিরক্ত। অস্বস্তিও কম নেই। জগদীশের টাকা দিতে হবে। তারপর কনক একটা বীজ পুঁতে গেছে। অঙ্কুর দেখা যাচ্ছে। ওপড়াতে হবে। এই করে বেঁচে থাকার মানে হয় না। তার চেয়ে শিবানীই একান্ত আরাম—জগাকে লুকিয়ে সে বনের দিকে চলে আসতে পারে। কোন দায় নেই, ঝক্কি নেই।

কিন্তু আর জমবার কোন লক্ষণ নেই। দুজনেই হয়তো ভিতরে একটা তাগিদ অনুভব করছে, একটা সহজ ও স্বাভাবিক হওয়ার তাগিদ, সম্ভব হচ্ছে না সেটা।

হঠাৎ এদিক-ওদিক তাকিয়ে নির্জনতাটা আঁচ করে নিয়ে সুখেন লীলার গালে একটা আলতো চুমু খেয়ে বসল।

পরমুহূর্তে মাথা ঘুরে উঠেছে সুখেনের। লীলা প্রচণ্ড জোরে ওর কানের পাশে একটা চড় মেরেছে। তারপর উঠে দাঁড়িয়েছে। ছাতাটা হাতে নিয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করেছে।

সুখেন উঠল না। নিঃশব্দে দাঁতে দাঁত চেপে ওর চলে যাওয়াটা দেখছিল। গাছপালার আড়ালে লীলা অদৃশ্য হলে সে বিড়বিড় করে বলল, শালী গেঁয়ো বেশ্যা! তারপর পা দুটো ছড়িয়ে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল সে। সেই সময় পিছনে একটা গাধা সশব্দে নাক ঝাড়লে ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখতেই পলকে তার সব রাগ জল হয়ে গেল।

ষোল

ঘণ্টার আজকাল মনমেজাজ আগের মত রসাল নেই। বাসিনীর বিকালবেলা তড়িঘড়ি সাজতে বসা এবং সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো দেখে 'বাগানপাড়ার মাসি' বলে আর ঠাট্টা-তামাসা করে না। ঘরের

বাইরে এক টুকরো খালি জমি রয়েছে। সেখানে অনেক যত্নে একটা সবজীক্ষেত তৈরী করেছে সে। পাড়ার চেনা মেয়েরা লীলাকে ফুলের বাগান করতে বলেছিল। সে-বাগান উঠোন থেকে ওই ক্ষেত অবধি বিস্তৃত করেছে ঘণ্টা—কতকটা লীলার আদেশ, কতকটা নিজের তাগিদ। রূপপুরে থাকতে সে বড়জোর গাঁদা দোপাটি হরগৌরী চিনত। এখানে এসে জিনিয়া চিনেছে। পাশেই একটা খৃস্টান কবরখানা। তার লাগোয়া একটা কুঠিবাড়ি রয়েছে। কুঠিবাড়িতে যারা থাকে, তাদেরও ফুলের বাগান আছে। এক চিলতে খোয়াবিছানো রাস্তার ওপারে পাঁচিলে বুক রেখে ঘণ্টা কখনও সেই বাগানটা দেখে আসে। সেখানে অজস্র অজানা সুন্দর সুন্দর ফুল। ঘণ্টার সাধ যায় নাম জানতে। কিন্তু মুখচোরা ভাবটি এখনও তার ঘোচে নি। তার মতই একটা 'তুশ্চ মনিষ্যি' সেখানে সারাদিন মাটির ওপর ঝুঁকে বসে থাকে। ঘণ্টার মনে হয়, কী একটা জানোয়ার যেন শরীর নাড়া দিয়ে আহার করছে। সে চোখ তুলে ঘণ্টাকে দেখলেই ঘণ্টা সরে আসে। কেমন গা ছমছম করে তার। শহরের সবকিছু তার কাছে বড় বেশি পবিত্র লাগে—সহ্যের অতীত পবিত্র। রূপপুরের বামুনবাড়ির মেয়েরাও কম রূপসী নয়। তারাও যথেষ্ট সাজে। তত্রাচ এই শহরে পথের ওপর বা কদাচিৎ লীলার বাড়ি যে মেয়েরা আসে, তাদের দিকে রূপপুরের মত লোভী চোখে তাকাতে নিজেরই খারাপ লাগে তার। যেন সব স্বর্গের জিনিসপত্র, দেবদেবতাদের জ্যোতিতে ঘেরা—চোখ জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে। এটা ভয় নয়। ঘণ্টা বুঝতে পারে, এটা আদৌ ভয় নয়—অতি-পবিত্রতাকে সম্মান। এখানে কোন জিনিসই দাঁতে দেবার জন্যে নয়—শুধু দূর থেকে দেখবার। এই গা-ছমছম সম্মান বোধটি নিয়ে সে শুধু মেয়ে কেন, ওই সব ফুল ও মালীর দিকেও মুগ্ধ দৃষ্টে তাকায়।

কিন্তু মন ভরে না ঘণ্টার। দেবদেবতার থানে বেশিক্ষণ থাকতে নেই। মানুষ বা মনিষ্যির কত রকম ভালমন্দ ইচ্ছে-সাধ থাকে। কে আর চিরকাল পূজোরী হতে ভালবাসে।

তাই ঘণ্টা আজকাল রূপপুরের কথা ভাবে। আকাশের দিকে তাকায়।

তাকাতে-তাকাতে সামনের ওই খোলা পোড়ো বিরাট ময়দানের দিকে অন্যমনস্ক হেঁটে যায়। তারপর কোথাও ধুপ করে বসে গরু দেখে। একটি কি দুটি দলছাড়া গাইগরু বা মোষ এদিকে চরতে আসে খাটাল থেকে। ঘণ্টার হাত নিসপিস করে বাঁটের দিকে তাকিয়ে। কতদিন সে দুধের বাঁটে হাত দেয়নি! বাসিনীকে বলেছিল, সেই তো দুধ লাগছেই, বল না দিদিঠাকরুনকে, একটা দুধেল গাই কিনে ফেলুক। বাসিনী ধমক দিয়েছিল, দূর ছোঁড়া, এ কি সেই গেরাম! লীলারাণীর একটা মানসম্মান আছে না এখানে? ওরে বাবা, কত্তোসব বড়বড় নোক আসে, তেনাদের মেয়েরা আসছেন··শুনে ঘণ্টা আর ও নিয়ে এগোয়নি। হয়ত তাই হবে। এখানে মানী লোকেদের গরু পুষতে নেই।

ঘণ্টা দুঃখিত চোখে একটা গরুর বাঁটের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সেই সময় বাসিনী সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে ইসারায় ডাকছিল। অনেকবার চেষ্টা করেও ঘণ্টার ধ্যান ভাঙ্গল না দেখে অগত্যা সে বকের মত লম্বা সতর্ক পা ফেলে কাছে গেল। তারপর চাপা গলায় ধমকাল, বলি আরে মাগীমুখো মিনসে, তোরও কি পেরানে উদেস-উদেস ঘোর লাগল রে, এঁ্যা!

ঘণ্টার মুখের দুকষায় লালা ঝরছিল। ত্বরিতে হাতের চেটোয় মুছে সে হাসল। আমাকে ডাকছ?

হ্যাঁ, তোর কত্তাঠাকুরকে ডাকছি।

কী, হল কী?

বাসিনী কোমরে একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে চাপা উদ্বেগ। সে ফিসফিস করে বলল, ঠাকরানের কী হয়েছে বলতে পারিস? সেই একপহর বেলায় বেরিয়েছিল। এতক্ষণে ফিরে উবুর হয়ে শুয়ে আছে তো আছেই। এত ডাকলাম, কথাটি কইছে না। জানিস কিছু বিত্তেন্ত?

ঘণ্টা মাথা নাড়ল। কই না তো, বলে চোখভরা কৌতূহল নিয়ে তাকাল সে।

তুই তো পেরেসে গিয়েছিলি।

হুঁ হুঁ।

সুখেনবাবু ছিল পেরেসে ?

কে জানে! দোরগোড়ার দিদিঠাকরান আমাকে বললেন, তুই বাড়ি চলে যা। আমি চলে এলাম।

বাসিনী মাথা দুলিয়ে বলল, নির্ঘাৎ ঝগড়াঝাটি হয়েছে দুজনায়। এটা ভাল কথা নয় বাছা, উঁহু, ভাল মোনে লাগছে না। সেই দুধখেকো মেয়েটি কোলেপিঠে করে মানুষ করিছি, এমন তো দেখি নাই। ঘণ্টা রে, বাছা আমার তরাস লাগছে, বুঝলি ?

ক্যানে গো ?

দু' দুবার আপ্তহত্যা করতে মেয়েছিল। ত্যাখনও ঠিক এমনি উবুর হয়ে শুয়ে···উঁ হু হু! আচম্বিতে ত্রাসে থরথর করে কেঁপে উঠেছে বাসিনী। পরক্ষণে সে হনহন করে হাঁটতে শুরু করেছে বাড়ির দিকে। ঘণ্টার মনে হল, যেন ঘরে আগুন লেগেছে আর ভিতরে বাসিনীর মেয়েটা শুয়ে আছে —তেমনি করে ছুটে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ বিরক্ত হল সে। স্বভাবসুলভ থপথপিয়ে হাঁটতে থাকল আস্তে আস্তে। মাঠে প্রচুর ঘাস গজিয়ে আছে। তার পায়ের ধুপধুপ শব্দে পোকামাকড় লাফিয়ে পড়ছিল। পায়ের তলায় সেগুলোকে পিষে ফেলতে চেষ্টা করছিল সে।

বাড়ি ঢুকে ঘণ্টা দেখল, বাসিনী ঘরের বারান্দায় দরজার পাশেই হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। পেটে ক্ষিদে নিয়ে ঘণ্টা একবার উঁকি মেরে ভিতরটা দেখে নিল—লীলা ওপাশে ফিরে শুয়ে আছে। একটা পা কোণের ছোট্ট গোল টেবিলে উঠে গেছে। ফলে হাঁটু অব্দি দেখা যাচ্ছিল লীলার। উজ্জ্বল সাদা পায়ে নীলচে রোমের ঝাঁক স্পষ্ট হয়েছে। ঘণ্টা কোনদিন দিদিঠাকরানের পায়ের অতখানি খুঁটিয়ে দেখেনি। এখন তার মনে হচ্ছিল, সুন্দর পবিত্র একটা ব্যাপারে সুখেনবাবুর কী একটা মারাত্মক ষড়যন্ত্র চলেছে। ঘণ্টার চোখ দুটো জ্বলে উঠছিল। সারা গা রি রি করে উঠছিল রাগে ঘেন্নায় হিংসায়। এবং এই প্রচণ্ড নিঃশব্দ বিক্ষোভটা তার ক্ষিদে ভুলিয়ে দিল। সে আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে গেল।

দরজার কপাটে সন্তর্পণে হাত রেখে ঘণ্টা তোলা পর্দাটা ঘাড়ের কাছে আরও খানিকটা তুলে ডাকল, দিদি, নীলাদি।

নাম ধরে কোনদিন ডাকেনি ঘণ্টা। ডাকবার কথা মাথায় আসেনি তার। অথচ একটা অভাবিত কৃতজ্ঞতা তার কণ্ঠনালীর খাঁজে খাঁজে জল চুইয়ে দিচ্ছে। কাসি আসছে। চোখে জলের বিন্দু নিয়ে ঘণ্টা ডাকছিল, নীলাদি, আমি ডাকছি গো!

লীলা বিস্মিত হয়েছিল কি না কে জানে, মুখ ফেরাল। লাল চোখ, ফুলো-ফুলো মুখ অস্বাভাবিক। তারপর ভ্রূ কুঁচকে বলল, কিছু বলছিস ঘণ্টা?

আজ্ঞে।

আয় না, ভিতরে আয়।

ঘণ্টা ভিতরে গিয়ে মেঝেয় ধুপ করে বসল। তারপর বলল, এট্টা কথা বলছিলাম। ভয়ে বলি, না লির্ভয়ে বলি?

লীলা ধমক দিল, ভনিতা রাখ্।

আমায় মোন টানছে দিদি, গেরামে যাবো।

যাবি তো যা, আমায় কী বলছিস? লীলা ফের মুখ ফিরিয়ে শুল। জানালার পর্দাটা তুলে বাইরে চোখ রাখল সে।

একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে ঘণ্টা নিঃশব্দে নেমে এল উঠোনে। তার মুখটা বিকৃত দেখাচ্ছিল। পিছনে বাসিনী নেমে এসে ফিসফিস করে বলল, তোর আবার কী হল হঠাৎ! মরণ আর কী!

ঘণ্টা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, নাঃ। ঘর বাগে মোন টানছে। তুমি থাকো বাসিনীদি, আমি যাই।

সত্যি সত্যি যাবি নাকি? বাসিনী তার পাঁজরে চিমটি কাটল। ক্যানরে? হঠাৎ তোর শুদ্ধ দশা লাগল নাকি? বাসিনী গরগর করছিল।··· বলি অ রে মুখপোড়া, তুই যাবি আর আমি পড়ে থাকব নাকি?

ঘণ্টা ভেংচি কেটে বলল, তুমি এখন শউরে হয়েছ। তুমি যাবে ক্যানে?

বাসিনীর চোখে জল ছলছল করছিল।···তুই বল বাছা, দিনরাত্তির

কি এই পাগলামি ভালো লাগে! জেবনে এমনটি দেখি নাই রে ঘণ্টা, দেখি নাই। বড় পাপের মধ্যে বাস কত্তে হচ্ছে—আমার তরাস হয়, বড্ড তরাস হয়। হতাশভাবে সে মাথা নেড়ে চুপ করল

আমি এখনই বেরোব। চাট্টি খেতে দাও।

খা। চান করবি না?

নাঃ।

গোগ্রাসে ভাত গিলছিল ঘণ্টা। পরনে হাফপ্যাণ্ট, গায়ে গেঞ্জী, কাঁধে শার্ট ঝুলিয়েই খেতে বসেছিল সে। বাসিনী ফিসফিস করে কথা বলছিল। …বিপদে পড়লে যে গেরামে ফিরবে, পায়ে দাঁড়াবার মাটিটুকুও রাখেনি লীলারাণী। হা যৈবন যন্তনা, হা বুদ্ধিভেরম! একটুও বুঝলে না গো!… তা ঘণ্টা, তুই আগে যা। আম্মো যাবো। হ্যাঁ, আম্মো। এখানে মন মানে না রে বাছা।…বড় দুঃখে বাসিনী বলল, তুই যে আমাকে ঠাট্টা করে বাগানপাড়ার মাসি বলিস ঘণ্টা, আমি তাই হয়ে আছি রে! আম্মো পালাব।

ঘণ্টা কোঁৎ করে একটা গ্রাস গিলে বলল, তা দেখ বেপারটা—বললাম যে গেরামে যাবো, শুনে বাধাটি দিলে? বারণ কল্লে, তুই ক্যানে যাবি? সে নীলা আর নাই, বুয়েছ কথাটা? এ-নীলা এখন অন্য-নীলা।

বাসিনী আরও চাপা স্বরে মন্তব্য করল, কত লীলে না দেখাবে লীলা-রাণী! ধন্যি মেয়ে বাবা। বুঝলি ঘণ্টে, আমার পেটের হলে দিতাম পটাপট চাপড় দুগালে। ধরতাম কণ্ঠাটা কষে…!

রাক্কুসীর মত দেখাচ্ছিল বাসিনীকে।

ঘণ্টা একসময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠল। কোণা হাতড়ে একটা ঝোলা আর সুটকেস আনল। তারপর বলল, তাহলে আসি।

বাসিনী গলা ছেড়ে কাঁদবার মত ডাকছিল, অ দিদিঠাকরান অই গো, ঘণ্টে সত্যিসত্যি বাড়ি যাচ্ছে। বলি, উঠে এসে কিছু বলবে না কী।

লীলার সাড়া পাওয়া গেল না।

বাসিনী ঘরে চোর ঢোকার মত চেঁচাচ্ছিল। ঘণ্টা ধমকাল।…মিছেমিছি চেঁচিও না তো। কার দায় পড়েচে আমাকে আটকাতে। সবায় বানের

জলে ভেসে এসেছে বলে আমি তো আসিনি। রাগদুঃখ, আমারও আছে, হ্যাঁ।

দরজায় পা বাড়াতেই সে শুনল লীলা তাকে ডাকছে : ঘণ্টা!

ঘণ্টা মুখ ফেরাল।

কোথায় যাচ্ছিস?

গেরামে।

এদিকে আয়। কঠোর মুখে লীলা আদেশ করছিল তাকে।

আমাকে ক্ষেমা দাও দিদি।

কেন যাবি তুই?

আমার ভালো লাগে না।

লীলা কয়েক পা এগিয়ে এল। হঠাৎ তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল। ঘণ্টা, আমাকে ফেলে পালিয়ে যাবি?

আমি তুশ্চ মনিষ্যি দিদি। আমার সাধ্যি কতটুকুন?

লীলা ফের কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাসিনী ছুটে গিয়ে ওর কাঁধে থাপ্পড় মেরেছে। হতভাগা ড্যাকরা, বুনো পাপিষ্ঠ, ফাজলেমির জায়গা পাওনি? সবার সঙ্গে মস্করা। মেরে ভরা গাঙে ভাসিয়ে দোব।

হিড়হিড় করে টেনে আনল বাসিনী। ঘণ্টা নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকল। লীলা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, ঘণ্টা, যদি কখনও যেতে হয়, আমিও সঙ্গে যাব।

ঘণ্টা মুখ তুলল। তার মুখে রঙ ধরছিল ক্রমশ। মোটা দাঁতগুলো বেরিয়ে আসছিল। একটা বিচিত্র নিঃশব্দ হাসির মধ্যে সে লীলার প্রতিশ্রুতিটা বরণ করে নিচ্ছিল। সেই অবসরে বাসিনী তার হাত থেকে সুটকেস আর ঝোলাটা কেড়ে নিয়ে গেল। নিঃশব্দে একটা গাঁট্টাও মেরে গেল মাথায়।

লীলা ডাকল, এদিকে আয় ঘণ্টা।

লীলার পিছনে অনুগত শান্ত জানোয়ারের মত ঘণ্টা ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। বিছানায় মাথার কাছে লীলার ব্যাগটা পড়ে রয়েছে। ব্যাগ খুলে আস্ত একটা পাঁচটাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিয়ে লীলা বলল,

মন খারাপ করিসনে। একটু ঘুরে আয় বাইরে। সিনেমা-টিনেমা দেখে আয়।

ঘণ্টা একগাল হাসল। এত টাকা দিলে?

তোকে তো তেমন কিছু দিই নে। লীলা শান্ত চোখে তাকিয়ে বলল। এবার থেকে মাসে-মাসে কিছু মাইনেও পাবি।

মাসমাইনে? ঘণ্টা প্রায় নেচে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে।

হ্যাঁ।—

সত্যি বলতে কী, ঘণ্টার জীবনে এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পাড়াগাঁয়ে বড়বাড়িতে দুঃস্থা মেয়েরা একদিন কোলের শিশুটিকে নিয়ে আশ্রয় পায়। তারপর একদিন সেই শিশু বড় হয়ে ওঠে। সে-বাড়ির একজন মানুষ, প্রাণী কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাবের মত তাকে কাজে লাগানো হয়। বিনিময় দাবী করার কথা সে চিন্তা করতে শেখে না। তবে জীবদেহ একটা আছে তার—সেজন্যে যা যা দরকার, সে তো তাকে দিতে হয়। কঞ্জুস কলুও তার ঘানিযন্ত্রের পরিচর্যা করে তেলজল দিয়ে। ঘণ্টা এখন বড় হয়েছে। তার মা যেমন জানে ঘণ্টাও বুঝতে পারে—কর্ত্রী একদিন তার বিয়েও দেবে। ঘণ্টা ছেলেপুলের বাবা হবে। তখন ঘণ্টার জীবনে এক ভিন্ন দিন আসবে। কিছু জমিও পেতে পারে সে। ভিটে পেতে পারে একটুকরো। সেখানে ঘণ্টার বৌ আর ছেলেপুলেরা থাকবে। বড় হবে। ঘণ্টার তবু ছুটি নেই। চাকরান সম্পত্তির বদলে তার জীবনটা দাসখতে বাঁধা। ওই হরু কৈবর্তের মত।

অবশ্য কর্তার বদলে কর্ত্রী থাকলে—বিশেষ করে লীলারাণীর মত ঠাকরান থাকলে হরু কৈবর্তদের পোয়াবারো। বিদ্রোহ করা সহজ। মুক্তিও নাগালে মেলে।

ঘণ্টা বিদ্রোহ করবে না হরুর মত। ঘণ্টা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা যা ক্ষয় করে ফেলে, তা এখনও তার সামনে দেখা দেয়নি। হয়ত তা একধরনের ঘুণপোকা। ঘণ্টার জীবনে ঘুণপোকা এখনও আসেনি। এসে থাকলে সেটা বোঝবার মত অনুভূতিও তার নেই।

একটু পরেই ঘণ্টা চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল। শহর কেনবার দুরন্ত সাধ

মিটিয়ে নেবে যতটা পারে।

সে পথে দাঁড়িয়ে চিরুনী বের করে চুল আঁচড়ে নিল। সামনের দোকানে একখিলি পান কিনে গালে পুরল। সিগ্রেট ধরাল। তারপর বেশ আমেজে চলতে থাকল। ধুতি পরে এলেই ভাল হত। থাক্।

কোথায় যাবে, ঘণ্টা জানে না। অথচ পকেটে কিছু আশাতীত টাকা পয়সা। কোথাও যেতে হবে। কিছু একটা করতেই হবে। অস্থির ঘণ্টা টকিবাজীব গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে ছবি দেখতে থাকল। আকাশ-জোড়া ছবিতে প্রকাণ্ড সব মানুষ—এবং মেয়েমানুষ দেখছিল সে। এইসব ছবি অজস্রবার সে দেখেছে। টকিবাজীও দুএকবার দেখেছে—কিন্তু বুঝতে পারে নি। চোখ জ্বালা করেছে। অস্বস্তি লেগেছে। চারপাশের মানুষ দেখেছে সে অবাক চোখে। চুপচাপ সব বসে আছে—কী পাচ্ছে কে জানে! ছবির মানুষ দেখে কী সুখ পায় এরা? হ্যাঁ, হত যদি এটা কেষ্ট যাত্রাব আসর--রাধার দিকে চেয়ে-চেয়ে তুমি টেরই পেতে না, আসলে ওটা আস্ত একটা পুরুষমানুষ। কেষ্টযাত্রা কেন—রাণীচকের মজুমদার মশায়ের যাত্রাদলের আসরে জ্যান্ত রাজকন্যাদের দেখলে কতরকম স্বপ্ন তোমাকে পিছনে তাড়া করে নিয়ে যেত।···ঘণ্ট স্বপ্না দেখত রাজকন্যাদের—তাঁরা পুরুষমানুষ। হোক পুরুষমানুষ! বড্ড জ্যান্ত সেইসব রাজকন্যারা।

ছবি ঘণ্টার ভালো লাগে না। লীলা সিনেমা দেখতে বলেছে। সিনেমাও সে দেখবে না। কিন্তু ছবিতে, যাই বলো বাপু, পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষগুলো দেখতে ভারী সোন্দর। এমন চেহারা কি সত্যিসত্যি থাকতে আছে?

তার ঠাকরান অবশ্যি দারুণ সোন্দর। তেনার কাছে যারা-যারা সব আসে, তারাও সোন্দর। এবং এই শহরে অনেক সোন্দর মেয়েমানুষ হেঁটে যায়, রিকশো চেপে যায়, গাড়িতে যায়।

পাগল, পাগল! ওরা ছবির মত ততটা সোন্দর নয়। দেখ না ওই মেয়েটাকে—আকাশ থেকে চোখে ঝিলিক দিচ্ছে। ভারী বেহায়া রে বাবা। বুকের দিকে তাকাতে গা ছমছম করে। উদোম স্তনটা বরং

পুতনা রাক্ষসীর হলেই মানাত।

মেয়েদের নগ্ন বুক পাড়াগাঁয়ে অনেক দেখেছে ঘণ্টা। সে-বুক আর এ বুক? পাগল হয়েছ তুমি? ছুঁলে তোমার হাতে ছ্যাঁকা লাগবে বলে দিচ্ছি। সাবধান! ধবলপোড়া হয়ে যাবে একেবারে। হুঁ হুঁ বাবা, যা তা জিনিস নয়…

ফিকফিক করে হাসতে হাসতে ঘণ্টা পিছিয়ে-পিছিয়ে রাস্তার ওপারে চলে গেল। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকল ছবিটা। মা কালীর দিব্যি, জ্যান্ত হলে বেশ মজাই হত!

আরে ইয়ার,-দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে বেশ হাসছ দেখি যে!

ঘণ্টা মুখ ফেরাল। সেই রিকশোওলাটা। অল্পস্বল্প আলাপ আছে মাত্র। রিকশোটা একপাশে দাঁড় করিয়ে সীটে পা তুলে হেলান দিয়েছে গদীতে। রোগা কাকের মত ঝিমোচ্ছে। গুঁফো রিকশোওলাটাকে বেশ ভাল লাগে ঘণ্টার। যেচে পড়ে আলাপ করে। পথে কখনও দেখলে একটু হেসে ঘাড় দুলিয়ে যায়।

ঘণ্টা কাছে গেল।…বসে আছো দেখছি। ভাড়া বইছ না আজ?

না রে দাদা, জিরোচ্ছি।

এমন অল্পস্বল্প মুখচেনা বা আলাপ অনেক লোকের সঙ্গেই হয়েছে ঘণ্টার। কিন্তু শহরের লোকগুলোকে সবসময় তার মতলববাজ মনে হয়। তুখোড় বেহায়া লাগে। রূপপুরে তুখোড় মাতাল রসিক প্রকৃতির অনেক লোক অবশ্যি আছে। কিন্তু তারা খুব আপনজন। এরা বড় দূরের মানুষ।

তবে এ রিকশোওলাটা একটু অন্যরকমের ঘণ্টার খারাপ লাগে না কথা বলতে। সে সীটে হাত রাখতেই পা তুলে নিল রিকশোওলা। ঘণ্টা বলল, হ্যাঁ গা, আজ কত কামালে?

ছেড়ে দাও ইয়ার! রিকশোওলা হাফ-প্যাণ্টের পকেট থেকে কৌটো বের করল। শয়তানের চাক্কা ঠেললে বুঝতে, কী চিজের পাল্লায় পড়েছি। সুখ নেই রে দাদা…লাও, বিড়ি খাও।

বন্ধুতার প্রতীক বিড়িটা খুব যত্ন করে নিল ঘণ্টা। সিগ্রেটটা ফেলে

দিল। রিকশোওলা যেন বড় স্নেহে জ্বলন্ত কাঠিটা দুহাতের তালুর ভিতর রেখে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে।

খুব ভালো লাগছিল ঘণ্টার। এ বয়সে আর এই বিদেশে বন্ধু-বান্ধব না হলে মানুষ বাঁচে না। সে হাসছিল।···আমার বড় ইচ্ছে করে রিকশো চালাতে। শিখিয়ে দেবে? বলব দিদিঠাকরানকে একখানা কিনতে। দেবে বৈকি। খুব ভালো মেয়ে-মানুষ উনি।···

খবর্দার, খবর্দার! ও চেষ্টাটি করো না। লাং ফুটো হয়ে যাবে! রিকশোওলা বুকে তর্জনী সংকেত করল।···আরে ইয়ার, তুমি তো বড় জায়গায় আছো। ওই বাড়িতে, তাই না?

ঘণ্টা মাথা নাড়ল।

বুঝেছি। দেখেই মালুম হয়, খুব বড়লোক-টোকের মেয়ে হবে। তুমি বুঝি গেরাম থেকে এয়েছ ওনার বাড়ি? এবার ঘণ্টা লীলার কথা না বলে পারে না। রূপপুরের আদ্যোপান্ত বর্ণনাও করতে হয় তাকে। তারপর সে ইসমাইল রিকশোওলার রিকশো চেপে শহর প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়েছে। আজ তার ছুটির দিন। ইসমাইল বলছিল, গেরাম ছেড়ে শহরে এসেছ। মৌজ করো এনতার। শয়তানের চাক্কায় চেপে কাঁহা কাঁহা ঘোর। আমি শালা ইসমাইল, আমিও একদিন গেরামে ছিলাম হে ইয়ার। হালচাষ করতাম। সে কি আজকের কথা?···তবে দোস্ত, গেরামে থাকলে আমাকে ভিক্ষে করতে হত। বলছি বটে শয়তানের চাক্কা—এই শালাই আমাকে বাঁচিয়েছে জানে। হ্যাঁ, এ আমার জানের দোস্ত। চালাও বনবন শনশন···

সতেরো

মাঝে মাঝে সুখেন কলারে টাই চড়ায়! ডাঁটের ক্ষেত্র হলে চেহারা যা হয়, তা মোক্ষম। এমনিতেই স্বাস্থ্যটা ভালো হয়েছে—নধর আর ডগডগে। তবে ভুঁড়ি গজানোর লক্ষণ নেই। ছিপছিপে ডাঁটালো গড়নটি থেকেই গেছে। মুখের পোড়-খাওয়া চামড়া অনেক যত্নে স্বাভাবিক

হয়েছিল। এখন যে নিটোল লালিত্যটুকু তার বয়স আড়াল করে আছে, তা সে জানে, অ্যালকোহলিক ফ্যাট। গালের ওপর চোখের নীচে কালচে ছোপ তার সৌন্দর্যকে তো ব্যাহত করেনি ; উপরন্তু তার মুখকে দিয়েছে এক শান্ত বিষণ্ণতা। হয়ত মেয়েদের ওইটে ভারী পছন্দ। সুখেনের মনে হয়।

তোর ভুঁড়ি হচ্ছে না—এদিকে পাছাটি তো দেখি মাগীর মত।…তা হ্যাঁরে সুখেন, তোর ম্যারেজটা আর কদ্দূর ? মাগী লদকাচ্ছে না নাকি ? টলু বলছিল।…দেখ মাইরি, না ঝোলবার ইচ্ছে থাকলে দে না পটিয়ে আমার সঙ্গে। দেখি জগা-লালা-বম্বারা তোর কী ক্ষতিটা করে। এই সুখেন, দিবি ?…তুই শালা একটা তিলে খচ্চর মাল। আমি চিনি না ?

সুখেন টাই-নটে আঙুল রেখে স্থির দাঁড়িয়ে ছিল। মুচকি মুচকি হাসছিল। অন্য হাতে চায়ের গ্লাস। একটা পা টুলে তুলে দিয়ে সে কাঠ-গোলার মালিকের সঙ্গে কথা বলছিল।

টলুর পয়সা আছে। ট্রাকও আছে কয়েকটা। শিলিগুড়ির ওদিকে তার এক দাদা আছে। সেই কাঠের কারবারে ওকে টেনেছিল। এখন সে লালে লাল হয়ে গেছে। বাড়ি করেছে। নিজের জন্যে একটা জিপও রেখেছে। সুখেন ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এ পারের শয়তানদের রাজা হচ্ছে এই টলু। পয়সাকড়ি থাকলে কেন যে এসব শয়তান নিয়ে মানুষ ঘাঁটাঘাটি করে, সুখেন বুঝতে পারে না। মেয়েমানুষ কতক্ষণ ভালো লাগে আর ? মদ খেয়ে আনন্দের কাল কতটুকু ? শুলেই সব ঘাম হয়ে বেরিয়ে যায়—উবে যায় সব দূষিত রক্ত। তারপর কিছুক্ষণ ভালো বা সৎ হয়ে জিরিয়ে নিতে হয়। ফের ওই, ফের লাগাও। হ্যাত্তেরি !

সুখেন মুচকি-মুচকি হাসছিল টলুদার কথা শুনে। ব্যাটা সবসময় মাতালের মত ভুল বকে যায়। না শুনলে ঘাড়ে ধরে শুনতে বাধ্য করে। তবে নাকি ঝোঁকের মুখে হ্যাঁ বললে আর না শোনবার ভয় নেই। সুখেন বলল, বেশি গলা চড়িও না টলুদা, বৌদি কান পেতে আছে।

টলু হাসল। হারামজাদা টলুর বৌটা দেখতে ভালো নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যটি

খাসা। কাঠগোলার লাগোয়া দোতলা বাড়ি। ছাদে উঠে পায়চারী করতেও দেখেছে তাকে। বোধহয় ওইরকম শান্ত ভালোমানুষ বা-তা চেহারার কিন্তু স্বাস্থ্যবতী একটি বৌ হলেই অনেক হারামজাদা আরো হারামজাদা হতে পারে। টলু হেসে একবার দোতালার দিকে উঁকি মেরেছে। তারপর ফের শুরু করেছে। এবার এক ফাঁকে ঘুম করে বলে ফেলতেই হবে। চায়ের তলানিটুকুও চুমুকে শেষ করে সুখেন টুলে গ্লাস রাখল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে বসল, শ' পাঁচেক টাকা দাও তো। কালপরশু পাবে।

টাকা? টলু ভুঁড়ি দুলিয়ে হেসে উঠল। ঘরে তোর টাকার মাল বসে আছে। তুই টাকা নিবি আমার কাছে? শালা জোচ্চোর আর বলবার কথা পেল না!

সুখেন বলল, বাজে কথা রাখো টলুদা। মেজাজ ভালো নেই। টাকার জন্যে বেরিয়েছি।

প্রেসের কাগজ কিনবি?...সরি, প্রেস তুই বেচে দিয়েছিস, বলছিলি। তবে কী হবে টাকা?

একটা দেনা শুধব। এখনই লোক আসবে আমার ওখানে।

টলু তক্তাপোষে গদীতে ঠেস দিয়ে বসেছিল। একপাশে কে একজন ভদ্রলোক। তার দিকে ঘুরে বলল, ঠিক আছে। দিন-সাতেক বাদে একবার খোঁজ নেবেন। আজ ট্রাক পাঠাচ্ছি। তবে মশাই, উনিশ ইঞ্চি বীম পাওয়া ভাগ্যের কথা। আপনার ওভারশীয়ারবাবুর মাথা খারাপ হয়েছে। একবার প্ল্যান-এস্টিমেটটা দেখাবেন তো আমাকে। দেখব, কী গোডাউন না জানি হবে!

ভদ্রলোক চলে গেলে সে সুখেনের দিকে ফিরল। হাসি মুখে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল। অবিশ্রান্ত করাতের শব্দ কানে আসছে। সামনের দেয়াল-ঘেরা খোলা জায়গায় অজস্র স্তূপীকৃত কাঠ পড়ে আছে। লোকেরা সেগুলো মাপছে। ওঠাচ্ছে। বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। কাজের ব্যস্ততায় ডুবে আছে কাঠেরগোলাটা।

সুখেন বলল, তাহলে দেবে না। বিশ্বাস হচ্ছে না আমাকে?

টলু হাতের ইসারায় পাশে বসতে বলল। সুখেন বসল না। টলু বলতে থাকল, দেখ ভাই সুখেন—তোমার সঙ্গে চেনাজানা হয়ত অনেক-দিনের। কিন্তু টাকাপয়সার কারবার কোনদিন করিনি। আমি জানি না…

কথা কাড়ল সুখেন, করেছ।

কবে করেছি?

আমার সঙ্গে ফ্লাস খেলেছ।

ফ্লাস! টলু হাসিতে ভেঙে পড়ল। সে তো আমি রাধারঘাটের জসীম কোচোয়ানের সঙ্গেও খেলেছি!

সুখেন ক্ষুব্ধমুখে বলল, জসীম কোচোয়ান আর আমি এক?

টলু গ্রাহ্য করল না।…ওসব ফালতো বাৎ ছোড়ো ইয়ার। এসো, খোকাখুকি খাবে তো বসে যাও—রাজী। কোন শালা তোমাকে ছুরি দেখিয়েছে বলো—তাকে শায়েস্তা করে দিতে রাজী। মাগীর দরকার হলে বলো—তাও রাজী। তবে দেখ মাণিক, এই ক্যাস-ক্যাস নিয়ে আরজি করলে আমি নাচার। এসব তোমার বৌদির—মাইরি, দুচোখের দিব্যি—পাইপয়সাটি গুনে দিতে হয় প্রতিদিন। আমি শালা এক নিমিত্ত মাত্র।…

অপমানবোধে অস্থির হয়ে সুখেন পা বাড়াল। টলু জগা নয়। এপারে-ওপারে তফাৎ আছে। জগার এত বেশি পয়সা নেই, কিন্তু সুখেনকে সে বিশ্বাস করে। হয়ত নিতান্ত ক্ষোভে বা রাগের বশে সুখেনের কাছে টাকার দাবী করেছে, কাল সে ভুলে যাবে ফের। পুলিশকে যা কিছু লাগবে, সে নিজেই দেবে। কিন্তু সে জন্যে নয়। টাকা তার অন্য কারণে দরকার।

জগদীশকে দয়ালু আর সুবিবেচক ভাবতে ভাবতে সুখেন পা বাড়াল। টলু টাকা ধার দেবার পাত্র নয়—সে অনুমান করতে পারেনি। জগদীশের কাছেই যাবে ফের। জগদীশ তার কাছে টাকা চেয়েছে। উল্টে সে-ই জগদীশের কাছে টাকা ধার চাইবে। টাকা তার ভীষণ দরকার। প্রেসের কাজের যা-সব পাওনা আছে এখানে ওখানে, সব কুড়িয়ে হয়ত অনেক বেশি হবে। কিন্তু আজ এখনই তো আর পাচ্ছে না। অনেক চেষ্টা

করেছে দুপুর থেকে। কোন সুবিধে হয়নি। সম্ভব-অসম্ভব অনেক জায়গায় হাত বাড়িয়েছে, মেলেনি। হঠাৎ টাকার দরকার হলে জগদীশ ছাড়া হয়ত কোথাও তেমন লোক তার নেই।

টলুকে চিনতে ভুল হয়েছিল। সুখেন কোন কথা না বলে বেরিয়ে এল।

খেয়া পেরিয়ে ওপারে গঙ্গার ধারে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সুখেন নিজের এই ব্যস্ততার প্রতি বিস্মিত হয়েছে।

কী করতে যাচ্ছে সে? কেন এই ব্যস্ততা, এই প্রয়োজনই বা কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারে তার? বারবার নতুন হতে গিয়ে অনেকটা রক্ত শুকিয়ে গেছে।

খুব ক্লান্তি আর হতাশার মধ্যে আস্তে আস্তে হাঁটছিল সে। এতদূরে এসেও কান থেকে কাঠগোলার করাতের ঘর্ঘর শব্দ হারিয়ে যায়নি। যেন মাথার ভিতর দিকে কোথাও একটা ইলেকট্রিক করাত একটানা শব্দ করে চলেছে। জীবনে কোনদিন এতখানি ব্যর্থ মনে হয়নি নিজেকে। যে ফুলে হাত ছুঁয়েছে, সোনার ফুল হয়ে উঠেছে তা। হয়ত একটু ধৈর্য থাকলে, একটুখানি শান্ত ও সহজ হতে পারলে, এখনও সোনার ফুল সম্ভব করতে পারে! কিন্তু নিষ্ঠা হারিয়ে গেলে সব হারায়। লীলাকে কনক ভেবেছিল। লীলা কনক নয়। তাকে সে চুষে বায়ুশূন্য করতে চেয়েছিল—মনে হচ্ছে, সেটা সম্ভব নয়। কারণ, লীলা আত্মসমর্পণ করতে পারে, কিন্তু আত্মদান করে না। রূপপুর ছেড়ে আসা অব্দি কতবার নির্জনে বা গভীর রাত্রে লীলাকে কাছে পেয়েছে। ভীষণ লোভে ভয়ঙ্কর ক্ষুধায় ছটফট করেছে সুখেন। কিন্তু ওই একবারই—সরকারী বনটার ভিতরে···মাত্র একবার! মাঝে মাঝে মাথা খারাপ হয়ে যায় তার একথা ভেবে। এ হার বড় নিদারুণ। লীলা যেন প্রথম পরিচয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেহের কালি দিয়ে ভালবাসার দলিলে সই করেছিল। ব্যস্, ওই অব্দি যথেষ্ট। পরেরটা এক রহস্য। প্রথম সইয়ের আঁকাবাঁকা রেখায় ফের একটু কালি বুলিয়ে স্পষ্ট করার চেষ্টা যেন। তাছাড়া কী? তবে কথাটা হচ্ছে—পুরুষমানুষ, অন্তত সুখেনের মত পুরুষমানুষকে ওই অল্পে তুষ্ট করাও যেমন যায় না,

তেমনি তাকে বশ মানিয়ে রাখাও কঠিন। ধরা যাক, (বিয়ে না হলেও) প্রতি রাত্রে লীলা সুখেনের পাশে শুয়ে থাকছে—কিংবা যখন খুশী…

হতাশার মধ্যেও ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটেছিল সুখেনের। যখন খুশী দেহগত ব্যাপারে লিপ্ত না হওয়াতে অবশ্য লীলার যাই হোক, সুখেনের কিছুটা লাভ হয়েছে। যোগাযোগটা এতদিন টি'কে আছে। মোহ বেড়েছে তার। বেড়েছে তার প্রমাণ, বিয়ে করতে চেয়েছে লীলাকে। সংসারের বা ঘর-কন্নার অল্পসল্প সাধ নানা ভাবনার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছিল কিছুদিন থেকে।

নাঃ, লীলা কামকুপিতা মেয়ে নয়! শচী শিবানীর জন্যে বলে, ছুঁড়িটার মাথায় কীট আছে—কীট মানে পোকা। কামপোকা। দাঁতে কুটকুট করে মগজ কামড়ালে ও ছটফট করে বেড়ায়। হুকুম পেলে বাপের সামনেই ঝাঁপ দেয়, নয়ত তুবড়ির মত ছর্‌ছরিয়ে জ্বলে।

শচীটা বলে ভাল। সে লীলাকে দেখেছে দু-একবার। সে বলে, সুখেন্দ্র, তোমার লীলারাণী বড় সহজ মাল নয় বাবা, সাবধান। অজগর বলা ভুল—অজগর পেলেই গেলে। জিরোয়, হজম করে, ফের গেলে। কিন্তু যারা একবার খেয়ে সারাদিন জাবর কাটে, তাঁদের গরু বলবি বল্‌—কিন্তু গরুরও আবার মাথায় দুটো শিঙ থাকে। মাইণ্ড ছাট। তবে হ্যাঁ, দুধ দেয়!

শচী যা খুশি বলুক, ইদানীং সুখেন সত্যি সত্যি ভালোমানুষ হবার তাগিদ টের পাচ্ছিল। শিবানী-টিবানী বিয়ের পর পাত্তা পেত না সুখেনের কাছে। প্রেসটা যত্ন করে চালাত। গাফিলতি করে ভীষণ লোকসানের মুখে পড়ে যাচ্ছে—লীলা এখনও জানে না। সামনের মাসে ক'দিন পরেই লোকজনের মাইনে দিতে হলে লীলার ব্যাগ থেকে টাকা বের করতে হবে।

সে যা হয় হোক গে, লীলা বুঝবে! কিন্তু সুখেন ঠকে এল এতদিন। রক্তে খিদে নিয়ে ঘুরল। অনুযোগে বাড়াবাড়ি করল না, কারণ বিয়ে তো হবেই একদিন। তখন লীলা বৌ হয়ে যাবে। বৌ হলে স্বামীকে তো ইহকাল

পরকাল সবটুকুই দিতে হয়—এ দেশের মেয়েরা তা জানে। সানুরাগে পালন করে সেটা।

সরকারী বনের সেই (চড খাওয়া) গাছটার দিকে তাকাতে তাকাতে সুখেন দ্রুত হেঁটে গেল। বাঁধে ওঠবার সময় দেখল রিকশোয় রমা আর লীলাকে। ওরা এদিকে তাকাল না। রিকশোটা অবশ্য আস্তে আস্তে গড়াচ্ছিল। পিছিয়ে এসে একটুখানি অপেক্ষা করার পর সুখেন ফের পা বাড়াল।

বড্ড হার হয়ে যাচ্ছে। এক সুন্দর মনোরম লোনার ফুল তার যাদুকর হাতের ছোঁয়ায় ফুটেছিল। সে যখন এ শহরে থাকবে না, তখনও ফুলটা ফুটে থাকবে। ওখানে সতুব দাড়ি ঘাস হবে। এদিকে সুখেন আফশোষে একটা একটা আজেবাজে মেয়ের দেহ নিয়ে ভাগাড়ের হ্যাংলা কুকুরের মত মুখ কাত করে দাঁত ছরকুটে শরীর নাড়া দেবে! পাগল ঢিল ছুড়বে নির্ঘাৎ। এ শহরে এক পাগল আছে। সুখেন দেখেছে, কুকুরদের খেতে দেখলেই ব্যাটা ঢিল ছোঁড়ে। আনন্দবাবুর একটা টেরিয়ার আছে। একদিন আনন্দবাবু তার শেকল নিয়ে পথে বেরিয়েছেন, এমন সময় পাগলটার চোখে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ অনুসরণ করে একটা বিস্কুট কিনে তাব সামনে ফেলে দিয়েছিল সে। পাগলেব কাণ্ড। টেরিয়ারটা শুঁকল। কিন্তু মুখে নিল না। পাগল গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে মন্তব্য করছিল—এর বাবা-ঠাকুরদাও কুকুর নয়।

ঢিল ছোঁড়বার সুযোগ না পেয়ে পাগলটা সেদিন দুঃখিত হয়েছিল। সুখেনের কাছে এসে বলেছিল, কুকুরের মত দেখতে—অথচ কুকুর নয়। খেতে চায় না গা!

হো হো করে হেসে ফেলল সুখেন। পরমুহূর্তেই অবাক হল সে। সেও পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো! লম্বা লম্বা পা ফেলে হাসপাতাল আর জেলখানার পাশ ঘুরে প্যারেড গ্রাউণ্ড পেরিয়ে সোজা জগদীশের দোকানে পৌঁছল সে।

দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। ব্যাপার কী? সন্ধ্যের মুখে এখন চারপাশে মাছির মত ভন ভন করছে লোকজন। জগদীশ না থাকলেও তার লোক

আছে। শিবানী আছে। তারা চায়ের জল চড়ায়। আড্ডা মশগুল রাখে।

দোকানের পিছনে জগদীশের ঘরকন্না। দরমার পাঁচিল খিড়কি শোবার ঘর রান্নার ঘর। অবশ্যি ঘরগুলোর করগেট শেডে তৈরী চাল… দেয়ালও দরমাবেড়ার। জগদীশ শোয় ছোট্ট বারান্দায় খাটিয়া পেতে। শীতের সময় চটের পর্দা ফেলে দেয় প্রতি রাত্রে। নেশাখোর মানুষের ঘুম। শুলেই রাতটা কেটে যায় যেখানে-সেখানে। শিবানী ঘরেই শোয়। একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড টেবিলফ্যান আছে দরজার পাশে। ভিতরে অনেকবার গিয়ে বসেছে সুখেন। তক্তাপোষে গদীটাও বেশ পুরু। সুন্দর বেডকভারটা তুললে কিন্তু ঘেন্না পাবার কথা। শিবানীর ভ্রূক্ষেপ নেই— জগদীশ বলে, শ্মশান থেকে কুড়িয়ে এনেছি তোষকটা। বিশ্বাস নেই ব্যাটাকে। ও মড়ার ওপরেও সুখে ঘুমোতে পটু। শিবানীও কতকটা তাই। তবে সুখেনের খারাপ লাগে। ইচ্ছে করলে আরো ভালো থাকতে পারে জগদীশ। থাকে না। ওদের বাপ-বেটি এক অদ্ভুত মাণিকজোড় যেন। সাজলে-গুজলে শিবানীকে জ্যান্ত পরী না হোক পটের পরীও দেখাবে। অথচ সাজগোজ করতে দেখা যায় না কোনদিন। বড়জোর কপালে একটা টিপ, একরাশ অমার্জিত স্নো-পাউডার, একটা সস্তা দামের রঙীন শাড়ি—ব্যস! দাঁত মাজে কি না বলা মুশকিল। সুখেন জানে, কোন কোন মেয়ে দাঁত না মাজলেও মুখে গন্ধ থাকে না। বরং এক ধরনের সুগন্ধ তার শ্বাসপ্রশ্বাসে স্বাভাবিকভাবেই যেন ছড়াতে থাকে। শিবানীকে অবশ্য স্নান করতে সে দেখেছে। সাবান বড়জোর মুখ আর কাঁধের কাছে ঘষতে দেখেছে। স্নান শিবানী বাড়ির ওই ঘুপটি উঠোন-টুকুতেই করে। ওপরে ওপাশের পুরানো মস্ত শিরীষের ডালপালা আর ছায়ার ঘনবুনোটি। এখানে সূর্যের আলো কখনো আসে না। অনবরত ছায়ার মধ্যে থাকবার ফলেই হয়তো শিবানীকে এক রকম ফরসা দেখায়।

খিড়কি খোলা ছিল। শিবানী ওখানে দাঁড়িয়ে অদূরে সরকারী কোয়ার্টারের সামনে ছেলেদের ফুটবল নিয়ে ছোটাছুটি দেখছিল। সুখেনকে দেখে সে যেন চমকে উঠল। পরক্ষণে পিছিয়ে বাড়ি ঢুকল।

তার এ ভঙ্গীতে সুখেনের প্রতি প্রশ্রয় ছিল।

সুখেন দরজাটা বন্ধ করে বলল, ব্যাপার কী?

শিবানীর মুখটা থমথম করছে। চোখে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। চাপা গলায় সে বলল, কোন্ পথে এলে তুমি?

কেন—প্যারেড গ্রাউণ্ড হয়ে।

তোমাকে পুলিশ খুঁজছে।

সুখেন হতভম্ব হয়ে গেছে। কোন কথা বলতে পারল না।

শিবানী রুদ্ধশ্বাসে বলল, ঘণ্টা দুই তিন হবে, বাবাকে এ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। খবর পেলাম, লালুকে ধরতে পারে নি। ওর স্কুটারটা সীজ করেছে বাড়ি থেকে। আর বম্বা···

সুখেন আরো ঘাবড়ে গিয়ে বলল, বম্বাকেও ধরেছে নাকি?

না। বম্বা এসেছিল একটু আগে। আমি দরজা খুলি নি। তোমাকে খুঁজছিল।

সুখেন বিকৃতমুখে বলল, শালা মহাপুরুষ! আমাকে তার কী দরকার? আর এখানেই বা আমাকে খুঁজতে আসবে কেন?

শিবানী বলল, এমন কাণ্ড আগেও হয়েছে। এ মিটে যাবে। আমাদের লোক গেছে পিছনে পিছনে। কিন্তু তুমি কী করবে?

এই বলে একটু হাসলও শিবানী। সুখেন চিন্তিত মুখে বলল, তাহলে প্রেসে বা লীলার ওখানেও খুঁজেছে আমাকে। এখানে আসে নি?

শিবানী কটাক্ষ হানল।···এখানে আসবে তোমার খোঁজে? পুলিশের বম্বার মত মোটা মাথা নয়।

সুখেন ওর হাতটা ধরে টানল। তাহলে কিছুক্ষণ এখানেই কাটাতে হবে। রাত বেশি না হলে বেরোতে সাহস হচ্ছে না। এসো, ঘরে গিয়ে বসি। উঃ, না জেনে বাঘের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম!

শিবানী পা বাড়িয়ে বলল, বসতে আপত্তি নেই। কিন্তু বাবার যদি এখনই জামিন হয়ে যায়—এসে তোমাকে দেখবে এখানে। দুজনেরই মাথা যাবে।

ঘরে ঢুকে তক্তাপোষে পা ঝুলিয়ে বালিশে হেলান দিল সুখেন।

বলল, যা হয় হোক। আর ভালো লাগে না।

শিবানী এক পাশে বসে বলল, সায়েব সেজে কোথায় বেরিয়েছ?

তোমার কাছে।

মেলা বকো না। মাথা যাবে, বলেছি না। বাবা টাকা চেয়েছিল, দিয়েছ?

ভাবছি তোমার বাবার কাছেই ধার করব আজ। শ' পাঁচেক টাকার বড্ড দরকার।

কেন—তোমার রাণী থাকতে টাকার অভাব?

সুখেন ওর হাত ধরে কাছে টেনে বলল, আর যেই করুক, তুমি ওর হিংসে করো না শিবি। তুমি তো জানো, কেন ওর সঙ্গে মিশতে হয়।

একটু সরবার চেষ্টা করে শিবানী বলল, কিন্তু দুদিন বাদেই বউ করছ—বিয়ের মন্ত্র পড়তে যাচ্ছ। যাও, চালাকি করো না।

মুখটা একটু এগিয়ে শিবানীর নাকের কাছে রেখে সুখেন বলল, ওটা চাল। তুমি—পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই তো জান, আমি কী, কী চাই, কী পছন্দ করি। আমার নাড়ীনক্ষত্র তোমার জানা। মিথ্যে বলছি?

শিবানী জানুর ওপর শাড়ির পাড়টা আঙুলে জড়াচ্ছিল। একবার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল মাত্র। কথা বলল না।

বিয়ে করা অবশ্য ভারী দরকার আমার। যে ছেলেটি রান্না করে, কদিন থেকে সে আসছে না। হোটেলে খেতে হচ্ছে। বলবে, লীলার ওখানে খেলেই হয়।···অসম্ভব। আমার ওখানে একটা মানমর্যাদা আছে—সে তো বুঝতেই পারছ।

আছে নাকি? শিবানী ফের কটাক্ষ হানল।

তোমার কাছে আমি খুব কাছের মানুষ। ওখানে তো সেটা হতে পারি নি।···হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কী বলছিলাম যেন?

বিয়ের কথা।

দুজনে অনুচ্চ অথচ যথেষ্ট হাসল এক সঙ্গে। তারপর সুখেন বলল, খাওয়া-দাওয়ার জন্যে তো বটেই, আরো নানা ব্যাপারে বিয়ে আমার মাথায় চড়ে গেছে। না নামালেই নয়।

নানা ব্যাপার—সেটা কি তোমার মত মানুষের ভাগ্যে জোটে না ?

অসভ্য ! সুখেন ওর গালে ঠোনা মারল।

তাছাড়া আর কী কী চাও বলো, হিসেব করে মিলিয়ে দিচ্ছি।

ঘরকন্না কাকে বলে জানো ?

তুমি ঘরকন্না করবে ? শিবানী ওর অগোছাল মাথাটা সুখেনের চিবুকে ঘষে দিল।…ও তোমার দ্বারা হবে না।

কেন মদ খাই বলে ? তোমাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করি বলে ?

ধর তাই। দুপুর রাত্রে মাতাল হয়ে বাড়ি ঢুকবে। ঘুমন্ত বউ বেচারা উঠে দরজা খুলবে। মুখে মদের বিচ্ছিরি গন্ধ পাবে। বিছানায় বমি করবে। তাছাড়া সে বেচারারও তো একটা ইচ্ছে-টিচ্ছে রয়েছে। তুমি কোন মেয়ের সঙ্গে ফুর্তি করে এদিকে মরা মাছটি হয়ে শুতে গেলে তার পাশে। তখন তার কেমন লাগে ?

দারুণ ! সুখেন হাততালির ভঙ্গী কবল। পরক্ষণে চুপসে যাওয়া স্বরে বলল, পিছনে পুলিশ লেগেছে, এদিকে আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করছি—হ্যাত্তেরি ! আমার কিছু ভালো লাগে না !

শিবানী উঠে দাঁড়াল। আর দেরী করো না। বাবা আসতেও পারে। লোক গেছে সঙ্গে। জামিন নিশ্চয় দেবে। বাবা তো এ ব্যাপারে ছিল না—সেটা তুমিই ভালো জানো। সন্দেহ করে ধরেছে।

সুখেন গুম হয়ে গেল। তারপর বলল, শালা বম্বাই নাম করে দিয়েছে। রাজসাক্ষী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াবে। শালার নামে জয়জয়কার পড়ে যাবে। কাগজে নামও ছাপা হবে নিশ্চয়।

তুমিই তো এ ঝামেলা বাধালে ! কেন বম্বার কাছে গিয়েছিলে ? আমি সব জানি।

শিবি, একবার—যাবার সময় একবার চুমু খাবো ?

খাও।

…তেঁতোমুখে দরজায় পা বাড়িয়ে হঠাৎ পিছন ফিরল সুখেন। এবং তেমনি হঠাৎ শিবানীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। পাগলের মত বলে উঠল, তোমার বাবা ঘরে নেই। দারুণ সুযোগ শিবি। পালাবে আমার

সঙ্গে? দুজনে কলকাতা কিংবা দূরে কোথাও চলে যাব। বিয়ে করব। সুখে ঘর বাঁধব। যাবে তুমি? এমন সুযোগ আর পাবে না। শিবি, এই শিবানী!

আস্তে আস্তে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল শিবানী। একটু হাসল। বলল, দেরী করো না। বাবা এসে পড়বে।

আর কোনদিন আমার মুখ দেখতে পাবে না শিবি। এই শেষ দেখা।

পিছনে সুখেন শিবানীর ফের একটা জবাব আশা করেছিল। শুনতে পেল না। বাইরে অন্ধকার আর আলোর সন্ধিকাল। আলো জ্বলতে সুরু করেছে। সরকারী কোয়ার্টারগুলোর পিছনে রেল স্টেশনের এপাশের বিরাট ময়দানে এসে দাঁড়াল সে। শিবানী ভোলবার মেয়ে নয়। যে কণ্ঠস্বরে যে ভঙ্গীতে সুখেনের মত পুরুষ ওই অসংবদ্ধ নাটকের পার্ট আওড়াচ্ছিল, অন্য মেয়ের হৃদয়বিদারণের পক্ষে তা যথেষ্টই। কিন্তু শিবানী অন্যজাতের মেয়ে। ঘুঘু।

পাঁচশো না হোক সুখেনের আশা ছিল, অন্তত কমপক্ষে শ'খানেক টাকাও বেরিয়ে আসবার সম্ভাবনা এতে না থেকে পারে না। জগদীশের টাকার বাক্স তার মেয়ের জিম্মাতেই থাকে। শিবানী তা বাড়াবার মেয়ে। টাকায় তা দিয়ে সে বরং বাচ্চা বের করতে জানে।

গলাটা ব্যথা করছে। এত সুন্দরভাবে কথাগুলো বলতে পারছিল—পিছনে পুলিশ বা জগদীশ—তা সত্ত্বেও এই প্ল্যান মাথায় খেলেছিল। মাথা আছে। তবে আজ গ্রহের মার চলেছে। সব চেষ্টাই বৃথা হবে।

হাঁটতে-হাঁটতে মধ্যময়দানে এসে ঘাসের উপর বসে পড়ল সুখেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে সে রুমাল বের করল। ঠোঁটদুটো বারকয় ঘষে নিল। কী করতে যাচ্ছে, ভাবতে থাকল।

কতক্ষণ আকাশপাতাল এলোমেলো চিন্তা করেছে হিসেব নেই, এক সময় সে দেখল ঘাসের নীচে স্যাঁতসেঁতে মাটি থাকায় তার প্যাণ্ট বেশ ভিজেছে। আণ্ডারওয়ার অব্দি চবচবে। ঠাণ্ডা লাগছে। সে উঠল। খ্রীষ্টান ক্রিমেটোরিয়াম লক্ষ্য করে চলতে লাগল।

আঠারো শতকে তৈরী এই ক্রিমেটোরিয়ামের পাঁচিলটা এখন কোথাও ধ্বসে পড়েছে, কোথাও ফাটল ধরেছে। তার এপাশে একটা খোয়াঢাকা সরু পথ। সেখানে দাঁড়ালে লীলার ঘরটা দেখা যায়। জানালায় পর্দা আছে। তাছাড়া একটুকরো সব্জীক্ষেত আর দোপাটি ফুলের ঝাড় থাকায় ভিতরটা স্পষ্ট নজরে পড়ে না। সুখেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সব্জীক্ষেতের কাছে এল। বেড়া পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল। পা টিপে টিপে জানালার কাছে গেল সে। পর্দার নীচে উঁকি দিল।

ছোট টেবিলে ঝুঁকে দুপাশে দুটি মেয়ে বসে আছে। কী সব লিখছে না হিসেব করছে। সামনেরটা লীলা। সুখেনের দিকে পিছনফেরা মেয়েটিকে মুখ না তোলা অব্দি সুখেন চিনতে পারল না। রমা কি? হ্যাঁ, রমাই।

লীলা তাহলে প্রেস জোর চালাবে। হাসি পেল সুখেনের। শঙ্কর উকিলের মুখটা তার মনে পড়ল। সে মনে মনে গাল দিল তাকে। শালা শনি! বিয়েতে নাকি অমত করেছিল উকিলমশায়। সাবধান করে দিয়েছে লীলাকে। উল্টে লীলা বলেছে, আমি নাবালিকা নই। সব বুঝি। শঙ্করজেঠাও সুযোগ পেয়ে আমায় কম গ্রাস করেন নি। রূপপুরে অর্ধেক জমি বেনামীতে উনি নিজেই কিনেছেন। কাকে আর বিশ্বাস করব!

লীলা নিজের মুখেই সুখেনকে এসব বলেছিল। শঙ্কর উকিল আজকাল লীলার বাড়ি আর আসে না। তাঁর বাড়ির মেয়েরাও আসে না। এক রকম ভালোই হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে যা হবার তা তো হয়েই গেছে। সুখেন নাক গলানোর সুযোগ পায় নি। অবশ্য বিয়ে করার দুরন্ত সাধই আসলে তাকে এমনি করে ডোবাল। কেন সে লীলার ওপর বেশ কিছুটা নিষ্ঠুর হতে পারল না? তাহলেই চলত। সুখেন এমন অসহায় হয়ে থাকত না।

পিছনে একটা অস্পষ্ট শব্দ-বেড়ার ওদিকে মচমচিয়ে কিছু আসবার, তারপর ঝোপ নাড়া দিয়ে ভারী জানোয়ার হাঁটবার মত; এবং পিছন ফিরেই কাঠ হয়েছে সুখেন।

অদূরে সদর রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে আলো রয়েছে। সুতরাং এখানে

অন্ধকার যথেষ্ট ঘন নয়। তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে কে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে। আঁতকে উঠে পালাতে যাচ্ছিল সুখেন—কিন্তু তক্ষুনি নাকে যে গন্ধের ঝাপটা লেগেছে তা তার পরিচিত।

সুতরাং এক পা বাড়িয়ে সুখেন একটু ঝুঁকল। ঘণ্টা।

ঘণ্টাও ঝুঁকল। চিনল। সুখেনবাবু।

দুজনেই লুকিয়ে বাড়ি ঢোকবার সুযোগ খুঁজছিল। দুটি মানুষই নিঃশেষে আত্মসমর্পণ ও পাপস্বীকারে তৈরী ছিল। কারণ, কর্ত্রীঠাকুরানীটি দুজনেরই ভাগ্যবিধাত্রী।

আর আসল কথা হচ্ছে—দুজনেই অপরাধী। একজন বিশ্বাসঘাতক অন্যজন আপাতদৃষ্টে ঘোর মাতাল। তাই পরস্পরকে চিনেও কোনরকম চেঁচিয়ে ওঠেনি ওরা। বেড়া ডিঙিয়ে বাইরে গেছে। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে পরস্পর মুখোমুখি তাকিয়ে প্রথমে একটু হেসেছে।

হাসিটা করুণই ছিল।

ঘণ্টার হাত ধরে সুখেন আরো অনেকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। এখানে রাস্তাটা বেঁকে জেলখানার পাশ দিয়ে গঙ্গার ধারে পৌঁছেছে। দুধারে বড় বড় শিরীষের গাছ থাকায় ছায়া যথেষ্ট আড়াল করছিল দুজনকে। এদিকটা স্বভাবত নির্জন। দক্ষিণে একটা প্রসারিত খাটাল, উত্তরে জেলখানার গেট। পশ্চিমের দিকে সামান্য কিছুটা হাঁটলে গঙ্গার বাঁধটা পড়ে—যার নীচে সমান্তরাল সরকারী বন।

এবার ঘণ্টা ফিক্‌ফিক্ করে হাসছিল। অবশ্য এ হাসি অপরাধীর পক্ষে যতটা শোভন, ততটাই—তার বেশি নয়। তাছাড়া নেশাও তার কম হয় নি। সে বলছিল, অব্যেস নাই দাদাবাবু, বোঝলেন? গেরামে থাকলে লুকিয়ে-চুরিয়ে দু-এক ঢোক খেতাম—সে কেবল জানত বাসিনী। কিন্তু বাসিনী যত বদ মেয়েমানুষই হোক, এসব কাণ্ড কানে তুলত না মাঠাকরাণের। মাঠাকরাণ মাতাল টাতাল এক্কেবারে সইতে পারতেন না। ইদিকে আপনার মশাই, দিদিঠাকরাণটি বড় কম নয়। বাসিনী না বললে কী হবে, উনি ঠিকই লাগিয়ে দিতেন চুপকথাটা। তারপরে কি না, অই হুকু, কান ধরে নে আয় তো মাতাল ছোঁড়াটাকে···আরে ব্বাস্

রে! বিস্তর পেহার সয়েছি দাদাবাবু। বুড়ি ছিল মাতালের যম্! তেনার মেয়েও তাই। সোতরাং, এ একটা সমিস্তে।

সুখেন লীলাকে কখনও বলে নি সে মদ খায়। মদমত্ত অবস্থায় লীলার কাছে কখনও যায় নি সে। এই রকম একটা অনুমান বরাবর তার ছিল। সিগ্রেটের গন্ধও লীলা সইতে পারে না।

ঘণ্টার কথা শুনে সে বলল, তাহলে ঘণ্টুবাবু, এবার বাড়ি ঢুকবে কেমন করে?

ঘণ্টা ভাবিত হয়ে মাথা চুলকোতে থাকল। সে স্পষ্টত টলছিল।··· ভেবেছিলাম, কোনরকমে পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে যাব, চুপিচুপি বাসিনীকেই গে ধরব। বাসিনী আমাকে লুকিয়ে রাখবে। দিদিঠাকরাণও মাতালের যম।

সুখেন বলল, তা সোনা, কোন ফুলে বসেছিলে মধু খেতে? ফুল চিনে গেছ এ্যাদ্দিনে?

ঘাট মানছি দাদাবাবু। ঘণ্টা যুক্ত-করে বলল। ফুলটুল নয় আজ্ঞে। ইসমাইল আমার সর্বনাশ করলে গো, বিষম সর্বনাশ! আমি এমন ছিলাম না।

ওরে বাবা, তাহলে মেয়েমানুষ-টানুষও হয়ে গেছে দেখছি। সুখেন ওর পেটে গুঁতিয়ে দিল।

ঘণ্টার জিভ বেরিয়ে গেল। ছায়ার মধ্যে বেরিয়ে আসা জিভটা বীভৎস দেখাচ্ছিল। জিভ কেটে দুহাত পিছিয়ে ঘণ্টা বলল, আজ্ঞে লা দাদাবাবু, উ নেশা আমার লাই। উসব কিনা আপনাদের বড়মানুষের সাজে। আমি একটা বলদ। আজ্ঞে হ্যাঁ, বলদ। দিদিঠাকরাণ ঠিকই বলেন, ঘণ্টা বলদ। তাই বাসিনীও বলে। সব্বায় বলে।

হঠাৎ সুখেনের সমস্ত মনটা লীলার প্রতি এক অভাবনীয় ঘৃণায় কটু হয়ে গেল। যেন পাশার ছক থেকে ছিটকে পড়ে সে আজ সারাটি বিকেল, বিকেল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত্রি এক উদ্দেশ্যহীন শূন্যতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—মাটি পাচ্ছে না। সেই শূন্যতা ভরে ঘৃণাটা জমছিল। সে বলল, হ্যাঁ গো ঘণ্টাবাবু, অ্যাদ্দিন দিদিঠাকরাণের ঘানিতে ঘুরে মরছ,

চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? বাগে পেলেই জিভ বাড়িয়ে দিও, বুঝেছ?

কথাটা বুঝতে পারল না ঘণ্টা। সে একটু ঝুঁকিয়ে দিল মুণ্ডটা। বলল, আজ্ঞে?

কোনদিন দিদিঠাকরাণকে ছুঁয়ে দেখেছ?

ঘণ্টার নেশা ছুটে গেল যেন। সে বলল, কথাটা ভালো লয় দাদাবাবু। আপনার সঙ্গে ওনার বে হবে।

সুখেন সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। এ ঘৃণা বা ক্রোধ ঘণ্টার কাছে প্রকাশ করার কোন মানে হয় না। রাতের গাড়িতে তার কলকাতা চলে যাবার ইচ্ছে ছিল। পকেটে কিছু টাকা থাকার বড্ড দরকার ছিল। কোথাও পেল না। এমন বিশ্রী সময় তার জীবনে কখনও আসেনি। হয়ত এর নামই ভাগ্যের মার। হয়ত আরো একটা দিন অপেক্ষা করলে টাকা সে কোথাও না-কোথাও পেয়ে যাবে। বরাবর যেমন পেয়েছে।

সে আড়ামোড়া ছেড়ে হাই তুলে তুড়ি দিল। তারপর বলল, তোমার দিদিঠাকরাণকে আমি বিয়ে করছি নে, ওকে বলে দিও কথাটা। আর···

সে কি গো? সব্বোনাশ! ঘণ্টার নেশা আরও কিছুটা কাটছিল।

সুখেন নির্বিকারভাবে বলল, ও একটা বেশ্যা।

আজ্ঞে!

ও যার-তার সঙ্গে যেখানে-সেখানে শুতে পারে।

হুঁ হুঁ!

ও তোমার পাশেও শুতে পারে। চেষ্টা করে দেখো।

হুঁ হুঁ!

থাম্ ব্যাটা ভূত! শুধু হুঁ হুঁ—যা বলছি, শুনতে পাচ্ছিস?

আজ্ঞে লা।···হ্যাঁ······

লীলারাণীকে তুই-ই বিয়ে করে ফ্যাল?

আজ্ঞে।···সব্বোনাশ······

চল, তোকে পাঁচিলে তুলে দিচ্ছি। ঝাঁপ দিয়ে পড়েই ওকে ধরবি। তারপর······

ঘণ্টা দুলে দুলে হাসছিল।···আমাকে ধরতে হবে না মশাই, মাতাল

দেখলে ভয়ে উনিই জড়িয়ে ধরবে। একবার কী হয়েছিল শোনেন। গেরামের বাইরে মা মনসার থানে মেলা বসেছে। দিদিঠাকরাণের পেথম বয়েস। পথে ওনাকে সঙ্গে নে আসছি। এক মাতাল দেখেই উনি আমাকে যে জড়ান জড়ালে, উঃ দাদাবাবু, আজও মনে পড়লে গা শিউরোয়!

কী হল?

হঠাৎ মাথা চেপে ধরে ঘন্টা বসে পড়েছে। বমি করছে। সুখেন সরে এল।

হন হন করে চলতে থাকল সে। কী করবে, কোথায় যাবে, ভাবতে পারছিল না সুখেন। কিছু একটা করে ফেলতেই হবে। যত জঘন্য হোক, কুৎসিত বা বীভৎস হোক, একটা অমানুষিক কাণ্ড করার জন্য তার রক্ত চনমন করছিল। যতবার মনে পড়ছিল, এই প্রথম একটি মেয়ে তাকে চড় মেরেছে, ততবার তার সারা শরীরের প্রতিটি রোমকূপে বিষদাঁত গজাচ্ছিল। এ শহরে এখন তার দাঁড়ানোর কোন মাটি নেই। কোন বিষয়সম্পদ নেই। বন্ধুতা শেষ। রক্ষাকবচ হারিয়ে গেছে। সে ফেরারী আসামী। কবছর আগের মত ফের সে ধুঁকতে ধুঁকতে চারপাশে তাকিয়ে একটা দাঁড়াবার মত জায়গা খুঁজছে।

বাঁধে এসে এতক্ষণে ফের তার মনে হল, হয়ত খুব ফেনিয়ে তুলেছে, সামান্য একটা ঘটনাকে। খুব বেশী করে ভাবছে। অকারণ মূল্য দিচ্ছে। কিন্তু লীলার কাছে যাওয়া কি ঠিক হবে? জানালা থেকে ফিরে এসেছে মাত্র। দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে হয়ত ভালোই হত।

অথচ আর অসম্ভব লাগে সেটা। লীলা তাকে চড় মারুক বা যাই করুক প্রশ্ন তা নিয়ে নয়। এত বেশি ঘৃণা প্রিয় মেয়েমানুষদের জন্য কোনদিনই জমে ওঠেনি তার মনে।

এ ঘৃণার উৎসে আছে একটা তীব্র দাসত্ববোধের প্রতিবাদ। ঘণ্টা বলদ, সুখেন বলদ নয়। সে নিজের মূল্যে নিজেকে নষ্ট করতে জানে না।। আর, নিজেকে নষ্ট হতে দেখেছিল বলেই সুধার ওষুধের শিশি দুটো অদলবদল করে রেখেছিল। মিকশ্চারের শিশি ভেবে সুধার অন্ধ হাত

তুলে নিয়েছিল মালিশের তেলের শিশিটা। না নিলেও পারত সুধা। ঠিক শিশিটার বদলে ভুল শিশিটা তাকে তবুও নিতে হয়েছিল। সুখেন সারাজীবন আঘাত খেয়েছে। মানুষের কিছু কিছু অভ্যাস বা রীতিপ্রকৃতি তার দারুণ চেনা আছে। লীলা এই সুধার কথা শুনেছে। শোনেনি চন্দ্রকান্তবাবুর কথা। চন্দ্রকান্তবাবু তার দূরসম্পর্কের মেসোমশাই ছিলেন। পয়সা-ওলা নিঃসঙ্গ এই বুড়োটা ছিল কৃপণদের শিরোমণি। সুখেনের আশা ছিল, অপুত্রক মেসো মরার আগে তার একটা ব্যবস্থা নির্ঘাৎ করে রেখেই যাবে। কিন্তু যমের হাত ধরবার আগে শয়তান বুড়োটা এক মধ্যযৌবনার হাত ধরে বসল। মেয়েটির নাম রাণু—সুখেন ডাকত রাণুমাসি বলে। সেই রাণুমাসিই প্রথম সুখেনকে নষ্ট করেছিল। সুখেনের বয়স তখন আঠারোর বেশি নয়।

রাণুমাসি ওপরের ঘরে সুখেনের সামনেই কাপড় বদলাত। শুধু সায়া আর কাঁচুলিপরা রাণুমাসির দেহটা দেখতে স্থূল আর নিটোল। সুখেনকে প্যাটপ্যাট করে তাকাতে দেখলে সে বলত, এই ছোঁড়া, কী হচ্ছে রে! চোখ বুজে থাক বলছি।

তুইতোকারি আর ছোঁড়া বুলি গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল সুখেনের। এবং সেই রাণুমাসি একদিন ঠাট্টার ছলে ওকে বুকে পিষে রাক্ষুসীর মত মারল। ওর তরুণ কচি দেহের নরম মাংস হাতড়ে প্রাণবীজে হাত ছোঁওয়াল।

বুড়োটা ছিল চালাক। সে বলত, অ্যাই সুখেন, সারাদিন ওপরের ঘরে শুয়ে না থেকে একটু ঘুরেফিরে বেড়াগে যা! লেখাপড়া তো কবে শিকেয় তুলেছিস, একটু ভাবনা হয় না ভবিষ্যতের?

সুখেন সোজা জবাব দিত, ভবিষ্যৎ তো তোমার হাতে।

বুড়ো হাসত জবাব শুনে। কোন মন্তব্য করত না।

অবশেষে রাণুমাসির ছেলে হল। কিন্তু বেশি বয়সে ছেলে হবার বিপদ থাকে। রাণুমাসি প্রসবের পরই মারা যায়। বুড়ো তার ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কত অসম্ভব কাণ্ড না করছিল! প্রথম ছুটো মাস একটা নার্সিং হোমে রাখল। তারপর আনল বাড়িতে। মাইনে-করা—

সারাক্ষণের ধাত্রী রাখল একজন। ছিপছিপে গড়ন, বড়বড় সরল চোখ শান্ত একটি মেয়ে। সীমা তার নাম। সীমার হাত ধরেছিল বুড়ো। সীমা বলে দিয়েছিল সুখেনকে। তবু সীমা বাড়ি ছেড়ে যায়নি। সে সুখেনের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। সীমা এখন কোথায় আছে কে জানে! মাঝে মাঝে মন কেমন করে ওঠে তাকে ভাবলে। ছমাস থাকার পর সীমা চলে যায়। যাবার সময় সে একটা ঠিকানা দিয়েছিল। কেঁদেছিল। সুখেন ঠিকানাটা ইচ্ছে করেই ছিঁড়ে ফেলেছিল। তার মন তখন তার ভবিষ্যতের দিকে মগ্ন। ছেলেবেলা থেকে দারিদ্র্য তাকে শুধু একটি জিনিসই শিখিয়েছিল—জীবনে বাঁচতে হলে বিষয়সম্পদটা ভারী জরুরি। সে বড়লোক হবে। তাকে বড়লোক হতেই হবে।

পুরো সাতটা বচ্ছর চন্দ্রকান্তবাবুর বাড়ি কেটেছিল সুখেনের। মহাজনী কারবার ছিল বুড়োর। শহরেই বড় একটা গদি ছিল। সুখেন গাধার মত খাটত দিনরাত্তির। তবু কোন আশা দেখছিল না। চুরি করতে তার হাত কেঁপেছে। তা না হলে শেষ অব্দি চুরিই করত। সে বুড়োর মৃত্যুর দিন গুনছিল। তার মৃত্যুতে কী লাভ হবে, সুখেন স্পষ্ট জানত না। তবু মনে হত, ও মলে নির্ঘাৎ একটা কিছু ঘটবে। শ্যামল মাত্র ছবছরের বাচ্চা। মাথা মোটা, পাঁকাটি শরীর--বিচিত্র একটা প্রাণী। মগজে গোবর ছাড়া কিছু নেই—সেটা সহজেই বোঝা যাচ্ছিল। একটা হাবাগোবা জড়ভরতের জন্ম দিয়ে তার মা রাণু মরে গেছে।

বড় দুঃখে হিংসায় ক্ষোভে ঈর্ষায় বা আক্রোশে তার দিকে তাকিয়ে থাকত সুখেন। অত ছোট্ট ছেলে—তার মাথায় জরির কাজকরা টুপি, ফিনফিনে আদ্দির পাজামা-পাঞ্জাবী, গলায় সোনার হার—বুড়ো রাজপুত্র সাজিয়ে রাখত তাকে। চোখের আড়াল করত না। সুখেনের ইচ্ছে করত, ওর সরু গলাটা টিপে ধরে। ঠেলে ফেলে দেয় ভরা গঙ্গায়। মাঝে মাঝে অমানুষিক এই সব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে-হতে সে ছটফট করে উঠত। তারপর ভয়ে হতাশায় ভেঙে পড়ত।

একদিন দুপুরে বুড়োর গদিতে চোরা অলঙ্কারের তল্লাসে পুলিশ

হানা দিয়েছিল। সুখেন এসে খবর দিতেই বুড়ো হন্তদন্ত ছুটল। শ্যামলের কথা বুঝি ভুলেই গিয়েছিল। তা না হলে সঙ্গে নিয়ে যেত অভ্যাসমত। সুখেন দেখল, হাফপ্যান্ট পরে খালি গায়ে শ্যামল উঠোনে খেলা করছে।

উঠোনের প্রান্তে পুরনো শ্যাওলাধরা পাঁচিল। তার গা ঘেঁষে মস্তো শিউলীগাছ। শরতকালে শিউলীর মরশুম। ঝরা ফুল কুড়োতে গিয়ে শ্যামল আঙুল তুলে গাছটা দেখাচ্ছিল…মামা ফুই।

সুখেন ধমকাল। ধুর ব্যাটা, এখন ফুল কোথা? রাত্তিরে ফুটবে।

শ্যামল কান্নাকাটি সুরু করেছিল।

সুখেন ওকে তুলে পাঁচিলের কাছে নিয়ে গেল। বলল, তুই ওঠ। উঠে পড় বাবা। আমার ভারে গাছ ভেঙে যাবে।

গাছে চড়বার আনন্দে শ্যামলের মাথার গোবর টগবগ করে ফুটছিল বুঝি। গাছটার কয়েকহাত দূরে পাঁচিলের পাশেই কুয়ো। কুয়োটা পুরনো আর অব্যবহার্য। ভিতরে অবিশ্যি জল ছিল—তবে পচা আর দুর্গন্ধ। গাছের পাতা খসে পড়ত নির্বিচারে। শ্যামলও অনেক খেলনা ছুঁড়ে ফেলত। বুড়ো ইদানীং কুয়োটা বুজিয়ে দেবার কথা বলত।

গাছ থেকে পাঁচিলে দাঁড়িয়ে শ্যামল ফুল পাড়ছিল। ফুল নয়—কুঁড়ি। আর সুখেন তাকে সাবাস দিচ্ছিল। বাঃ বাঃ, রিঙমাস্টার! বাহাদুর খেলোয়াড়!

শ্যামল তখন দুহাত ছেড়ে সত্যি-সত্যি খেলা দেখাচ্ছে। পাঁচিলে হাঁটছে টলতে টলতে। পাতা ছিঁড়ে ফেলছে। সুখেন চেঁচাল, এই হনুমান কলা খাবি? জয়-জগন্নাথ দেখতে যাবি!

ব্যস! শ্যামল এবার হনুমান হয়ে গেল। চারহাতে হাঁটবার মত পাঁচিলের সংকীর্ণ চূড়া ধরে সে এগোচ্ছিল, পিছিয়ে আসছিল। তৃতীয়বার সুখেন হাততালি দিয়ে চিৎকার করতেই সে কুয়োর কাছে এসে তার মধ্যে পাতা ছুঁড়তে একটু ঝুঁকল এবং অনিবার্যভাবে নীচে পড়ে গেল।……

তবু সুখেনের বরাত ফেরে নি।

শোকার্ত বুড়োর আয়ু যেন আরও বাড়ছিল। কিন্তু একটা ব্যাপারে সুখেন এবার নিশ্চিন্ত—ও মরে গেলে সবকিছুর মালিক সুখেনই হবে।

তর সইছিল না তার। এখন বয়স হয়েছে বোঝবার মত। এখন সে বুঝতে পারে. অত ব্যস্ততার দরকার ছিল না। অন্য কেউ হলে স্থির ধীর ও শান্ত মনে কাজ করে যেত। অনিবার্যকে আকস্মিক করে তুলতে চাইত না। কিন্তু সুখেনের মধ্যে একটা অদ্ভুত পোকা আছে যেন। সেটাই বরাবর তার সর্বনাশ করে আসছে।

কদিন থেকে চন্দ্রকান্তবাবুর শরীর ভাল ছিল না। গদির দিকে যেত না সে। সুখেনকেই পাঠাত। ছেলের মৃত্যুর ব্যাপারে সে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ পায় নি। কারণ, সুখেন একমাস নামমাত্র আহার করেছে। দিনরাত্তির কেঁদেছে শ্যামলের জন্যে। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে।

সুখেন নিজেও বুঝতে পেরেছিল, এটা আর ক্রমশ ভান হয়ে নেই। অভিনয় ক্রমশ সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মুখোশ হয়ে উঠেছে মুখের চামড়া। একি তার পাপবোধ? হয়ত তা ঠিক নয়—অন্য কিছু। তার বুক ভেঙে যাচ্ছিল একটা সরল বোকা অবোধ শিশুর কথা ভেবে। বড় মায়ায় সে নির্জনে ডুকরে কেঁদে উঠেছে। আহা, শ্যামল তার নিজের ছেলে হতেও তো পারে! আঠারো-উনিশে ছেলেপুলের বাপ হওয়া কি একান্তই অসম্ভব?…কিন্তু আমি…নিজের হাতে ওকে খুন করিনি! ও কেন অত বোকা ছিল? সুখেন নিজেকে সান্ত্বনা দিত।

এবং সুধার মৃত্যুর পর ঠিক এমনি করেই সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিল সে।

একদিন বিকেলে গদি থেকে হঠাৎ ফিরে সিঁড়ির নীচে থেকে প্রচণ্ড চিৎকার করছিল সুখেন—মেসোমশাই, মেসোমশাই, শিগগির আসুন, শিগগির! ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে!

কাণ্ড কিছুই হয় নি। এটা তার মাথায় হঠাৎ খেলেছিল মাত্র। একটা সহজ চান্স। কোন রিস্ক নেই, পরে একটু বকুনি খেত বড়জোর।

কিন্তু চন্দ্রকান্ত অসুস্থ শরীরে হাঁফাতে হাঁফাতে বেরিয়ে এল।

সিঁড়ির মুখে তাকে দেখে সুখেন ফের চেঁচিয়ে উঠেছিল, আগুন, আগুন !

তাড়াহুড়ো নামতে গিয়ে সেকেলে মস্তো উঁচু দোতলার সিঁড়িতে পা পিছলে গেল চন্দ্রকান্তর। গড়াতে গড়াতে এসে পড়ল নীচের ধাপে। শিরা ছিঁড়ে গিয়েছিল। সুখেন স্থির দাঁড়িয়ে দেখল, বুড়ো গোঙাচ্ছে। নীচের ঘরগুলো থেকে ঠাকুর-চাকর-ঝি সবাই ছুটে এল। বুড়ো খাবি খাচ্ছিল।···

মানুষের অনেক ব্যাপার সুখেন খুঁচিয়ে লক্ষ্য করে। দাঁতে দাঁত চেপে ঝুঁকি নেয়। অনেকক্ষেত্রে জিতে যায়।

এখানে কিন্তু জেতেনি। হেরেছিল। বুড়োর সব সম্পত্তি ছেলের মৃত্যুর পর গোপনে উইল করা হয়েছিল। সুখেন জানত না। গঙ্গাতীরের এক আশ্রমে চন্দ্রকান্তর গুরুদেব থাকতেন। আশ্রমের নামে সব দিয়ে গেছে বুড়ো। একটি পাই-পয়সাও সুখেনের জন্যে নেই। বুড়ো তাহলে সবই টের পেয়েছিল !

সেই আশ্রম এখনও আছে। সে-বাড়িটায় এখন স্কুল হয়েছে। সুখেন দূর থেকে একবার তাকিয়ে দেখে আসে। তার হাসি পায়। তখন কত ছেলেমানুষ ছিল সে !

তাহলে ?

বাঁধে দাঁড়িয়ে সুখেন দাঁতে দাঁত চাপল। দু-হাতের মুঠো ঘষে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। কী করবে সে ? কোথায় যাবে ?

অসহায়তার দুঃখে এতক্ষণ তার চোখ ফেটে জল এসে গেল। সামনে যে পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে, সে বড় নির্বিকার নিষ্ঠুর জড়।

পুলিশে তাকে ধরবে—সে ভয়েও নয়, এই জড়ত্বের ভয় তাকে গিলে খাচ্ছিল। যদি কিছু টাকাও সে পেয়ে যায় হঠাৎ—এখনই, এত রাত্রে—যদি চলে যায় অন্য কোথাও, তাহলেই কি সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে? বারবার একই শূন্যতার মধ্যে ছিটকে পড়তে হচ্ছে তাকে। কী করবে? কলকাতা গিয়ে ? কনকের কাছে যাবে অবশেষে ? কনক তাকে নেবে। ফেলবে না। হয়ত মাথায় করে রাখবে। সে এখনও আইনত তার স্ত্রী। কিন্তু সে এখন নিজের কাছে নিজেই একটা বোঝা, সে পরের বোঝা

মাথায় নিলে দুটোই পড়ে যাবে।

অন্যমনস্কভাবে সে পা বাড়াল। আস্তে আস্তে বাঁধের পথে হাঁটতে থাকল। কনক তাকে বিশ্বাস করে না। আর লীলা—লীলা একটা স্বপ্ন মাত্র। এই স্বপ্নের লীলাও তো বিশ্বাস করেনি তাকে।

আর যে মেয়ে তাকে চড় মেরেছে, একদিন তার পায়ে হাত দিতে আপত্তি ছিল না সুখেনের। আজ বড় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে ভিতর দিকে। সুখেনের বয়স হয়েছে। তার জীবন একটা সম্মান দাবী করছে। নিজেকে আর চাকরবেশে দেখতে বড় কষ্ট হচ্ছে তার।· · ··

চাকর—অবিশ্বাসী চাকর। সুখেন মুখ তুলল। যেন আলো অন্ধকার ভরা ওই দীর্ঘ উঁচু লালচে দেয়াল ওইসব ঘরবাড়ি আর গাছপালার মধ্যে সব ষড়যন্ত্রের নায়ককে খুঁজতে চাইল। কে তাকে নিয়ে সারাজীবন এমনি করে ছ্যাচড়ামি করছে। কে সে? কেন তার এ খেলা?······আজ যদি সে দুম করে মরে যায়, সকালে এ শহরের লোকেরা বলবে, লোকটা ছিল একটা জুয়াড়ী আর মাতাল। লম্পটদের রাজা। এ সহরের ইতিহাসে বিস্তর বড়মানুষ মদে মেয়েমানুষে জুয়ায় ফতুর হয়েছেন। অজস্র সাধারণ মানুষও সারা গায়ে ঘা নিয়ে বিস্তর ভিখিরি হয়েছে। বেঁচে থাকলে সুখেনও তাই হত। তার চেয়ে এও একরকম বাঁচা বৈকি। কনক বর গেলে শাঁখা ভাঙবে। লীলাদের বাড়ি যখন কনককে দেখেছিল, লক্ষ্যই করেনি হাতের শাঁখা সিঁথির সিঁদুর। আজকালকার মেয়েদের মন খুব কড়া। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে লীলাও কত অনায়াসে সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেছিল। শাঁখা আর নোয়া খুলেছিল। কত সহজ হয়ে উঠেছে সব! আসলে, একটা আবহাওয়ার ব্যাপার। আমার ঠাণ্ডা লাগলেও একসময় সর্দিকাসি হচ্ছে না—আবার ঠাণ্ডা বাতাস না লেগেই অজস্র লোক একসঙ্গে নাকচোখে জল আর গলায় সুসসুড়ি নিয়ে ছটফট করে উঠেছে।······

জেলখানার ঘড়িতে ঘণ্টা বাজল, রাত বারোটা। নিশিপাওয়া মানুষের মত ওই প্রাচীন বট আর এই তরুণ শিরীষের প্রান্ত অব্দি তাহলে এতক্ষণ অবিশ্রান্ত পায়চারী করে কাটাচ্ছিল।

প্যান্টের পকেটে হাত ভরে সিগারেট প্যাকেট বের করল সুখেন। একটা মাত্র আছে। তারপর ? তার বাঁ-পাশে সরকারী অরণ্য, ডান পাশে জেলখানার পাঁচিলের উত্তর-পশ্চিম কোণটা—তার ওদিকে ঘন গাছপালায় ভরা ছিটানো ঘরবাড়িগুলো পেরিয়ে গেলেই সরু মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা। খুব কাছেই অহীনদের বাড়ি।

সিগ্রেট টানতে টানতে পা চালাল সুখেন। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সদর রাস্তাটা দ্রুত পেরিয়ে গেল। একটা পুলিশ দূরে হেঁটে যাচ্ছিল। তার লম্বা ছায়াটা ডিঙিয়ে খোলা ড্রেনটা পেরিয়ে আগাছার জঙ্গল ভাঙতে থাকল সে। পুলিশের বুটের শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছিল দূরের দিকে।

অহীন—অহীনকে তার বড় দরকাব মনে হয়েছে হঠাৎ অহীন জ্ঞানী ছেলে। কোন-না-কোন বুদ্ধি একটা বাৎলে দেবেই। বরাবর অহীন সম্পর্কে সে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেছে। কেন কে জানে তার মনে হয়েছে শহরব্যাপী চারপাশে ক্ষয়রুগীদের মধ্যে হয়ত এই ছেলেটির ফুসফুস এখনও অটুট আছে।

তবে আসল কথাটা হচ্ছে, ঠিক বুদ্ধি বাৎলে দেবে বলে নয়, সুখেনকে সে পাথেয়টা দিতে পারবে অন্তত। বোস ব্রাদার্সের ক্যাসমেমো ছাপানো টাকাটা রমার আদায় করার কথা। রমাকে চিঠি লিখে যাবে যাতে সে টাকাটা অহীনকেই দেয়। লীলাকে না জানিয়ে দিতেই বলবে। রমা নিশ্চয় ভাইকে অপমান করবে না। বাড়ির দরজায় একটু দাঁড়িয়ে সুখেন সোজা চলে গেল। জানলার কাছে গিয়ে চাপা গলায় ডাকল, অহীন, অহীন আছো ?

দুবার ডাকবার পর অহীন সাড়া দিল। আলো জ্বালতেই হাতের ইসারায় নিষেধ করল সুখেন। আলো নিভিয়ে অহীন বাইরে এল। তারপর ওর হাত ধরে নিঃশব্দে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে জানলা বন্ধ করে বাতি জ্বালল। পরক্ষণে সুখেনের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেছে অহীন। এ কি চেহারা হয়েছে সুখেনের।

অহীন হেসে ফেলল। পুলিশকে যতটা সাংঘাতিক ভাবছেন, ততটা

কিছু নয় মোটেও। আর আপনি তো আজেবাজে লোক নন যে ধরে নিয়ে গিয়ে ঠ্যাঙানী দেবে।

সুখেন হাসবার চেষ্টা করছিল। পুলিশের কথা কেন হঠাৎ? আমি সেজন্য আসি নি।

ভাবনায় চেহারা যা করেছেন! অহীন বলল। ওরা কিছু টাকা চায় মাত্র। এ আমার অনেক দেখা আছে। টাকা দিচ্ছেন না কেন?

দেব। সুখেন একটু চুপ করে থেকে ফের বলল, রমা ফিরেছে?

হাই তুলে অহীন জবাব দিল, ও তো আজ বৌদির ওখানেই থাকবে। খবর পাঠিয়েছিল প্রেস থেকে।

ও।

কেন, আপনি বৌদির ওখানে যাননি আজ?

নাঃ।

কী ব্যাপার? ঝগড়া হয়নি তো?

আচ্ছা অহীন, জগদীশের জামিন হয়েছে?

না। কাল হবে হয়ত। পুলিশ কী একটা এনকোয়ারী করছে শুনেছি। একটা বড় স্মাগলিং ঘাঁটির গুজব চলছিল—তার মধ্যে নাকি অনেক রথীমহারথী আছেন। পুলিশ একটা নট খুঁজে পেয়েছে নাকি।

লালু কোথায়?

লালু ফেরারী। আমাকেও ছাড়বে বলে মনে হয় না। জগদীশের সঙ্গে আড্ডা দিতাম তো। আর মজার কথা শুনুন, বাড়ি ফেরার সময় শুনে এলাম, বম্বাকে ছেড়ে ফের ধরেছে। ওর সমিতির কয়েকজনকেও জিগ্যেসপত্তর করার জন্যে আটকে রেখেছে থানায়।

সুখেন জিভ কেটে বলল, আরে! বম্বাটা তো এ লাইনের লোক নয়। তাছাড়া ওর দলের ছেলেরা তো সবাই ভদ্রপরিবারের! ইস্. কী সাংঘাতিক আগুন জ্বলে গেল মাইরি!

অহীন অক্লেশে বলল, জ্বালালেন আপনি।

অহীনের চোখের দিকে একটুখানি তাকিয়ে থেকে মুখ নামাল সুখেন। বলল, তা ঠিক। অন্তত তুমি তো সব জানো আগাগোড়া। আমাকে মাফ করো, অহীন আমি সত্যি একটা আনাড়ী খেলোয়াড়। আমার

দ্বারা কিস্যু হবে না। আর···আর হবে না জেনেই একটু আগে ওই জঙ্গলের কাছটায় একটা উপযুক্ত গাছ খুঁজছিলাম।

অহীনের ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক দিল। মরবার জন্যে?

হয়তো তাই।

তা মরলেন না যে?

সুখেন দূরের কণ্ঠস্বরে বলল, পারলাম না। আমি পালাতে চাই। ভাই অহীন, তুমি আমার ছোটভাইয়ের মত। বিশ্বাস কর, সবার সঙ্গে ফাঁকি দিয়ে দিয়ে চলেছি—কেবল তোমাকে কোনদিন প্রতারণা করতে চাই নি। পারি নি। তুমি কি বিশ্বাস করবে অহীন? বাবা-মা মরার পর আমরা মাত্র দুটি ভাই বেঁচে থাকতে চাইছিলাম সে বেঁচে থাকলে এতদিন ঠিক তোমার মতই হত। অমনি ভদ্র, অমনি চালাক চতুর স্মার্ট ছেলে। লেখাপড়া শেখবার ঝোঁক ছিল তার ভয়ানক। হল না। দু ভাই মিলে চায়ের দোকানে বয় হয়েছিলাম। তারপর একদিন রূপেন মারা গেল।

অহীন মুখ নামিয়ে বলল, কী হয়েছিল?

টাইফয়েড। এক রকম বিনা চিকিৎসায় মারা গেল সে। থাকতাম একটা খোলার ঘরে। ঘরটা ছিল এক চেনাশোনা বুড়ির। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঝিয়ের কাজ করত সে। আমরা বলতাম পিসিমা। যা'ক গে···তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পরই হঠাৎ আমার মনে পড়েছিল, রূপেন বলত, আমি কলেজে পড়তে যাব কবে রে দাদা? তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছি নে কেন? আমি বলতাম, বেশি করে খা, তাহলেই শিগগির বড় হবি। ও হাসত। খাওয়া? খাওয়া তো স্বর্গের অমৃত তখন!

ভুলে যান। অহীন বালিশের নীচ থেকে সিগ্রেট বের করে এগিয়ে দিল।

আমি তোমার কাছে এসেছি অহীন।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

আমাকে কিছু টাকা ধার দেবে?

অহীন সিগ্রেট ধরাতে গিয়ে হেসে ফেলল। টাকা? আপনাকে?

কী মুশকিল! আপনি দেউলে হয়ে গেলেন নাকি?

একেবারে তুমি জান না, প্রেসটা আমার নয়।

জানি।

জানো? কে বলল? লীলা?

হ্যাঁ।

মরুক গে। আছে টাকা? দেবে? শিগগির যাতে পাও, তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

টাকা নিয়ে কোথায় পালাবেন?

হয়তো কলকাতা।

তারপর?

জানি না।

অহীন সিগ্রেটটা ধরাল। সুখেনের দিকে দেশলাই ছুঁড়ে দিয়ে বলল, চাইবার আর মানুষ পেলেন না! মাত্র গোটা তিনেক টাকা ছোড়্‌দির কাছে নিয়েছিলাম। বিকেলে সিনেমা গেলাম ইতিকে নিয়ে। ব্যস, ফতুর!

কে ইতি?

ইরিগেশনের বড়বাবুর মেয়ে। সেই যে একদিন সন্ধ্যেবেলা দুজনে যাচ্ছিলাম, আপনি সাইকেলে···

বুঝেছি। তাহলে উঠি, অহীন।

অহীন ওর হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল। থামুন তো! বউদির সঙ্গে ঝগড়া করে কী সব আবোল-তাবোল বকছেন। আপনি সটান এখানে শুয়ে পড়ুন। খাওয়া হয়েছে? মুখ দেখেই বুঝেছি, ও কর্ম করা হয় নি। খানিক আগে এলে আমারটা ভাগ করে খাওয়া যেত। এখন অগত্যা উপবাস ছাড়া উপায় নেই। নিন, জামাকাপড় ছাড়ুন।

আলনা থেকে একটা লুঙ্গি এনে দিল অহীন। সুখেনের হাঁটুর ওপর সেটা পড়ে রইল। সুখেন বলল, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমি যা ঠিক করে ফেলি, তা করি।

বিয়েটাও তো ঠিক করে ফেলেছেন!

সুখেন একটু হাসল মাত্র।

আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন। বউদির ব্যাপারটা রমার কাছেই জানা যাবে কাল সকালে। তারপরই সব ম্যানেজ করে ফেলব জলের মত। আপনি জানেন না, বউদির সঙ্গে আমার ভীষণ খাতির জমে গেছে।

সুখেন মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি মরবে অহীন। ও একটা ডাইনী।

অহীন কোন জবাব না দিয়ে তক্তাপোষের কোণ হাতড়ে একটা ব্যাগ আনল। পরক্ষণে সুখেন চমকে উঠল।

অহীন বলল, আমার এক বন্ধুর ভাই জাহাজে চাকরী করে। যখন আসে দু চারটে নিয়ে আসে সঙ্গে। ওদের বাড়িসুদ্ধ খায় নাকি।

সুখেন বোতলটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলল, বড়খোকা রাম!

হ্যাঁ। ছোটখোকা শ্যাম নয়। তবে গা দিয়ে যা গন্ধ বেরোয়, বাপস্! সেই ভয়ে ততক্ষণ বাইরে কাটাতে হয়। মা এমনিতে নিরীহ বোকা মেয়ে, কিন্তু ছেলের সাধ্যি নেই তাঁর নাককে ফাঁকি দেয়। কী আর করবেন, বখে তো গেছিই। যদ্দিন চাকরিবাকরি না হচ্ছে এই করেই কাটাতে হবে।

তুমি কী ওটা এখানেই খাবে নাকি?

মা ঘুমিয়ে আছেন। ক্ষতি কী? আপনার একটু স্ফূর্তি দরকার : নাকি বাইরে যাবেন?

তাই চল।

দুজনে বেরিয়ে এল। সুঁড়ি পথটার শেষে এসে সুখেন বলল, জগার ওখানে যাবে? ও তো থানায় রয়েছে বললে। শিবানী একা আছে। ওর ভালই লাগবে।

অহীন ওর দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর বলল, ঠিক আছে।

প্যারেড গ্রাউণ্ড পেরিয়ে প্রায় লাফ দিয়ে সদর রাস্তা পেরিয়ে ওরা জগদীশের বাড়ির পিছনে পৌঁছে গেল। দরমাবেড়ায় চোখ রেখে সুখেন দেখল, ঘরে বাতি জ্বলছে। শিবানী নিশ্চয় ঘুমোয় নি। সে ডাকল, শিবানী, শিবানী!

একটু পরেই শিবানীর সাড়া পাওয়া গেল। কে, বাবা?..

এরা পরস্পর মুখোমুখি তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছিল। বাবা অন্ত প্রাণ শিবানীর কাছে বাবা ছাড়া আর কেউ পাত্তা পাবে না এখন। সুখেন বলল, আমি সুখেন।

কে?

কানে কম শুনছ নাকি? সুখেন সুখেন!

অহীন যুগিয়ে দিল, সুখেন রায় এবং অহীন্দ্র মজুমদার। তোমার বাবার চেলা।

দরজা খুলে শিবানী হাসল।...একেবারে নন্দীভৃঙ্গীর মত! দুপুর রাত্তিরে একা মেয়েছেলের ঘরে আসবার সাধ কেন বলো তো? যাও এক্ষুনি!

সুখেন দরজা বন্ধ করল। বলল, মাল খাব।

আর বুঝি জায়গা নেই?

সুখেন নির্লজ্জের মত ওর হাত ধরে টানল। বাসি তরকারী নেই ঘরে? নয়ত দোকান খুলে চানাচুর নিয়ে এস।

অহীন জিভ কেটে বলল, এই সুখেনদা, মাল খেতে এসে বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু পালাব বলছি। আমি ছোট ভাই না আপনার?

জবাব শিবানীই দিল। তার গালে চিমটি কেটে বলল, কচি খোকার গাল টিপলে দুধ বেরোয়। ছোট ভাই বড়-ভাই আজকাল এক গেলাসে জল খাচ্ছে জানো না বুঝি? ঘরে ঢুকে সে তাক খুঁজে দুটো গেলাস বের করছিল।

ধুতে ধুতে ফের শিবানী বলল, ভালই হল। রাত কাটানোর মানুষ পাওয়া গেল। উঃ, ভয়ে কাঁপছিলাম এতক্ষণ।

আঠারো

স্নানাহার সেরে আপিসমেয়েদের মত লীলা বেরোতে তৈরী হয়েছিল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে অপাঙ্গে নিজেকে দেখতে দেখতে কৌটো

খুলে মসলা মুখে দিচ্ছিল। তারপর সবে গগলস্ এঁটেছে, এমন সময় রমা চোখমুখ লাল করে হাজির।

লীলা বলল, কি ব্যাপার? প্রেসে যাওনি এখনও?

রমা ধুপ করে বসে পড়ল। সর্বনাশ হয়ে গেছে লীলাদি! সকালে শুনি, অহীনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। তক্ষুনি থানায় গিয়ে খোঁজ নিলাম। দেখলাম, সুখেনবাবুকেও ধরেছে ওরা। তারপর···

লীলা নিষ্পলক তাকিয়ে বলল, কেন?

জগদীশের দোকানের সামনে কী হয়েছে শোনেন নি?

লীলা ঘাড় নাড়ল।

রমা আগাগোড়া ব্যাপারটা খুলে বলল। শান্তভাবে সব শোনার পর লীলা একটু হাসল। বলল, জগদীশের একটা মেয়ের সঙ্গে দু-দুটো পুরুষমানুষ স্ফূর্তি করছিল তাহলে! বেশ মজার খবর শোনালে তো! এমন হয়, জানতাম না কিন্তু।

রমা দুঃখিত মনে বলল, অহীনটা তেমন খারাপ ছেলে নয়। অনেক দোষ ওর আছে জানি। ওই নচ্ছার মেয়েটার কাছে হয়ত সুখেনবাবুই নিয়ে গিয়েছিলেন ওকে।

টাকা হলে সব মিটে যাবে?

ঠিক বলতে পারছি না। তবে যা বুঝলাম, টাকা দিলে হয়তো সব মিটে যেতে পারে। ওদিকে মা তো অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমাদের পরিবারে কোনদিন কোন কেলেঙ্কারী তো হয়নি লীলাদি!···রমা ব্যাগ থেকে একটা রুমালের পুঁটুলি বের করছিল।

লীলা বলল, ও কী?

এই গয়নাগুলো মা দিলেন। কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিন দিদি।

ওটা রাখো। আমি দেখছি। লীলা দরজার পর্দা তুলে বাইরে উঁকি দিয়ে বলল, বাসিনী, ঘণ্টা উঠেছে?

গালে হাত রেখে রান্নাঘরের বারান্দায় বাসিনী চুপচাপ বসে ছিল। লীলার কথা শুনে রান্নাঘরের পাশের ঘুপটি ঘরটায় একবার উঁকি মেরে

মাথা নাড়ল। হারামজাদা বমি না করলে লীলা একটুও টের পেত না। বাসিনী আদৌ বুঝতে পারেনি, লীলা সারারাত জেগেই কাটাচ্ছিল। বাসিনী দরজা খোলার জন্যে বকুনি খেয়েছে, সেজন্যেও নয়—চোখের সামনে লীলারাণী বেচারার গতরটা ফাটিয়ে লাল করে দিলে। শেষ রাত্তিরে ভদ্রলোকের বাড়ি এ কি অনাছিষ্টি!

বাসিনী মনে মনে বিলাপ করেছে। শাপ দিয়েছে। ঘৃণা করেছে লীলারাণীকে। তারপর বারবার উঠে গিয়ে ঘণ্টার মাথায় হাত রেখেছে। বলেছে, ঘুমো বাবা, নির্ভয়ে ঘুমো মাণিক। খোয়ারী ভাঙতে আর দেরী নাই। তারপরে সোজা চলে যাস্ গেরামে। আমি? আম্মো যাবো তোর সঙ্গে! মরব এখান থেকে? ও সব্বোনাশে ভাসছে—ভাসুক। আমরা কেনে সোঁতের টানে ওয়ার পেছনে যাব মাণিক? যাব না।

লীলা বাসিনীর আচরণে ব্যাপারটা কিছু অনুমান করেছিল। সে ভাবতেই পারে নি, এই বাসিনী ঘণ্টাকে এত স্নেহ করে। দুবেলা ঘণ্টার সঙ্গে ওর ঝগড়াঝাটি ধমক দিয়ে মেটাতে হয় লীলাকে! সেই বাসিনী লীলার পায়ে মাথা কুটছিল মারবার সময়।

হয়ত অন্য সময় হলে এত রাগ হত না লীলার। সারাটি দিন ও রাতের সব ক্ষোভ সবটুকু ক্রোধ যেন ঘণ্টার উপর ফেটে পড়েছিল সুযোগ পেয়ে। পরে সে পস্তেছে। অত ক্ষেপে যাওয়া তার ঠিক হয়নি। রূপপুরের মাটির সঙ্গে এখন মাত্র এদুটি মানুষই যোগসূত্র হয়ে টিকে আছে যেন। ওরা না থাকলে কি সে হাঁফিয়ে উঠত না? নিঃসঙ্গ বোধ করত না নিজেকে? এতবড় শহর—এত লোকজন, এদের চেয়ে কে বেশি আপন আছে তার?

লীলা রমার দিকে ফিরে বলল, এস। শঙ্করজ্যাঠাকে এখন কোর্টে ধরা যাবে। ভেবেছিলাম, ওঁর ছায়া আর মাড়াব না। কিন্তু মাড়াতেই হল। অহীনের জন্যে।

'অহীনের জন্যে' কথাটা কেমন খাপছাড়া লাগছিল রমার কানে। সে উঠে দাঁড়াল।

লীলা বেরোনর মুখে বাসিনীকে বলল, ঘণ্টা উঠলে চান করে খেয়ে

প্রেসে যেতে বলবে।

বাসিনী ফের ঘাড় নাড়ল মাত্র।

রিকশোয় চেপে কোর্টের দিকে যাচ্ছিল ওরা। জগদীশের দোকানের সামনে আসতেই কে ডাকল রমাকে। রমা মুখ ফিরিয়ে দেখে বলল, জগদীশ! রিকশো থামাবো দিদি?

লীলাই থামাল। রমা নামতে যাচ্ছিল, তার আগেই জগদীশ কাছে এসে লীলাকে নমস্কার করেছে। রমা বলল, জগদীশবাবু। ওই যে চায়ের দোকান…

জগদীশ বলল, সুখেনবাবুর জন্যে আমাদের হয়রানি। কী আর বলি, বলুন—আপনি হয়ত সবই শুনেছেন ইতিমধ্যে। যা করেছে, সুখেনবাবু আর লালুই করেছে। মাঝখান থেকে এই হাঙ্গামা আমার ঘাড়ে পড়ল। আপনি তো সুখেনের গার্জেন, যা করতে হয় করুন।

লীলা ভ্রূ কুঁচকে বলল, ওরা রাত্রে আপনার বাড়ি থেকেই ধরা পড়েছে শুনলাম। আপনি তো থানায় ছিলেন। আপনার মেয়ে একা ছিল।

জগদীশ গ্রাহ্য না করে বলল, শিবির কথা ছেড়ে দিন। জগার মেয়ের ভাবনা জগার মাথাতেই থাক্। আপনি এখন কী করবেন?

আমি কী করব? সুখেনবাবুর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

জগদীশ জিভ কাটল। লাল কুৎসিত জিভ। ঠোঁটে পানের কুচি। থ্যাবড়া নাকের নীচে পুরু কাঁচাপাকা গোঁফটা কাঁপছিল।…ওটা কি কথা হল ম্যাডাম? সাতকাণ্ড রামায়ণের শেষে সীতা কি রামের মাসি হয়, না, হওয়া সাজে? আপনিই বলুন।

অপমানে রাগে মুখ লাল হয়ে উঠেছিল লীলার। সে বলল আপনার মাতলামি শোনবার সময় নেই আমার। এই রিকশোওলা, চলো।

রিকশোর চাকা গড়াচ্ছিল। পিছন থেকে জগদীশ বলল, ভালো হলো না কাজটা। রমাদিদি, বুঝিয়ে বলো ওনাকে। এটা ওনার গ্রাম নয়। এখানে অনেক লালুভুলু আছে। লালু হয়ত দেখেছেন, ভুলুটা দেখেন নি!

গজগজ করছিল লীলা। রাগে কাঁপছিল থরথর করে। গজমুখী কাঁকনপরা হাতের পাকানো মুঠিতে নীল শিরা ফুলেছিল। রমা কাঠ হয়ে

বসে আছে। কোর্টের প্রাঙ্গণে রিকশো দাঁড়াতেই প্রায় লাফ দিয়ে লীলা নামল। ক্ষিপ্রহাতে রিকশোভাড়াটা গুঁজে দিয়ে পা বাড়াল। বেশ অস্বাভাবিক কণ্ঠে সে ডাকছিল, জ্যাঠামশাই, জ্যাঠামশাই!

শঙ্করবাবু ডুমুরগাছের নীচে দাঁড়িয়ে চশমার কাচ মুছছিলেন। লীলাকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, লীলা, তুমি। আবার কোর্টে কেন?

একটু আড়ালে চলুন, বলছি।

লীলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

খানিক পরেই দুজনে কোর্ট ছেড়ে ফের রিকশো চেপে প্রেসে পৌঁছেছে। পৌঁছেই দেখেছে, বাণীচকের পিনাকীবাবু লীলার অপেক্ষায় বসে আছে।

বেশ আরাম করে বসল লীলা। ফ্যানটা পূর্ণ বেগে চালিয়ে দিয়ে বসল। রমা কম্পোজিং সেক্‌শনে গিয়ে ঢুকেছে। লীলা বলল, তারপর, খবর বলুন।

পিনাকী হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। এই সেই সতুর বৌ? এই ব্যস্ত-সমস্ত বেশিজ্যান্ত সপ্রতিভ চালাকচতুর ডাঁটদেখানো মেয়েটি? ডাঁইকরা ঢিপিখোঁপা, কপালে কাঠি টিপ, কাজলটানা ঘোরালো চোখ—মুখের চামড়া যেন পদ্মফুলের পাপড়িখানা······টিয়াপাখির মত টুকটুকে ঠোঁটে কী সুন্দর বুলি · ···

লীলা ফের বলল, খবর ভালো সব? বাজারে এসেছিলেন, না আপিসের কাজে?

একটা নিঃশব্দ ওতপ্রোত বিলাপ পাড়াগেঁয়ে রসিক, চিরকালের ভাঁড় পিনাকী মুখুজ্যের মাথায় চাপ দিচ্ছিল। এবার ফোঁস করে নাকের ছিদ্র দিয়ে বায়ুরূপে সব বেরিয়ে গেল। অপ্রস্তুত হেসে সে বলল, এই একবার এলাম এদিকে। ভাবলাম, মারাণীকে একবারটি দেখে যাই।

লীলা কেজো কণ্ঠস্বরে বলল, ছাপার কাজ হয় না আপনাদের? কী আপিস যেন আপনার?

পিনাকী একটু কেশে জবাব দিল, কো-অপারেটিভ। ছাপার কাজ

থাকে বৈকি। বিস্তর থাকে।

লীলা সোৎসাহে বলল, কোথায় করান?

যেখানে সুবিধে পাই, করাই। পিনাকী আমতা হাসল বলতে বলতে। আবার এ ব্যাপারে একটু বদঅভ্যেস আছে মালক্ষ্মী, বুঝলেন? ছাপোষা মানুষ—দু-চার পয়সা কমিশন পেলে সেদিকেই ছুটে যাই।

দেব। কমিশনও পাবেন। লীলা কেজো গলায় বলল। ··বেশ তো, ওদিকের সব অর্ডার আপনি নিয়ে আসুন—পুষিয়েই দেব।

পিনাকী অবশ্য এ ব্যাপারে আসেনি। সে অভ্যাসমত দুহাত কচলাচ্ছিল। লীলা তার জন্যে চা আনতে বললে সে একটু নড়ে বসল। তারপর সোজা হল। বলল, হবে'খন। আপনারা আমাদের একরকম নিজেরই লোক। পাড়াসম্পর্কে তো বৌমা ছিলেন একসময়। সতু আমাদের ন্যাওটা······

সামলে নিল সে। ঝোঁকের মাথায় সাপের ঝাঁপি উদোম করতে যাচ্ছিল যেন। ওদিকে লীলা মুখটা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে টেবিলের ওপর। কী একটা কাগজ দেখছে।

পিনাকী শুধরে নিয়ে বলল, রাণীচকে আজকাল জমজমাট কাণ্ড। হাটুবাবুকে চেনেন তো?

লীলা মাথাটা এত অল্প দোলাল যে সেটা চেনা না অচেনার দরুণ—তা মোটেও বোঝা গেল না।

হাটুবাবু এ্যাদ্দিনে বোনমিলটা খুললেন। সে এক এলাহী কারবার। পিনাকী হাসতে লাগল। ··ওদিকে নলিন সব মাল জোগাচ্ছে। হাইওয়ের ধারেই খুলেছে মস্তো আড়ত। কিসের আড়ত শুধোলেন না?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও লীলা মুখ তুলে বলল, কিসের?

আরো জোর হেসে পিনাকী বলল, হাড়ের। রাজ্যের মুদ্দোফরাস গিয়ে জুটেছে সেখানে। এলাকার মাঠ জঙ্গল আর ভাগাড় থেকে হাড় এনে জড়ো করছে। গন্ধে রাণীচকে টেঁকা দায়। তার ওপর জুটেছে এক আস্ত মড়াখেকো চণ্ডাল—দিনরাত্তির নেশা-ভাঙ করছে আর চূড়ান্ত বদমাইসীতে মেতে রয়েছে। একাদোকা বৌঝিদের পথ চলা দায়।

করে ওর মুণ্ডু ধুলোয় গড়াগড়ি যেত—কেবল নলিনটা ওর মাথার ওপর রয়েছে, এই যা পরিত্রাণ! উৎসাহে আরো ঝুঁকে এল পিনাকী। জানেন ও কী করেছে?

লীলা নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকাল মাত্র। কার কথা বলছে, বুঝতে পারছে না বা বুঝবার চেষ্টাও করছে না সে।

ঘরে এক নাবালিকা আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে হারামজাদা গর্ভবতী করে ছাড়লে। তার ওপর চায়ের দোকানের দরুণ···মানে বুলু নামে যে ছেলেটিকে ও রেখেছিল, তার মা—আমাদের নিবারণ মাস্টারের বৌ···চেনেন না?

লীলা উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল, কানাইবাবু, শুনুন!

কানাই আসবার আগে চা এসে গেল। নিঃশব্দে চা খেতে লাগল পিনাকী। এসব খবর দিতেই কি এখানে ঢুকেছিল সে? একটু বোকামিই হয়ে গেল যেন।

কানাই আসছে না দেখে লীলা প্রেসের ঘরে ঢুকল।

পিনাকী অপমানিত বোধ করছিল। কেন এখানে ঢুকেছিল সে? পিনাকী মুখুজ্যের বয়স হয়েছে। সারা জীবন সে সবকিছুতে কৌতুক খুঁজে ফিরেছে। এই তার মজ্জাগত অভ্যাস। লীলার কাছে সন্তুর পরিণতির খবর শুনিয়ে সে তার অভ্যাসকে চরিতার্থ করতে চাইছিল মাত্র। কোন উদ্দেশ্য এর পিছনে ছিল না তার। একদিন এই অভ্যাসের বশেই লীলার ডিভোর্স মামলায় সহায়তা করেছিল সে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর লীলা এল না দেখে সে উঠে দাঁড়াল। প্রেসঘরের দরজায় উঁকি মেরে বলল, তাহলে আসি মা।

ফ্ল্যাট মেসিনটা মেরামত হচ্ছে, লীলা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। পিনাকীকে লক্ষ্যও করল না। পিনাকী আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। তার মুণ্ডুটা ঝুলে পড়েছে বুকের দিকে। থমথম করছে মুখটা। মনে মনে লীলাকে কুচ্ছিত গাল দিচ্ছিল সে।

রমা ভিতরের দিকে জানালার পাশে একটা টুলে বসে প্রুফ দেখছিল এতক্ষণ। লীলা অফিসে এলে সে পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, লোকটা

কে লীলাদি ?

লীলা হাসল।...রাণীচকের।

সেই যেখানে আপনার বিয়ে হয়েছিল ?

লীলা এবার ফেটে পড়ল হাসিতে। রমা অবাক হয়ে গেছে। একথায় এত হাসবার কী আছে সে বুঝতে পারে না।

লীলা হাসছিল। বেশ কিছুদিন ধরে একের পর এক আঘাত সহ্য করে ক্রমশ সে যেন শরীরে মনে নিঃসাড় হয়ে পড়েছিল। এ হাসি তার দরকার ছিল। বুক হাল্কা হয়ে যাচ্ছিল। সংসারকে বশ মানিয়ে রাখতেই যেন সে পৃথিবীতে এসেছে—অবিকল তার মা কুমুদের মত এই রকম একটা ধারণা তার মনে ততক্ষণে দানা বাঁধতে সুরু করেছে।

রমা বলল, বেরোতে হবে। চলি।

লীলা রুমাল বের করে মুখটা আলতো স্পঞ্জ করে নিচ্ছিল। বলল, কোথায় যাবে ?

কালেকশানে যাই। এক গাদা বিলের টাকা পড়ে আছে।

বিকেলে বাড়িতে যেও। দরকার আছে। আর অহীন থানা থেকে ফিরলে তাকেও যেতে বলো।

ঘাড় নেড়ে রমা বেরোল। লীলা ডাকল, কানাইবাবু, কী মেসিন কেনার কথা বলছিলেন যেন ?

কানাই এগিয়ে এসে বলল, একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কাটিং মেসিনের খোঁজ পেয়েছি, মা। জিনিসটা ভালোই হবে।

দাম বলেছে ?

না। আপনি দেখবেন না একবার ?

আমি চিনি নাকি ওসব ?

কানাই মাথা চুলকে বলল, তাহলে আমিই যাচ্ছি। আপনি থাকছেন তো এখন ?

আছি কিছুক্ষণ।

কানাই দরজার বাইরে পা দিতেই হঠাৎ লীলা উঠল।...কানাইবাবু, চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাই।

ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গেল। মেসিন-ফেসিনের কা ছাই বোঝে লীলা! তবে চেহারা দেখে জিনিসটা তার ভারী পছন্দ হয়েছে। একটা দীর্ঘ ক্ষুরধার ইস্পাতের পাত আস্তে আস্তে নেমে আসে। সুন্দর নরম সাদা কাগজকে নিঃশব্দে দুভাগ করে ফেলে। দাঁতে দাঁত চেপে যায় দেখতে। যা দাম চেয়েছে, তাতেই রাজী। ফিরে গিয়ে ব্যাঙ্কের পাশবই নিয়ে বসতে হবে।...

বুকটা আচমকা কেঁপে উঠেছিল লীলার। আর কত টাকা আছে তার? যদি সব শেষ হয়ে গিয়ে থাকে? রূপপুরে আর সামান্য কিছু মাটি আছে মাত্র। তারপর?

মাথা ঘুরছিল। একটা অদৃশ্য ভয়ানক শক্তিকে কিনে ফেলবার জন্য সর্বস্ব বিকিয়ে দিচ্ছে সে!

প্রেসে এসে দেখল ঘণ্টা টুলে বসে আছে গোমড়া মুখে। তার চিবুকে ঠোনা মেরে লীলা বলল, ঘণ্টুবাবু কতক্ষণ? ভাবছিলাম, রেগেমেগে পালিয়ে গেলি হয়ত।

ঘণ্টা উঠে দাঁড়িয়ে আকর্ণ হাসল। তারপর জানাল,—যা জানাল, লীলা মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে ওঠবার পরই অবসন্নভাবে বসে পড়েছে। ফ্যাকাসে ছাই ছাই মুখ, খড়ি খড়ি চেহারা—চেয়ারে ঠিক কাগজের ছবির মত সে নিশ্চুপ হয়ে গেছে কিয়ৎক্ষণ।

এইমাত্র সুখেনবাবু এসেছিল। তারপর তার ঘরে ঢুকে বিছানাপত্র বাকসো সব নিয়ে বেরিয়ে গেছে। ঘণ্টাই রিকশো ডেকে দিয়েছে। মাল সেই তুলে দিয়েছে রিকশোয়। সুখেনবাবু বলে গেছে, তোমার দিদিমণিকে বলো, গেলাম।

শুধু গেলাম? হ্যাঁ, তাই। আর কিছু না।

উনিশ

রাণীচকের গাছপালার ঝরঝরে সবুজ রঙ ঘিরে এত দিনে শুঁয়োপোকার মত ধূসর কুয়াসা ঘনিয়ে এসেছে। উত্তরের বাতাসে কিছু

হিম—সকাল-সন্ধ্যায় মুখের চামড়া শুকনো লাগে। চারপাশে সব হলুদ হয়ে যেতে দেরী নেই। আকাশ এতদিন ছিল উজ্জ্বল নীল। এখন সেখানেও বড় অস্পষ্টতা। যদিও মেঘ থাকে না—মেঘরঙা একটা ব্যাপকতা বাসি চুলোর ছাইয়ের মত আকাশময় ছড়িয়ে থাকে। তবে রাত্রিগুলো এখনও কিছুটা ঝকঝকে পরিষ্কার মনে হয়। কালো আকাশে নক্ষত্র জ্বলে দেবতাদের মুখের মত। নীচে শিশিরভেজা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে যা কিছুই ঘটুক, দেবতারা দেখে। হয়ত লিখেও রাখে। হাইওয়ের কংক্রিট পাটাতনে নিঃশব্দে হেঁটে যেতে যেতে সত্যচরণের এমনি একটা ধারণা হয়। কিন্তু সে হাসে। মাথার ওপর থেকে কেউ কারুর ভালো করার তালে নেই। ওইসব বাইরের শত্রুদের মাথার ওপর রেখে মানুষ নিশ্চিন্তে আর পরম বিশ্বাসে বেঁচে থাকছে! সত্যচরণ হাসতে হাসতে গাল দেয়। গাল দিতে দিতে রেগে ওঠে। খুব বেশি রাগ হলে সে হেঁড়ে গলায় গান গেয়ে ফেলে।

যমুনা বেরিয়ে পড়েছিল আজ মরীয়া হয়ে বেরিয়েছিল রাতদুপুরে: খুনীর মত হাঁটছিল সে হাইওয়েতে। যত দায় তো তার ওপরই বর্তেছে! যেন সাত পাকে বাঁধা অগ্নিসাক্ষীকরা বর—না জিয়োলে আখের নষ্ট, চুরাশী নরক! যমের মুগুর প্রাণভোমরায় পড়ে!

জীবন্তী বিলের ওপর ব্রীজ বানিয়ে হাইওয়ে যেখানে অসাধ্য সাধন করেছে, সেই নিরিবিলি চোর-ডাকাত-ভূত-প্রেত অধ্যুষিত এলাকায় সত্যচরণের গানের সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

এত শিগগির অত দূরে চলে গেল লোকটা? যমুনা থেমেছিল। বুকটা ছাঁৎ করে উঠেছিল। কী এক অমানুষিক শক্তি সত্যকে ভর করেছে যেন! রাখী বামনী—পিনাকী মুখুজ্যের বিধবা দিদি বলেছিল, বাবার থান ছাড়া রক্ষে নেই। কবচ-মাদুলী পুজো-মানত একান্ত দরকার। যমুনা কানে নেয় নি। ওর সেই একই কথা: সাধের পাগল! মাছ না হলে ভাত খায় না, মাগ না হলে শোয় না।

না, এতটুকু পাগলামি নয় সত্যর। যমুনা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। ওপর ওপর স্ফূর্তি করতে চেয়েছিল, ভাবে নি সেটা অত সোজা নয়। মজা

ছুটবার ফাঁকে বিধাতার ফাঁসের দড়ি পায়ে আটকে যায়। সত্যচরণ বাঁধা পড়েছে সেই দড়িতে। একদিন যমুনার ছেলে হবে। সে-ছেলের মুখ—সে কাঁটার বেড়ার মত সামনে দাঁড়াবে। ছেলের বাবা ডাক… সত্যচরণের পালাবার পথ নেই। যমুনা মনেপ্রাণে এটা বিশ্বাস করে। বিয়ের মন্ত্র পড়ছে না—তার বেলায় পাগল সাজছে, কিন্তু যমুনার জঠরে তার বিচারক অমোঘ ন্যায়দণ্ড হাতে নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে। পৃথিবীসুদ্ধ অস্বীকার করলেও তো আর এটা মিথ্যা হয়ে যায় না। সত্যচরণ যমুনার ছেলের বাপ হয়েই থাকে।

অতি যত্নে যমুনা নিজেকে ভালোবাসতে শিখেছে। আর সেই ভালবাসার দায়েই যত দায়। একটা পাগলা দুর্দান্ত ষাঁড়কে সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। অ্যাদ্দিনে লোকে ওর হাড় মাংস থেঁৎলে দিত—দিচ্ছে না…কারণ নলিনবাবু। তার ওপর গ্রাম্য দলাদলির ব্যাপারটাও এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। নইলে বুলুর মায়ের ওপর অব্দি হামলা করেছিল যে কামার্ত পশু, তার এমন করে রাত দুপুরে যত্রতত্র নির্জনে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ থাকত না। যমুনা শুনেছে, সতুর গায়ে হাত দিলে রাণীচকে নাকি আগুন জ্বলে উঠবে। যমুনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে পৃথিবীর লোকজনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে যেন।

মাঝখানে বুলুর মায়ের ব্যাপারে একটা আপোষনিষ্পত্তি হয়ে গেছে। নলিনবাবুর বিচারে চায়ের দোকানটা পেয়ে গেছে বুলুরা। ভালোই চালাচ্ছে। হতভাগাদের বরং একটা গতি হল। কিন্তু এদিকে যমুনার সংসারে বেশ টানাটানি চলেছে। ধানের জমি যা কিছু আছে, মুসলমান-পাড়ার কাকে ভাগে দেওয়া হয়েছে। সে লোকটাও নাকি সুবিধের নয়। চোখে-চোখে দেখাশুনা না করলে জমির ধান ঘরে উঠবে না। যমুনা নলিনবাবুর কাছেও গিয়েছিল। নলিন বলেছে, সে ভাবনা তোমার নেই। কী জানি, নলিনবাবুকেও বিশ্বাস করতে পারে না যমুনা। লোকটার মাথায় কী মতলব আছে হয়ত। হয়ত সত্যর এই ঔদাসীন্যের (কিংবা পাগলামির) সুযোগ নিয়ে আসলে সম্পত্তিটুকু গ্রাসের ষড়যন্ত্র করে বসে আছে। কোন্ তাল সামলাবে যমুনা! কতদিক দেখবে সে!

রাত্রির হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে যমুনার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। সংসারটা তার ধারণার চেয়েও বড়; বড় আর সমস্যাসঙ্কুল। ততোধিক ভয়াবহ। কার কাছে যাবে সে?

নাকি নিজেই পালিয়ে যাবে কোথাও—যেদিকে দু'চোখ যায়? তারপর কী করবে? পেটে এই বাচ্চাটা রয়েছে! আঃ! যমুনা তোর মরণ ভালো!

যমুনা চমকে উঠল। কারা যেন চারপাশ থেকে আঙুল তুলে তার দিকে নির্দেশ করছে। এই একটা হারামজাদী মেয়ে, পাপীয়সী বেশ্যা, খানকী। এরা কেন বেঁচে থাকে? কেন এদের মা কচিমুখে নুন দিয়ে মেরে ফেলেনি আঁতুরঘরে? একটা বয়স্ক পুরুষের কাছে কিছু ভালোবাসা কিছু যত্ন আর একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করবার ইচ্ছায়—অন্য কোন কারণে নয়, লীলা মাসির মত প্রেমের খেলায় মেতে যেতে নয়, নিতান্ত সহজ আর স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে যমুনা সত্যচরণের কাছে শেষ অব্দি আত্মসমর্পণ করেছিল। মুখে যাই বলুক, ছোটমার মত দজ্জাল মেয়ে পৃথিবীতে নেই। স্নেহের নামে অত্যাচার দিয়ে তার শূন্য নিষ্ফল পৃথিবীকে সে শুধু যন্ত্রণায় ভরে ফেলেছিল। মা-বাবার যত্ন ভালোবাসা স্বামী ছাড়া আর কার কাছে মেলবার ধন? সুভদ্রা তার মা নয়, প্রবোধও বাবা নয়। সত্যচরণকে অবশেষে সে স্বামী বলে মেনেছিল মনে মনে। তা না হলে এমন করে এখনও রাতদুপুরে পথে নেমে আসতে পারত না। আরও পাঁচটা হতভাগিনীর মত বিষ খেত—নয়ত পালিয়ে যেত, বেশ্যা হয়ে যতক্ষণ শ্বাস কারবার চালিয়ে যেত!

যমুনা চমকাল। তোর মরণ ভালো যমুনা! যেন বা ওই নক্ষত্র থেকে তার মরা মা চাপা হিংস্র কণ্ঠস্বরে বলে উঠেছে হঠাৎ। আর, ওই দিগন্তের স্থির পাণ্ডুর একটা বড় নক্ষত্র হয়ে তার বাবাও তাকে আলোর শিখা দিয়ে স্পর্শ করতে পরাঙ্মুখ! যমুনা চোখে হাত দিয়ে দেখল, অশ্রু নেই। এতদিনে সব অশ্রু বুঝি নিঃশেষ হয়ে গেছে। শুকনো চোখে সবই খসখসে আর বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

সত্যচরণের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল না। যমুনা চারপাশে তাকিয়ে

চমকে উঠতে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে পাশের তরুণ অর্জুনগাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁতে দাঁত ঠোকা দিচ্ছিল। বড় অদ্ভুত শীত এখন মধ্যরাতের পৃথিবীতে। অর্জুনের চারপাশ ঘিরে ইটের বেড়া। একাংশ ধ্বসে পড়েছে। একটা লম্বা ডাল পথের দিকে চলে গেছে—আকাশে হাত বাড়ানো মানুষের মত লাগে গাছটাকে। সেই দীর্ঘ প্রসারিত হাতটা দুলে উঠছে। যেন তাকে ডাকছে।

সামনের বাঁক থেকে গাড়ির আলো এসে পড়েছে ততক্ষণে। স্টেশন থেকে শেষ ট্রিপ বাস এসে গেল তাহলে। লজ্জা পেয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল যমুনা।

বাসস্টপ আরো খানিকটা পিছনে—নলিনবাবুর কারখানার ওদিকে। সেখান থেকেই বাজারের সুরু। কিন্তু একটু এগিয়েই বাসটা থেমেছে। ঠিক থামা নয়, গতিবেগ কমিয়েছে মাত্র। এখান থেকে সামান্য কিছু দূরে একটা বড়ো দিঘির পাড়ে বায়েনপাড়া। গ্রামের বাইরে কয়েক ঘর মুচি-মুদ্দোফরাসের বস্তি সেখানে। হাইওয়ে থেকে একটা আলপথে সেই বস্তিতে ওরা যাতায়াত করে। সম্ভবত তাদেরই কেউ নামল বাস থেকে।

যমুনা বেড়ার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাসটা চলে গেলে ফের এপাশে এল সে। পরক্ষণে তার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। শিরদাঁড়ায় সাপ চলে গেল সাঁৎ করে। গলা শুকিয়ে গেল।

প্রবোধ এগিয়ে এসে ডেকেছে, মুন!

বড় আদরের নাম মুন। মুন মানে চাঁদ। আকাশের চাঁদ। যমুনার সাড়া না পেয়ে প্রবোধ গলা ঝেড়ে ফের ডাকল, মুন!

মধ্যরাতের হাইওয়েতে হারানো বয়সের নরম উজ্জ্বল আলোয় যমুনা ভেঙে পড়তে গিয়ে সামলে নিয়েছে।

প্রবোধ কিন্তু পারল না। সে বয়স্ক শান্ত কঠিন মনের মানুষ। সব কিছুতে নির্বিকার থাকাই তার অভ্যাস। অথচ বাসের আলোয় দেখা পথের পাশে যমুনার মূর্তি—এখন পৃথিবীতে সবার চোখে ঘুমের আদর—আর এই একটি অনাথা আদরহীনা হতভাগা মেয়ে! মানুষ তার পাপের জন্যে ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করবে। প্রবোধের কী অধিকার!

প্রবোধ তৃতীয়বার মুন বলে সম্বোধন করে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। সব দোষ আমার মুন, আমিই ভুল করেছিলাম মা। সে বারবার জবাবদিহি করছিল।

ছোটবাবার হাতে যমুনার হাত। ওরা ফিরল।

সত্যচরণকেও প্রবোধ দেখেছে। দেখবার পর, আশ্চর্য, প্রবোধ ভেবেছিল, রাণীচকে নেমেই আগে যমুনাকে ঘুম থেকে জাগাবে। গলা টিপে মারবে। তারপর সত্যকে তাড়া করবে বিলের দিকে। এ দায়িত্ব সহসা যেন তার কাঁধে চেপে বসেছিল কিয়ৎক্ষণ। তারপর একটা বাঁক মাত্র। আলো হঠাৎ যমুনাকে দেখিয়ে দিয়েছে। কী করতে যাচ্ছিল যমুনা, প্রবোধ মুহূর্তে বুঝেছে।

আজকাল আর ঘরে বাড়তি খাবার থাকে না। সত্য কোন বেলা খেতে আসে, কখনও আসে না। নলিনবাবুর কারখানায় হয়ত খায়-টায়। কোন দিন লুট করে এসে টেবিলে কিছু টাকা রেখে যায়। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। সুতরাং কুনাইপাড়ার চাঁপা গিয়ে আকালী জুটেছে। তাকে দিয়েই বাজার করায় যমুনা। দুঃখের কথা, চালও কিনে খেতে হচ্ছে। সুতরাং রাতদুপুরে ছোটবাবাকে খেতে দিতে মন আঁকুপাকু করলেও মুখ ফুটে বলার সাধ্য ছিল না যমুনার। ঘরে মুড়িও থাকে না। সকালে চাটাও আকালী বাইরে থেকে এনে দেয়। দু কাপ আনে—দু জনে ভাগ করে খায়। সঙ্গে দু-চারটে নোনতা বিস্কুট। বুড়ি পয়সাকড়ি চায় না—এই যা রক্ষে। সে দুটো পেটে খেতে পেলেই সুখী। অ্যাদ্দিন জামাইয়ের ঘরে মেয়ের কাছে দুবেলা লাথিঝাঁটা খাওয়ার চেয়ে এ তার স্বর্গ তো বটেই।

প্রবোধ ব্যাগ খুলে ডাকছিল, আলোটা নিয়ে আয় মা।

যমুনা নিরুৎসাহী কণ্ঠে বলল, কী হবে? থাক না, সকালে হবে।

প্রবোধ ভিজে মুখে একটু হাসল।...পর হয়ে গেছি, না রে মুন? এটা তোর ভাগ্যের শাস্তি বলে মেনে নিস মা। এবার তো আমি এসে গেছি।

যমুনা মনে মনে বলল, দেরী করে এসে আর কী আশা করছ

ছোটবাবা? তারপর নির্বিকার মুখে আলোটা নিয়ে গেল।

ব্যাগে একটা শালপাতা ঢাকা মিষ্টির ঝুড়ি বের করে প্রবোধ বলল, নে।

যমুনা মুখটা নামিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। ও তো যমুনার জন্যে আনা হয় নি। ছোটমার বরাদ্দ জিনিস। সে জানে।

প্রবোধ একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, মুন, রাগ করিস নে। অনেক কর্তব্য থাকে মানুষের, করা হয়ে ওঠে না। অ্যাদ্দিন বিষয়-আশয়ের নেশায় এমন মেতে ছিলাম, কত কী লক্ষ্য রাখা হয় নি। এটা দোষ বলে মানিস। ক্ষমা করে দিস।

যমুনা মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি এখানে এসেছ জানলে ছোটমা তোমাকে বাড়ি ঢুকতে দেবে না।

কথাটার মধ্যে পুরনো যমুনাকে আবিষ্কার করেই যেন—অতি দুঃখের মধ্যে প্রবোধ হো-হো করে হেসে উঠল।...বাড়ি কি তোর ছোটমার রে? বাড়ি তো তোর। আমার যা কিছু সবই তো তোর জন্যে যমুনা।

কী বললে? যমুনা পলকে বদলে গেছে। থরথর করে কেঁপে উঠেছে। পরক্ষণে রাগে-ক্ষোভে সে পিছন ফিরে দ্রুত ঘরে গিয়ে ঢুকল। প্রবোধ তাকে অনুসরণ করে গিয়ে দেখল, যমুনা এবার কাঁদছে। ছটফট করছে। বিষ গিলেছে হতভাগিনী। কতকাল এমন ছটফট করবে কে জানে!

সে রাতটা বড় অদ্ভুত সব স্বপ্নের মধ্যে কেটে গেল যমুনার। যতবার গোঁ-গোঁ করে উঠছিল, প্রবোধ খুব কাছ থেকেই সাড়া দিচ্ছিল, এই যে আছি।

সকালে অভ্যাসমত হনহন করে বাড়ি ঢুকেই সত্য অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে উঠোনে। পালাবে কি না ভাবছিল হয়ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধ নেমে গিয়ে তার ছেঁড়া ময়লা জামার কলারটা ধরে ফেলেছে। হিড়-হিড় করে টেনে এনেছে বারান্দায়। সত্য ঘামে-ভেজা মুখ নামিয়ে বলল, লাগছে, ছেড়ে দাও।

প্রবোধ সজোরে চড় মারল ওর গালে। চড় খেয়ে সত্য পড়ে গেল।

দ্বিতীয়বার মারতে গিয়ে প্রবোধ থামল। কাকে মারছে সে? কোথায় সেই সত্যচরণ? সেই বলিষ্ঠ বিশাল শরীর কোথায় খুইয়ে বসেছে। প্রত্যেকটি হাড় গোনা যায। চোয়াল উঁচু হয়ে গেছে। গাল বসে গেছে। চোখ দুটো কোটরগত। নাকটা অসম্ভব খাড়া হয়ে উঠেছে। সারা মুখে দাড়িগোঁফের জঞ্জাল, মাথায বিশৃঙ্খল বড় বড় ধূসর চুল। কত দিন স্নান করে নি কে জানে। দাঁত মাজেনি কত দিন। চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে। আস্ত পিশাচেব মত দেখাচ্ছিল সত্যকে।

অদূরে বারান্দায় যমুনা দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখটা অন্য দিকে ঘোরানো। প্রবোধ তার দিকে তাকাল। এ দৃষ্টিতে কিছু ভর্ৎসনা ছিল বুঝি। যমুনা, তোর হার হয়েছে। আর যমুনাও এবার মুখ ফেরাল। পরস্পব নিঃশব্দ চাহনিতে কিছু কথা বিনিময হল যেন। কিছু বাদ-প্রতিবাদ। সত্য কেমন হাসছিল। আমাকে বিনা দোষে মারলে প্রবোধদা?

প্রবোধ গর্জে উঠল, চুপ, পাঁঠা কোথাকার।

সত্য তেমনি হাসিমুখেই বললে, সব শালাই পাঁঠা। ও কথা ছেড়ে দাও। কখন এলে? দিদি ভালো আছে তো?

জবাব দিল না প্রবোধ। কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না সে।

কেন রাগ করছ প্রবোধদা। যমুনাকে নষ্ট করেছি বলে?

প্রশ্নটাতে হয়ত বা একটা অসহায় আর্তি ছিল, প্রবোধ মুখ ফেরাল। ...সেদিকে তোর জ্ঞান টনটনে দেখছি। কিন্তু এসব কী করছিস, ভাবছিস না তো!

কী করছি? সত্য বারান্দার দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল।

কী করছিস? প্রবোধ ফের মারমুখী হল। লজ্জা নেই ইতর কোথাকার? ভদ্রবংশেব ছেলে, লেখাপড়া শিখেছিস, আর এই সব কেলেঙ্কারী করে যাচ্ছিস নির্বিবাদে?

সত্য গলা ঝেড়ে বলল, বিয়ে যমুনাকে করি নি, সেটা সত্যি। কেমন করে করি? দিদির কাছে হুকুম চাইতে গিয়েছিলাম, দিদি বঁটি তুলে মারতে এল।

প্রবোধ ভেংচি কেটে বলল, ভারি দিদিভক্ত ভাইটি। দিদির হুকুমের

ধার ধারিস ?

সত্য একগাল হাসল।—ঠিক আছে। তুমিও তো ওর গার্জেন বটে—তুমিই হুকুম দাও।

প্রবোধ দু পা এগিয়ে এসে ফের ওর কলার ধরতেই সত্য হাঁউমাউ করে উঠেছে।—এই মাইরি প্রবোধদা, মরে যাবো, মাইরি দু চোখের দিব্যি, মরে যাব! তোমার পায়ে পড়ি। আর মেরো না। গায়ে এতটুকু শক্তি নেই দাদা। দিব্যি করছি, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।···

পায়ে হাত বাড়াতে এলে প্রবোধ পিছিয়ে এল। না, মারতে চায় নি সে। কী অধিকার তার? তবে একটা দায় কাঁধে রয়ে গিয়েছিল— এই যা। সে বলল, মারব না। চল্, এক্ষুনি চল আমার সঙ্গে।

সত্য উঠে দাঁড়াল হাত দুটো জোড় করে।···চল, কোথায় যেতে হবে।

প্রবোধ ওর হাত ধরে বলল, সেলুনে চল্ আগে।

বলির পাঠার মত কাঁপছিল সত্য। তারপর ?

তারপর···প্রবোধ একটু হাসল।···তারপর চান করবি।

হুঁ। তারপর ?'

তারপর তোকে বলি দেব।

যমুনার মুখে হাসি ফুটেছে এতক্ষণে। সে পিছু ডেকে বলল, ছোটবাবা, যাচ্ছো তো বাজারটা করে এনো বরং। ব্যাগ আর টাকা নিয়ে যাও। বুড়ি তো এখনও এল না। অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি কে জানে!

সত্য মুচকি-মুচকি হাসছিল। প্রবোধ একটু বিস্মিত হয়েছে এদিকে। এতক্ষণ পরে সে টের পেয়েছে, সত্যর এইসব ব্যাপার আদৌ সুস্থতার পরিচয় নয়। এ যে সত্যি সত্যি পাগলের লক্ষণ! তবে কি সত্যি পাগল হয়ে গেছে সে? প্রবোধ স্থিরবুদ্ধি অভিজ্ঞ মানুষ। তাই ঠাণ্ডামাথায় ব্যাপারটা ভাবছিল সে। ভাবছিল, আজ বাড়ি যাওয়া ঠিক হবে না। আপাতত সত্যকে নিয়ে ফের বহরমপুরে কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

শুধু ব্যাগটাই নিল প্রবোধ, টাকা নিল না। সেটা কি সম্ভব হয়

পৃথিবীতে ? পৃথিবী এখনও ততটা বদলে যায় নি।

ওরা ছুটিতে ফিরল যখন, যমুনার সংসারে হারানো শ্রীটাও ফিরেছে দেখা যাচ্ছিল। একটা স্বাভাবিকতা এসে পড়েছিল বহু দিন বিরতির পর। উঠোন ঝকমকে পরিষ্কার। সব আগাছা আর ঘাস সাফ হয়ে গেছে। শিউলিগাছের তলা থেকে ঝরা ফুলগুলো ঝেঁটিয়ে নর্দমায় ফেলে দিয়েছে। ফলবতী গাছটা নিঃশব্দে হাসছে। আরও সব কত কী টুকিটাকি কাজকর্ম করা শেষ। বারান্দায় আগের মত ঝকমক করছে ঘটি-বাটি থালা আর পেতলের কলসীটা। যমুনার সংসার হেসে উঠেছে। যমুনার আঁচলটা কোমরে জড়ানো। রুক্ষ চুলে ধুলোর ছোপ। ঘাসের কুচি তখনও লেগে আছে। আর সত্যকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল কত দিন বাদে। স্নান করতে যাবার মুখে যমুনার চোখ ফেটে জল এল। থাকবে তো সব অটুট হয়ে টি*কে ?

থাকবে। প্রবোধের মত মানুষ মাথার ওপর এসে দাঁড়িয়ে গেছে। আর ভয় নেই যমুনার। কিন্তু একটা অস্বস্তি এবার বড় আর স্পষ্ট হয়ে উঠছিল মনের ভিতর। সময় হয়ে এসেছে এতদিনে। অভিজ্ঞা আকালী আজকাল রাত্রে তার কাছে থাকতে চায়। কখন মা হওয়ার যন্ত্রণা ফেটে পড়ে হঠাৎ বলা যায় না। এ সময় মেয়েদেব পাশে মেয়েদের থাকা খুবই জরুরী। যমুনা আকালীকে থাকতে দেয় না। বরং একা সারারাত জেগে থাকে, সেও ভালো। কারণ কখন সত্য এসে পড়ে ঠিক নেই। তারপর তার সঙ্গে ঝামেলার চূড়ান্ত হয়ে যায় কোন কোন রাত্রে। সেটা বাইরের লোকের সামনে ঘটবে, এটা যমুনা পছন্দ করে না।

ঘাটে বসে অনেকক্ষণ দেরী করে ফেলল যমুনা। শরীর অসম্ভব ভারী লাগছিল। শরীর আর আগের মত গোপন আরেকটা শরীরকে লুকিয়ে থাকতে দেয় না। প্রকট হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড স্ফোটকের মত। আশ্চর্য, এই শরীর নিয়ে নিঃসঙ্কোচে কাল রাত্রে যমুনা হাইওয়েতে হেঁটে গিয়েছিল। এতটুকু কষ্ট হয় নি তার।

কষ্ট কোনদিনই হয়নি। আকালী বলত, ওই তো একরত্তি মেয়ে—তার

পেটটাও যা হবার হয়েছে। সে কি জ্বালার মত মোটা হবে? সে হবে ঘটির মত এট্টুখানি। অ' বৌমা, তোমার খোকাখুকু দেখবে এক চিলতে পিদীম হয়ে ফুটে এসেছে!

বুড়িটা আবার বৌমা বলে ডাকে। দুঃখে হাসি পায় যমুনার।

জলে নামবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ নাভির নিচের দিকে একটা প্রচণ্ড অথচ সূক্ষ্ম যন্ত্রণা শিসিয়ে উঠেছিল। হেমন্তের ঠাণ্ডা জল অসম্ভব গরম লাগছিল। স্থির থাকতে চেষ্টা করছিল যমুনা। শান্তভাবে কুলকুচো করছিল। তারপর সে মাথা ডোবাল। দু'হাত জলে ভাসিয়ে খেলা করল। কিন্তু আবার, আবার!

ভয় পেয়ে হুড়মুড় করে উঠে এল সে। বাড়ি ঢুকে যন্ত্রণার্ত মুখে কোন রকমে গা মুছে কাপড় বদলে ঘরে ঢুকল। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না যমুনা। বিছানায় গড়িয়ে মুখ ঢাকল দু'হাতে। সত্য বালতি হাতে নেমে যাচ্ছিল উঠোনের দিকে। প্রবোধ কোমরে গামছা বেঁধেছে। হাতে একটা নতুন মোড়কবাঁধা সাবান, একটা ঝিঙেখোসা। শালাকে প্রচণ্ড রকমের ধোলাই করার ইচ্ছে তার মনে তোলপাড় হচ্ছে। বস্তুত প্রবোধের এই স্বভাব। যা করে, জেদের বশেই করে। যতক্ষণ না শেষ হয়, তার উদ্যমে ভাঁটা পড়ে না। ডিভোর্সের মামলাতেও এমনি নিষ্ঠা তার ছিল। হার হল। কিন্তু হার প্রবোধকে দমিয়ে দেয় না। সে হারজিৎ মনে রেখে কিছু করে না। যা করার তা নির্বিচারে করাই তার অভ্যাস।

সত্যকে ডলাই-মলাই করে একেবারে লাল করে ফেলেছে এবং সত্য হাসিমুখে চোখ বুজে বাচ্চা ছেলের মত আঃ উঃ মাইরি মরে যাবো ইত্যাদি করছে যখন, তখন আচমকা প্রবোধ যমুনার ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। বাজার বারান্দায় পড়ে রয়েছে। যমুনা বেরচ্ছে না কেন? রান্না করবে কখন?

তারপর বোঝা গেল সব।

সত্যকে বহরমপুর নিয়ে যেত প্রবোধ। সঙ্গে যমুনাও যেত। রথ দেখা

কলা বেচা দুই-ই চুকিয়ে ফেলত। সত্যর জন্যে ডাক্তার, তারপর কালীবাড়ি গিয়ে পুরুত সংগ্রহ—

সবই যমুনার ভাগ্য। কোন জন্মে কী পাপ করেছিল কে জানে! তা না হলে অকালে মা-বাবার মাথা খাবে কেন, এমন সর্বনাশই বা ঘটাবে কেন নিজের?

রাণীচকে আজকাল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীও রয়েছে। খুঁজে-পেতে শেষ অব্দি হাটুবাবুর সাহায্যে ব্রজলালের স্টেশন-ওয়াগনটা পাওয়া গেল। দুপুর নাগাদ গাড়িটা সত্যর বাড়ির দরজায় এসে গেল। যন্ত্রণায় প্রায় অজ্ঞান যমুনা আর জামাইবাবুর মত লালচে হয়ে ওঠা সত্যচরণকে নিয়ে বেচারা প্রবোধ বহরমপুরের দিকে ছুটল।

সরকারী হাসপাতালে মেটারনিটি ওয়ার্ড একটা রয়েছে। গেটের কাছে এসে হঠাৎ মত বদলাল প্রবোধ। নাঃ, দুলু-ডাক্তারের নার্সিংহোমেই যাওয়া যাক। চেনা ডাক্তার—প্রসূতিদের ব্যবস্থাও খুব ভালোই সেখানে। ছেলেপুলের মা হবার সাধ নিয়ে সুভদ্রা এখনও মাঝে-মাঝে ওখানে আসে।

সঙ্গে টাকা-কড়ি বেশি ছিল না প্রবোধের। তাই সব ব্যবস্থা করে সত্যকে ডাক্তারের চেম্বারের বারান্দায় বসিয়ে রেখে সে বেরিয়ে পড়েছিল। বহরমপুরে জানাশোনা লোক অনেক আছে তার। টাকার অভাব হবে না।

সত্য একটা বেঞ্চে বসে পা দোলাচ্ছিল। নার্সদের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছিল। মনে মনে একটা চূড়ান্ত কিছু করে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছিল তার। চোখ দিয়ে লেহন করছিল তাদের। সাদা পরীদের মত অ্যাপ্রনের নীচে কী সব বিচিত্র সুন্দর রক্তিম ফলের আয়োজন রয়েছে পৃথিবীতে। কেন যে ছাই আইন-কানুন চক্ষুলজ্জা পুষে রেখেছে মানুষ! দাও না একবার সব ফর্দাফাঁই করে! হুঁ হুঁ বাবা, অনন্তকাল ধরে সুরতলীলায় পটু হতে পারি। দেখ না একবার পরীক্ষা করে।...এই, শুনছ?

মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটা—এই শুনছ?

মুটকীমত একজন নার্স যেতে যেতে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরাল। কিছু বলছেন?

সত্য হাত কচলে সলজ্জ হাসল। নাঃ, আপনি যান। ভিতরে আমার বৌ আছে। ছেলেপুলে হবে।

পাগল! হাসতে হাসতে চলে গেল নার্সটা।

হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে সত্য বেরলো। ধুত্তেরি, নিকুচি করেছে সব! এক খানকীর ছেলে হবে আর আমাকে বসে বসে কাল গুনতে হবে! মামা-বাড়ির আব্দার পেয়েছে সব।

বিকেলের ঠাণ্ডা আলোয় যথার্থ মেজাজী বাবুর মত সত্য হেঁটে যাচ্ছিল। হাতে কোঁচা লেপটানো। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী। স্লিপারটাই যা ছেঁড়া। রাস্তার ধারে এক মুচির কাছে একটা পা বাড়িয়ে সত্য বলল, একটুখানি পট্টি দিয়ে দেবে দাদা? পয়সাকড়ি কিচ্ছু নেই কিন্তু। দু-পকেটে হাত ভরে শূন্যতা বোঝাবার চেষ্টা করল সে।

মুচিটা একবার মুখের দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে হাতের ইসারায় অন্য জায়গায় চেষ্টা করতে বলল।

গাল দিতে দিতে সত্য এগোল। এই রোস। শালা সুখেনবাবুর কাছে দু'হাজার টাকা পাওনা আছে! বাঃ, মনেই ছিল না কথাটা!

সঙ্গে সঙ্গে হন-হন করে হাঁটতে থাকল সে। বিকেলের দিকে সদর রাস্তায় বেশ ভিড় হয়। ভিড় ঠেলে—প্রায় ধাক্কা মেরে, গাল দিতে দিতে এবং গাল খেতে খেতে সত্য এগিয়ে যাচ্ছিল। পথ যেন ফুরোতে চায় না।

এই তো কল্পনা সিনেমার মোড়। কী ছবি হচ্ছে? সুখেন টাকা দিলে বেড়ে মজাই না হবে! বরং সুখেনের সঙ্গেই মাল খাবে। সুখেন অবাক হয়ে বলবে, তুই এসব খাস সতু!

রোস শালা মাগীবাজ কুত্তা। আমিও একটা আস্ত রামপাঁঠা। তোমার শহরে কত ছেনাল আছে, গুনে-গুনে নগদ টাকায় কিনে ফেলব। লাগাও ফুর্তি, লে-লে বাবু ছে-ছে আনা!

একটি মেয়ের গায়ে ইচ্ছে করেই গা-ঘেঁষে দিয়েছিল। সে অসভ্য

বলতেই সত্য হা-হা করে হেসেছে। মেয়েটি বলল, পাগল একটা!

এতক্ষণ পরে সত্য চমকে উঠল। এই অচেনা সুন্দর মেয়েটিও তাকে পাগল বলছে। সে কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে? বুকটা দুহাতে চেপে ধরে কিছুকাল পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর মাথা ঝাঁকি দিয়ে যেন পাগলামিটাকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ।

ফের হাঁটতে হাঁটতে—অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে অলক্ষ্যে অন্যমনস্কতায় 'লীলা প্রেস' ছাড়িয়ে সত্য কখন প্যারেড গ্রাউণ্ডের কাছে এসে পড়েছে।

বাঁদিকে এক টুকরো ফাঁকা মাঠ। তার ওপাশে চৌকোনো মস্তো পুকুর—লোকে বলে লালদীঘি। মাঠের দিক থেকে দুটি মেয়ে হেঁটে আসছিল।

একজনকে ভীষণ চেনা মনে হচ্ছিল। পশ্চিমে সূর্য। সে আসছিল পূর্ব থেকে পশ্চিমে। তাই সে এগিয়ে আসছিল—কিন্তু সামনেব দাঁড়িয়ে পড়া লোকটাকে চিনতে পারছিল না।

খুব কাছে আসতেই সত্য চিৎকার করে উঠল, লীলা, কেমন আছো?

মুহূর্তে লীলার বুকটা ছাঁৎ করে উঠেছিল। সামনে সব আলো ঢেকে বিশাল—কিন্তু একটা রুগ্ন পাংশু ধূসর আবছায়ার পাহাড় এসে দাঁড়িয়েছে কোথা থেকে। ছেলেবেলায় অত সাহসী মেয়ে—যেমন জুজুর ভয় দেখালে নীল হয়ে যেত তার দুধে-আলতা রঙ—তেমনি নীল আর খড়িখড়ি চেহারায় ক'মুহূর্ত লীলা তাকিয়ে থাকল। একটা দুঃস্বপ্নের মত কোথা হতে অতর্কিতে তার অনভিপ্রেত অতীতকালটা এসে সামনে স্থির হয়ে গেছে। মাথার ওপর যেন একটা প্রকাণ্ড খাঁড়া। সেই কাটিং মেসিনের দাঁতটা নেমে আসছে।

পরক্ষণে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে চলবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু সত্য ফের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রমা অবাক হয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। লীলাদির কোন চেনাজানা কেউ হবে।

লীলা, চিনতে পারছ না? আমি সতু, সত্যচরণ। সত্য হাসবার চেষ্টা করছিল।...অবশ্যি না চেনবারই কথা। শরীরের অবস্থাটা দেখেছ? তুমি কিন্তু বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছ মাইরি।

লীলার মুখটা জ্বলে উঠেছে এবার। অন্য পাশে ঘুরে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, পথ ছাড়।

ছাড়ব? কেন পথ ছাড়ব? সত্যর গলায় একটা অভিযোগের চাপা সুর। 'ছাড়ব বললেই কি ছাড়া যায় লীলা? তুমি তো নাবালিকা নও। অগ্নিসাক্ষী মন্ত্রপাঠ সাতপাক—আইন বললেও তা ছাড়া যায় না কিছু। তুমিই বলো, যায়?

লীলা হতবাক রমার উদ্দেশ্যে বলল, রমা, ওকে বলো—এক্ষুনি লোক ডাকব।

রমা বুঝেছে এতক্ষণে। সে এগিয়ে এসে বলল, এক্ষুনি চলে যান এখান থেকে। মেয়েদের অপমান করছেন কী সাহসে?

খিক-খিক করে হাসল সত্য।···আপনি জানেন না ম্যাডাম, ও আমার কে। জানলে আপনিই ওর নিন্দে করতেন। বলতেন, যা হবার হয়েছে, সংসারে অমন কতশত হয়—তা বলে জন্মবিচ্ছেদ? মাথা নাড়ল সত্য। অসম্ভব। বলুন, আপনাকেই জজসায়েব মানছি। আপনি বিচার করে যা রায় দেবেন. মাথা পেতে নেব। বলুন, বলুন···আঃ, চুপ করে থাকবেন না। বলুন ম্যাডাম!

এবার রমা লীলার হাত ধরে পাশ কাটাবার চেষ্টা করল। সত্য মরীয়া হয়ে গেল যেন। যথারীতি সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলে উঠল, লীলা, দোহাই তোমার। ঘাট মানছি। নাককান মলছি। যা খুশি করো কিচ্ছু বলব না। শুধু আমার সঙ্গে ফিরে চলো লক্ষ্মীটি। লীলা, এই, শুনছ? কথা তো বলো—একটা জবাব দাও।

চোখ ফেটে জল গড়াচ্ছিল সত্যর। কেন আমাকে ফেলে পালাবে তুমি? কী দোষ করেছিলাম? যদি করে থাকি, তার শাস্তি কি এই? অসম্ভব লীলা. এ হয় না—হতে পারে না। আমরা এক হয়ে আছি। আলাদা হওয়া যায় না। সব মিথ্যে হতে পারে, মন্ত্র মিথ্যে হয় না।

আগুন মিথ্যে হয় না।

হাঁফাচ্ছিল সে। লীলা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে চারপাশে বুঝি চেনা মানুষ খুঁজছিল।

সত্য জবাব না পেয়ে ফের বলতে থাকল, আমার সংসারটা শ্মশান করে দিয়ে তুমি কি খুব সুখী হয়েছ লীলা? তুমি পাপ করে সুখী হতে চেয়েছিলে—জানি না তুমি কী সুখে আছো। আমিও তোমার দেখাদেখি পাপ করে দেখতে চাইছিলাম, কতটুকু সুখ মেলে। বুকে করাঘাত করে সত্য বলল, মেলে না। শুধু বুকটা জ্বলে যায়। ক্ষিদে মেটে না! সংসার দাউদাউ করে পুড়ে যায়। নরক, শুধু নরক! সামনে পিছনে নরক নিয়ে হাঁটছি লীলা। আমার কী হবে?

চৌমাথার বাঁক ঘুরে একটা মোটরসাইকেল কাছাকাছি এসে থামল। রমা হাঁফ ছেড়ে ডাকল, লালুদা, এই ভদ্রলোক আমাদের অপমান করছেন।

মোটরসাইকেলটা দাঁড় করিয়ে মসমসিয়ে হেঁটে এল লালু। কী হয়েছে দাদা? কী বলছেন এঁদের?

লীলা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই লালু সত্যর হাত ধরেছে। সত্য বলল, আঃ লাগছে, ছাড়ুন। ও আমার বৌ।

ব্যস! এবার লালুর কাছেও ব্যাপারটা পরিষ্কার। সে সত্যর ঘাড়টা ধরে বলল, আমার সঙ্গে চল। সুন্দর-সুন্দর বৌ জুটিয়ে দিচ্ছি। শালা গাড়ল কাঁহেকা।

গতিক দেখে সত্য রাগল।..গাল দেবেন না বলছিঃ আমি ভদ্রলোকের ছেলে। সুখেনবাবুর মত যার-তার বৌ ভাগিয়ে নেওয়া অভ্যেস নেই।

ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল সত্য। ওদিকে লীলা আর রমা হাঁটতে শুরু করেছে। দুচারজন কৌতূহলী লোকের ভিড় জমছিল। সত্য চেঁচিয়ে লীলার উদ্দেশ্যে বলে উঠল—বেশ, বেশ। তাই হবে। কিন্তু তোমার সুখেনবাবুকে বলো, আমার পাওনা দুহাজার টাকা যেন শিগগির মিটিয়ে দেয়। নৈলে ওর একদিন কি আমার। ভদ্রলোকের ছেলে বলেই এ্যাদ্দিন

কিছু বলছি না।

লীলা যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। টাকা—টাকা তাহলে সুখেন ওকে দিয়ে আসে নি? রমা বলল, চলুন লীলাদি, সীন ক্রিয়েট হচ্ছে।

সত্য উঠে ফের কয়েক পা এগোচ্ছিল। আরও কিছু বলার কথা বাকি রয়ে গেছে। এগোতে দিল না লালু। এসব ক্ষেত্রে মার দেবার জন্যে হাত সুড় সুড় করা তার স্বাভাবিক তো বটেই।

সুতরাং উপর্যুপরি ঘুষির আঘাতে সতুকে রক্তাক্ত মুখে লুটিয়ে পড়া ছাড়া রেহাই নেই। আরো দুচারজন ইত্যবসরে জেনে নিয়েছে, লোকটা কোন ভদ্রমহিলার হাত চেপে ধরেছিল। তারাও বাগে পেয়ে কিছু চালাল।

ছোট্ট অহিংস একটা ভিড় সত্যকে ঘিরে রেখেছে অবশেষে। লালু রুমালে হাত মুছতে মুছতে গাড়িটায় স্টার্ট দিল।

চৌরাস্তার কাছে ফের লীলা থেমেছে। এদিকে ঘুরে ভিড়টা দেখছে। মরে গেল নাকি? পাগল হলে মানুষের এরকম দুর্গতি তো হবেই।

কী হল লীলাদি, চলুন! রমা ডাকছিল।

একটা রিকশো ডাকো। হাঁটতে পারছি না।

মাথা ঘুরছিল লীলার। সুখেন চলে যাবার পর পৃথিবীটা যেমন শূন্য, তেমনি ক্লান্তিও ছড়ানো সবখানে। পা ফেললেই পায়ে তা জড়িয়ে যায়। কেন বেঁচে থাকা? কেন আশশেওড়ার গাছে দড়ির ফাঁসটা পরতে গিয়ে নীচের দিকে পণ্ডিতমশাইকে দেখে সে হেসে ফেলেছিল? ওই রঘুপণ্ডিতই তাকে খেল সেদিন। অজগরের বুকের ভিতর সেই থেকে বাস চলেছে তার। স্যাঁতসেঁতে ভ্যাপসা দুর্গন্ধ সবকিছু। ক্রমশ সব হজম হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। একদা কিছু বাকী থাকবে না নিজের বলে।

রিকশোয় রমা আড়চোখে দেখল লীলা তাকে লুকিয়ে চোখে রুমাল ঘষছে। রমা অন্তরঙ্গভাবে পিঠে হাত রেখে চাপাস্বরে ডাকল, লীলাদি।

বলো।

থাক্. কিছু না।

কুড়ি

খাতির থাকায় প্রবোধের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল না রাত্রিবাসের। নীচের ঘরের ঢাকা বারান্দার একটা ক্যাম্বিসের খাটিয়া আর বিছানার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রবোধের ঘুম আসবার কথা নয়। বারবার সে বাইরে উঁকি মেরে সত্যর প্রতীক্ষা করছিল। কখনও ওপরে উঠে গিয়ে যমুনার খবর নিচ্ছিল। যমুনার আসল যন্ত্রণা শুরু হতে নাকি দেরী আছে। চব্বিশ ঘণ্টা তো বটেই। তবে ভয়ের কথা—ভ্রূণ একে অপরিণত, তায় উল্টোভাবে অবস্থান করছে। ডাক্তারবাবু বলছিলেন, আজকালের মধ্যে সম্ভবত খুব ভয়ানক রকম একটা আঘাত লেগেছিল পেসেন্টের। সেটা মানসিকও হতে পারে।

ঠিক তাই। প্রবোধ রাত্রে স্পষ্ট দেখেছিল যমুনা গাছটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হতভাগিনী মরতে গিয়েছিল। মরতে না গেলে কি কঠিন মানুষ প্রবোধও এমন বিচলিত হতে পারত?

কিন্তু সত্যর কাণ্ড দেখে রাগে মাথা খারাপ হয়ে যায়। প্রবোধ ভাবতেই পারে নি—ও এমন করে কেটে পড়বে! একটু-আধটু পাগলামির আভাস থাকলেও এ দুঃসময়ে ফেলে পালানোর মত পাগল সত্য তো হয়নি। আসলে হাড়ে হাড়ে খচ্চর বদমাইস।

প্রবোধের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছিল। তার চেয়ে যমুনার মরে যাওয়াই বোধ করি ভালো হবে। তার পেটের ছেলেটা যদি বাঁচে—আইনত সত্যর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। একটা জারজ ছেলে নিয়ে মায়ের গরবে কি গরবিনী হতে পারবে যমুনা? ওই ফুলের মত সুন্দর কচি মেয়ে! আহা!

দুলাল ডাক্তারকে শ্লিপ পাঠিয়েছিল প্রবোধ। রাত তখন একটা। উনি শুতে যান সচরাচর দুটোয়। প্রবোধ একটু ইতস্তত করে সব ঘটনা জানিয়েছিল। গম্ভীরমুখে ডাক্তার বলেছিলেন, এমন অনেক

হয়। আজকাল তো একসা হচ্ছে। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, এসব ভীষণ রিস্কি। পেসেন্টের শরীর যা দুর্বল দেখলাম, সাংঘাতিক কিছু রিঅ্যাকশান ঘটে যেতে পারে। কিছুদিন আগে হলে কথা ছিল না। প্রবোধ করজোড়ে বলেছে, যা হয় হোক—আপনি রিস্ক নিন ডাক্তারবাবু।

একটু হেসে ডাক্তার বলেছিলেন, কিছু মনে করবেন না প্রবোধবাবু। একটা কথা বলছি। আফটার অল আমরা মানুষ। কোন সমস্যা এলে তার সমাধানের চেষ্টা করাও আমাদের অভ্যাস। সে সমাধান সবসময় ভেঙে ফেলার ব্যাপার কেন হবে—যদি গড়ে তোলার আশা থাকে!

প্রবোধ জিজ্ঞাসু দৃষ্টে নীরবে তাকিয়েছিল মাত্র।

ডেলিভারী হতে দেরী হবে। যদি এখনও ঘণ্টা বারোচৌদ্দর মধ্যে সত্যবাবুকে এখানে হাজির করাতে পারেন, একটা লিগ্যাল ম্যারেজ ডিড রবনের করিয়ে নেওয়া যাবে। আমি সাক্ষী থাকব। ডেটটা কয়েকমাস আগের বসিয়ে দিলেই চলবে। আপনার খাতিরে এটুকু আমি করতে পারি।

অধীরভাবে প্রবোধ বলল, সেটা অবশ্যি পরেও করে নেওয়া যায়। কিন্তু আমার কাছে সমস্যাটা একটু অন্যরকমের। আমি যমুনার কথা ভাবছি। এই হতচ্ছাড়া স্কাউণ্ড্রেলটার হাত থেকে ওকে বাঁচাতে চাই ডাক্তারবাবু।

তাতে কি মেয়ে সুখী হবে? তার মতটাও তো জানা দরকার। এবং সেটা জেনেছিও

আইন• এখনও ও নাবালিকা। বুঝতেই পারছেন, অবোধ কচি মেয়ে।· প্রবোধ অশ্রু সম্বরণ করল।

দুলাল ডাক্তার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ভেবে নিয়ে বললেন, ধরুন—আজকাল এমন তো অনেক হচ্ছে—বাচ্চা যদি বেঁচে থাকে কোন আশ্রমেও রাখা চলবে। পরে বাচ্চা বড় হলে মা যদি ভাল বোঝেন চলে আসবেন……

প্রবোধ কথা কাড়ল, ছেলে থেকে যাবে?

হ্যাঁ। অনেকেই তো থাকে। মায়েরা ফের নতুন জীবন শুরু করেন।

জানাজানি হয় না ?

কিছু হয়, কিছু হয় না। তাতেও কোন অসুবিধে হয় না আজকাল।

মাথা নেড়ে প্রবোধ বলল, আমি বিষয়ী মানুষ, গ্রামে থাকি। ওসব ব্যাপার ভাবতেও কষ্ট হয়। মা আর ছেলে—বড় পবিত্র গভীর একটা সম্পর্ক। কেউ কাকেও ছেড়ে থাকবে—একথা ভাবলে আমার মত শক্ত মানুষের নাড়ি মোচড় দেয়। ডাক্তারবাবু, যত টাকা লাগে আমার আপত্তি নেই—আপনি রিস্ক্‌টা নিন। আমি মেয়ের একমাত্র গার্জেন। বণ্ডে সই করে দিচ্ছি। কই, বণ্ড দিন।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসলেন দুলাল ডাক্তার।···মানুষ খুন করাবেন ?

প্রবোধ হাসবার চেষ্টা করে বলল, এ তো আপনার কাছে নতুন কিছু নয় ডাক্তারবাবু। তাছাড়া শরীরেব কোথাও ক্যান্সার হলে আপনারা কেটে বাদ দেন। এও তো তাই।

আপনি তো মেয়ের কাকা ?

হ্যাঁ।

দুলাল মিত্র স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, আপনার নিজের মেয়ে হলে কী করতেন ?

স্তম্ভিত হয়ে প্রবোধ বলল, কেন ও কথা বলছেন ? কাকা-বাবার খুব কি তফাৎ আছে ?

হয়ত আছে।

বুঝতে পারছি না আপনার কথা। যমুনাকে আমিই মানুষ করেছি।

দুলাল মিত্র উঠে দাঁড়ালেন। ডোণ্ট মাইণ্ড। ওঠা যাক। আমার সময় হয়ে এল।

তাহলে কী হবে ?

দেখুন, আমরা আজকাল অনেক অসম্ভব সম্ভব করি। পেসেণ্টকে বাঁচিয়ে তার বাচ্চাটা নষ্ট করা আমাদের কাছে কঠিন কোন সমস্যা নয়। কিন্তু একটা কথা খুলে না বলে পারছিনে। পেসেণ্ট আমাকে বারবার বলেছে, তার যা হবে হোক, বাচ্চা যেন বেঁচে থাকে। এখন কথা হচ্ছে, আমি যা বুঝেছি, মেয়েটির যখন জ্ঞান হবে, সে বাচ্চার কথা জানতে

চাইবে। তখন যদি জানতে পারে যে···

জানতে দেবেন না।

কিন্তু এক সময় সে জানবেই। তখন কিন্তু ভীষণ শক পাবে। ওই হেলথ দিয়ে তাঁকে বাঁচানো যাবে না। এমন অনেক কেস যদি বা বেঁচেছে, সে বাঁচা মরার সমান।

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে প্রবোধ বলল, তাহলে মরবে। বণ্ড তো দিতেই চাচ্ছি।

হেসে উঠলেন দুলাল ডাক্তার।···আইনে এমন কোন বণ্ডের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া আগেই বলেছি লশাই, আফটার অল, আমি একজন মানুষ। মাফ করবেন প্রবোধবাবু, বাচ্চা নষ্ট করতে আমার আপত্তি নেই—অন্তত যেক্ষেত্রে তার মায়ের কোন আপত্তি থাকে না। আমি বারবার রিপোর্ট পেয়েছি, পেসেণ্ট তার বাচ্চার কথা জিজ্ঞেস করছে। এখন বলুন, আমার কী করা উচিত ?

প্রবোধ কোন জবাব দিতে পারল না।

প্রবোধবাবু, কথাটা আপনিও ভাবুন। অন্য ক্ষেত্রে প্রেমিক পালিয়ে যায় বা অস্বীকার করে বলেই মেয়েদের অবৈধ গর্ভের সমস্যাটা থেকে যায়। এখানে তো তেমন কিছু নয়। ওরা তো স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করছে। লিগ্যাল কোন ব্যবস্থা করিয়ে নিতে অসুবিধে নেই। সত্যবাবুর সম্পত্তির শরিক কেউ আছেন নাকি ?

নাঃ।

তাহলে নির্ভাবনায় ঘুমোন গিয়ে। আচ্ছা প্রবোধবাবু, আপনি একজন ঝানু আইনজ্ঞ মানুষ। এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বলুন তো ? যান, চুপচাপ ঘুমোন। সকালে যদি সত্যবাবু না আসেন, একবার খুঁজে দেখবেন। সম্ভবত একটা ইনস্যানিটি গ্রো করেছে ওঁর মধ্যে। সেটা—যা শুনলাম, খুবই স্বাভাবিক। সে আমি ঠিক করে দেব'খন। হাজির করবেন আমার কাছে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রবোধ অস্থির আর হতাশ ভাবে নেমে এল। কেউ বুঝবে না—

সমস্যাটা কী। ভবিষ্যতে এ সমস্যার চেহারাই বা কী হবে, কেউ তাকিয়ে দেখছে না। প্রবোধ সংসারী অভিজ্ঞ মানুষ—তার চুলে পাক ধরতে চলছে, সে অনেকটা বুঝতে পারে।

যতক্ষণ না ঘুম এল, প্রবোধ কেবল চমকে উঠছিল—বুঝি সত্যর পায়ের শব্দ হল, বুঝিবা ওপরে যমুনার বাচ্চার কান্না শোনা গেল। ডাক্তারবাবু যাই বলুন, বাচ্চা হবার আগেই যদি না মন্ত্রপাঠের ব্যাপারটা চুকে যায়, ও সন্তান শাস্ত্রমতেও অবৈধ। জারজ।

শাস্ত্র! প্রবোধের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটছিল। শাস্ত্র নয়—একটা গভীর প্রাচীন অনুশাসন যেন রক্তের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এই সংহিতার সূত্রাবলী কোনমতে মানুষের কাছে মিথ্যা হবার নয়। লীলারাণীর কথা মনে পড়ছিল প্রবোধের। তার রক্তে—হ্যাঁ, একমাত্র তার রক্তেই সম্ভবত এটা নেই। কেন নেই, বুঝবার চেষ্টা করছিল সে। তারপর ঘুম তাকে স্বপ্নের দিকে ঠেলে দিতেই সে যেন সব সমস্যার সমাধান চোখের সামনে দেখতে পেল। সত্য আর লীলার বিয়ে হচ্ছে। টোপর-পরা বরকনের সঙ্গে রাশভারী প্রবোধ রসিকতার চেষ্টা করছে। সত্যর কপালে চন্দনের আল্পনা—সত্য দুহাতে মুখটা ঘষে বলছেঃ মাইরি প্রবোধদা, মুখটা চড়চড় করছে কেন? কেমন ঘা হয়ে গেল দেখছ? সত্যর সারা মুখে ঘা। যমুনা কেঁদে বলল, ছোটবাবা, আমাকে শহরে নিয়ে যাবে? সিনেমা দেখবার খুব সাধ হয় আমার। কে নিয়ে যাবে প্রবোধ ছাড়া? সুভদ্রা তেড়ে এল। মেরে মুখ ভেঙে দেব হতচ্ছাড়ী মেয়ের! অত সাজগোজের ঢঙ কেন এই বয়সে? নিত্যি একগুচ্ছের স্নো-পাউডার ঢেলে সঙ সাজা চাই। ও মেয়ে নির্ঘাৎ কপাল ভাঙবে দেখে নিও! রাগে প্রবোধ এতদিন যা পারে নি, তাই করে বসল। গালে চড় মারল সুভদ্রার।

ঝাড়ুদার পায়ে ঠেলা দিচ্ছিল, স্বপন হউচি। উঠ, উঠ।

ভোর। ধুড়মুড় করে উঠে বসল প্রবোধ। যমুনা কেমন আছে?

উপরে যেতেই চেনা নার্সটা নমস্কার করে বলল, দিদি ভালো আছেন। বাচ্চা হতে খুব দেরী নেই মনে হচ্ছে। বড় জোর ঘণ্টা তিন চার।

আর ঘণ্টা তিন চার মাত্র! বাসিমুখেই প্রবোধ বেরোল। উদ্‌ভ্রান্তের মত আরেক উদ্‌ভ্রান্তের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল সে। সত্য সম্ভবত এখনও শহর ছেড়ে যায় নি। পথে আসতে আসতে বেশ কয়েকবার বলছিল, সুখেনের কাছে অনেক টাকা পাওনা আছে। এ সুযোগে আদায় না করে ছাড়বে না। প্রবোধদা, তুমিও সঙ্গে থেকো কিন্তু। প্রবোধ কথাটা কানে নেয় নি।

প্রথমে লীলার প্রেসে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে সুখেনের। সুখেন প্রবোধকে চিনবে না। মামলার সময় দু-চারবার দেখেছে বড়জোর। সে কি মনে আছে তার?

অত সকালে প্রেস খোলে নি। অস্থির প্রবোধ এলোমেলো ঘুরতে থাকল ভূতে পাওয়া মানুষের মত। একবার ভাবল, আগে গিয়ে পুরুত মশায়কে সঙ্গে নেবে। তারপর দুজনেই ফের ঘোরাঘুরি করে খুঁজবে। পরক্ষণে ব্যাপারটা একটা সঙের মত মনে হল। রাশভারী হিসেবী মানুষটির এ দশা দেখলে সুভদ্রা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেত না।

এক সময় হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে। কী করতে যাচ্ছে ছেলেমানুষের মত? কে পারে? যে-অশুভক্ষণে যমুনা সত্যকে আত্মদান করেছে, তখনই পাপ যত্ন করে বিষের চারা রোপণ করেছে। সে বিষতরু যদি টিকে থাকে, কী ফল ছোটাছুটির, কেনই বা এই তোলপাড় আকাশ-পাতাল ভোরের শহর!

প্রবোধ গঙ্গার ধারে এল শান্ত পা ফেলে।

যমুনার কাছে তার বাচ্চা অবৈধ নয়—সব মায়ের স্বাভাবিক বাৎসল্য আর তৎপরতায় সে তাকে লালন করবে। এতটুকু কার্পণ্য থাকবে না নিশ্চয়। অথচ সংসার তাকে বলবে—অসিদ্ধ, জারজ। কী অধিকার আছে সংসারের? প্রবোধেরই বা কী অধিকার? যাদের ছেলে, তাদেরই। আর মানুষের জন্ম তো আগে-ভাগে জানিয়ে-শুনিয়ে হয় না। ওটা হয়ে যায়। সবার ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে।

গাছ থেকে ফুল ফোটে। ফুল থেকে ফল হয়। বীজ হয়। ফের গাছ জন্মায়। কী তোমার অধিকার যে তুমি আইন বেঁধে বৈধ-অবৈধর

ফরমান জারী করো? সবই প্রকৃতির হাতে। সে বড় রহস্যময়ী।

প্রবোধ সন্থ সূর্যের আলোয় রাঙা শান্ত চিকন স্বচ্ছ জলে স্নান করল। দু-হাত তুলে সূর্যপ্রণাম করল।

ওরা মা ও সন্তান বাঁচুক। বেঁচে থাক। পৃথিবীতে মানুষের জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী, বড় নিরানন্দ। তার মধ্যে স্নেহ আছে—আর আছে ভালবাসা। তাই মানুষের বেঁচে থাকাটা জরুরী মনে হয়। মনে হয়, সবকিছুর চেয়ে দামী তার বেঁচে থাকা।

ভেজা গায়ে প্রবোধ এসে তার বিছানার নীচে থেকে ব্যাগ বের করছিল। গামছা একটা সবসময় সঙ্গে থাকে। প্রায়ই এখানে-ওখানে যেতে হয় তাকে। তহশীলদারী চাকরী। প্রজাদের ঘরেই স্নানাহার চুকিয়ে নিতে হয় অনেক সময়।

সেই সময় হাসিমুখে চেনা নার্সটা এসে কাছে দাঁড়াল।···মিষ্টি খাওয়াতে হবে।

প্রবোধ ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। জিভ দেখা যাচ্ছিল হাঁ-করা মুখের ভিতর।

আপনার নাতি হয়েছে। ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা!

প্রবোধ ব্যস্তভাবে গা মুছতে থাকল।

আগে মিষ্টি আনুন, তারপর বলব ছেলে না মেয়ে।

প্রবোধ ঘড়ঘড় করে হাসল মাত্র।

আনবেন না তো! বেশ। কপট রাগ দেখিয়ে ফুলো ঠোঁট নিয়ে নার্সটা চলে যাচ্ছিল।

প্রবোধ ডাকল, শুনুন।

শুনব, আগে টাকা বের করুন।

সত্যি সত্যি ব্যাগ খুলে একমুঠো নোট বের করে প্রবোধ বলল, কই, কে যাবে মিষ্টি আনতে?

দেহে নাচের মুদ্রা ফুটিয়ে নার্সটি বলল, খোকা হয়েছে। ভারী সুন্দর। অবিকল দিদিমণির মত চেহারা। একেবারে পুতুলটি।

ঝাড়ুদারটা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা আঁচ করছিল। এবার সামনে

এসে হাত বাড়াতেই প্রবোধ তার হাতে টাকাগুলো গুঁজে দিল। তারপর তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে গলিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছিল। নার্স বলল, সবুর। এখন দেখতে পাবেন না। এইমাত্র ডেলিভারী হল।

যমুনা, যমুনা কেমন আছে?

এখনও জ্ঞান হয়নি অবশ্যি। তবে ভাববেন না। ও ঠিক হয়ে যাবে।

হারামজাদা সতুটা কোথায় থাকল কে জানে! প্রবোধ ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা টুকরো আয়না বের করে চুল আঁচড়াতে থাকল নিবিষ্টমনে।

কাল থেকে খাওয়াদাওয়া নেই। খিদের কথা একেবারে ভুলে বসেছিল। এখন স্নান করে খিদে জোর বেড়ে গেছে। প্রবোধ বেরোল। রাস্তার ওপাশেই পরিচিত হোটেল রয়েছে। বেশ ভালোই খাওয়ায়। রেটও বাজারের তুলনায় সস্তা।

প্রবোধ গোগ্রাসে খেল। বাইরে এসে পান কিনল। মেজাজে থাকলে সিগ্রেট খায়—নতুবা নয়। সিগ্রেট ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে কিছুদূর এগোল। আরেকবার দেখবে নাকি খুঁজে? এতক্ষণে লীলা প্রেস খুলে গেছে নিশ্চয়।

তবে যদি সত্যি সত্যি সুখেনের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে থাকে, সে একটা দুঃখের ব্যাপার হবে। গাধাটার তো এতটুকু লজ্জা-সংকোচ নেই। ও সব পারে। সেইজন্যেই তো ওর কত দুর্দশা।

লীলা প্রেসের দরজার পাশে টুলে একজন কে গরিলার মত মানুষ বসে রয়েছে। মুখটা চেনা মনে হচ্ছিল প্রবোধের। প্রবোধ কিছু বলার আগেই স্প্রিঙের পুতুলের মত সে নমস্কার করে বলল, ছাপার কাজ আছে? ভিতরে যান। খগেনবাবু আছে, কানাইবাবু আছে। আর আধ-ঘণ্টা পরে বড়দিদিমণিও এসে যাবে। ছোটদিদিমণি এইমাত্তর এসেছিল, বেরিয়েছে।

প্রবোধ একটু হেসে বলল, সুখেনবাবু আছেন? তাকেই চাই।

ঘণ্টা আকর্ণ হাসল।···তিনির কথা আর বলতে আছে? সে একমাস-দু'মাস হল, কলকাত্তা পালিয়ে গেছে না?

প্রবোধ সোজা হয়ে দাঁড়াল।···পালিয়েছে মানে?

ক্যানে, জগদীশের মেয়েকে নিয়ে ভেগেছে স্থখেনবাবু। ওরে বাবা, কদিন টাউন তোলপাড় হল না ওই নিয়ে! ছিলেন কোথায় গো?

ভিতর থেকে খগেন মুখ বাড়িয়ে বলল কার সঙ্গে কথা বলছ ঘণ্টুবাবু?

পলকে প্রবোধের মনে পড়ে গেছে। এ সেই লীলাদের বাড়ির চাকর ঘণ্টা। প্রবোধকে না চেনারই কথা তার। মাত্র বারকয় দেখেছে। প্রবোধ এগিয়ে বলল, আমি স্থখেনবাবুর খোঁজে এসেছিলাম।

চশমার ওপর দিয়ে চোখ বের করে ফিক ফিক করে হাসল খগেন।… কোন পাওনাটাওনা আছে বুঝি!

প্রবোধ গম্ভীরমুখে বলল, আছে।

অল্পসল্প, না মোটা?

বিরক্ত হয়ে প্রবোধ বলল, দু' হাজার।

বুড়ো আঙুল নাচিয়ে খগেন বলল, ওঁ ঈশ্বরায় নমো করে দিন মশাই। পাখি উড়েছে। শুধু আপনার নয়—একগাদা লোকের পাওনা মেরে উড়েছে। তবে সব থেকে মেরেছে জগার। তার চালচুলো যা ছিল, সব গেছে। ও মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে গাছতলায়। কোর্টের ওধারে গিয়ে দেখুন গে না! কে বলছিল, জগা লোক পাঠিয়েছে খুঁজতে। ওর নাম বাবা জগদীশ গুণ্ডা। সহজে ছাড়বে না।

কানাই বেরিয়ে এসে বলল, কী সব আজেবাজে বকছ কাজকম্ম ফেলে! এই যে স্যার, কিছু বলছিলেন নাকি?

প্রবোধ বলল, না। স্থখেনবাবুর জন্যে…

সে তো নেই। বলে কানাই ঢুকে গেল।

প্রবোধ তাড়াতাড়ি নেমে এল। লীলারাণী এসে পড়লে তাকে এখানে দেখে কী ভেবে বসবে। হয়ত ভাববে, শালার জন্যে কী স্বার্থের কারচুপি নিয়ে ঘুরঘুর করছে লোকটা!

বাঃ, চমৎকার হয়েছে তাহলে। প্রবোধ খুশী হল বিলক্ষণ। পাপীয়সী মুখের ওপর জুতোর ঘা খেয়েছে এতদিনে। কিন্তু প্রেসটা তাহলে সে নিজেই চালাচ্ছে। ভালোভাবেই চালাচ্ছে বোঝা যায়। চালাবে বৈকি—রূপপুরের ঘোষবাড়ির মেয়ে, তাতে কুমুদের কন্যা—একবার পা

টলেছিল, এবার সামলে নিয়ে যথারীতি হিসেবী চালে পা ফেলছে। ওই করেই সম্পত্তি করেছিল ওদের পূর্বপুরুষ।

লীলা ছিল তার শালার বৌ। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ বলে লীলা তাকে কত জ্বালাতনই না করত। রাগে পেলে প্রবোধও কিছু শোধ নিত। সেসব এক আশ্চর্য সহজ স্বাভাবিক দিন গেছে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রবোধ হাঁটতে থাকল। তবু মনের ভিতর একটুখানি কৌতূহল রয়ে গেল, আজকাল কেমন হয়েছে লীলার চেহারা? তাকে দেখলে কি আগের মতই কৌতুকময়ী হয়ে উঠবে সে?···সবই অভ্যাস! প্রবোধের মনটা বিমর্ষ হয়ে উঠছিল! এই অভ্যাসের বশেই মানুষ যেন বা আপন হয়, আবার পর হয়ে যায়। অথচ স্মৃতি নামে একটা কিছু আছে! তার হাত থেকে উদ্ধার কোথায় মানুষের? লীলাকে এখনও তার কত আপন মনে হচ্ছে! কত মিষ্টি একটা আত্মীয়তা!

সতুর বুকের উত্তাপটা প্রবোধ অনুভব করছিল। লীলা—লীলা কি রাক্ষুসী? পেরেছে স্মৃতির গলা টিপে মারতে? সেই বাসরঘর সেই ফুলশয্যা—সব এখনও প্রবোধের চোখে জ্বলজ্বল করছে।

দুপুর অব্দি এলোমেলো প্রায় সারা শহর ঘুরে বেড়াল প্রবোধ। চেনাজানা কারুর সঙ্গে দেখা হলেই সে সত্যর খবর জিজ্ঞেস করছিল। কোন খবর নেই।

অবশেষে ঘাটের দিকে এল সে। সত্য যদি রাণীচকে ফিরে গিয়ে থাকে ঘাটে নির্ঘাৎ সেটা জানা যাবে। রিকশোওয়ালারা আছে, বাসের ড্রাইভার আছে—সকলেই একরকম চেনা মানুষ। সত্যকেও ওরা চেনে। চায়ের দোকানেও পরিচয় কম নেই দুজনের।

খেয়া পেরিয়ে ওপারে অনেক খোঁজখবর করল প্রবোধ। কেউ বলতে পারল না। এক ফাঁকে একটা লাভ হয়ে গেল অবশ্য। গ্রামের লোক পেয়ে সুভদ্রাকে খবর পাঠানো সম্ভব হল। এতক্ষণ সুভদ্রা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে নিশ্চয়। তবে লোক মারফৎ সব খবর দেওয়া মুশকিল। প্রবোধ জানাল যে একটা জরুরী কাজে আটকে গেছে বহরমপুরে: কখন ফিরবে ঠিক নেই।

কিন্তু গেল কোথায় সত্য ?

ফের খেয়া পেরিয়ে এপারে এসে জঙ্গলটার এপাশে অবসন্ন প্রবোধ ধুপ করে বসে পড়ল। চুলোয় যাক্ হতচ্ছাড়াটা ! প্রবোধ নিঃসন্তান নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। সুভদ্রাকেই যা ভয়। তাহলেও সুভদ্রা মানুষ তো বটে—বোঝালে বুঝবে না কেন ? যমুনা আর তার ছেলেকে নিজের বাড়িই নিয়ে যাবে। ব্রজর স্টেশনওযাগন হাঁকিয়েই যাবে মেঠো রাস্তায়। যে যা বলে বলুক, কান করবে না। আর, বলারই বা কী আছে ! প্রবোধ তহশীলদারকে লোকে বিশ্বাস করে। যমুনার সিঁথির সিঁদূর মিথ্যা নয়—তার সাক্ষ্য প্রবোধ নিজেই দেবে।

চুপচাপ বসে সম্ভব-অসম্ভব অনেক কল্পনা কবছিল সে। কখনও মুখটা হাসিতে ভরে উঠেছিল, কখনও গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল। বিচিত্র আলো খেলছিল তার মুখে। আজ যেন হারানো প্রথম যৌবনের ঋতু ফিরে এসেছে প্রবোধের জীবনে।

কখন অগোচরে বেলা চলে গেছে। দিন ছোট হয়েছে। দক্ষিণায়নের সূর্য আড়চোখে তাকিয়ে ডুবে গেছে ওপারে আমবনের আড়ালে। হাওয়ার ঠাণ্ডাভাব দেহকে শিরশিবিয়ে তুলেছে। শীত নামতে দেরী নেই। হাত ধরাধরি পুরুষ ও মেয়েরা গঙ্গার ধারে বেডাতে বেরিয়েছে। শিশুরা বালির তটে খেলা করছে। বনে অজস্র পাখি ডাকছিল। চারপাশে নীলাভ কুয়াসা ঘনিয়ে আসছিল। প্রবোধ উঠল।

বারান্দায পা দিতেই ঝাড়ুদারটা আঙুলের ইশারায় তাকে ওপরে যেতে বলল। প্রবোধ ওপরে গিয়ে দেখল—কেমন একটা অপরিচ্ছন্ন স্তব্ধতায় নার্সিং হোমটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে যেন। কেউ কোন কথা বলছে না।

যমুনা কেমন আছে ? একটা নার্সকে প্রশ্ন করল প্রবোধ।

সেও হাতের ইসারায় ডাক্তারের চেম্বার দেখিয়ে দিল।

ভিতরে পা বাড়ালে দুলাল মিত্র গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলে উঠেছে, বসুন। উই আর ভেরি সরি প্রবোধবাবু। তবে আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে !

প্রবোধ অস্ফুট চিৎকার করে উঠল, কী, কী হয়েছে ডাক্তারবাবু ?

শেষ অব্দি পেসেন্টকে বাঁচানো গেল না। তবে বাচ্চাটা ভালোই আছে।

একটা ভারী পাথর যেমন করে জলে ডুবে যায়, প্রবোধ তেমন তলিয়ে যাচ্ছিল যেন কোথায়।

একুশ

শীতের সুরুতেই লীলা প্রেসের বরাত ফিরে যাবে মনে হচ্ছিল। সেটা অবশ্যি রমারই কৃতিত্ব বলতে হয়। আশাতীত পরিমাণ সরকারী কাজের অর্ডার সংগ্রহ করেছে সে। আপিসের হেডবাবুদের সঙ্গে ভীষণ জমিয়ে নিয়েছে বোঝা যায়। তা না হলে ওই পর্বতপ্রমাণ ভোটারলিস্ট আর রকমারি ফরমের কপিতে লীলা প্রেসের সংকীর্ণ পরিসর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠবে কেন? ওদিকের খগেন-কানাইদের নাভিশ্বাস জন্য চার নতুন কম্পোজিটরও রাখতে হল। সুখেনের ঘরটাতে আরেক সেট কম্পোজিং আসবাব—লীলা আড়ালে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল কিনা খগেন-কানাই বা রমা জানে না। বরং তার মুখখানা আরো নির্বিকার দেখাচ্ছিল। যেন সীসের হরফে ছাপানো পরিষ্কার একটা লাইন। অক্লেশে পড়া যায়। আর যার একটিমাত্রই অর্থ হয়। লীলা জেদী, একরোখা—একটা অন্ধ শক্তির মত বিপজ্জনক।

তাই বাসিনীর মনে গুরুতর ভয়। তার কাছে ক্রমশ নীলেরাণী পটের ছবি হয়ে গেল! রঙ দিয়ে 'মিসিনে' ছাপানো পট। চক্ষু জুড়ায়, মন ভরে না। তাই বাসিনীর ইচ্ছে, শীত এবার মারাত্মক রকমের বেশি হবে এবং বাসিনী মরে যাবে।

মরে যাবে, কারণ পৃথিবী ক্রমশ পাপে ভরে উঠছে। আর সেই পাপের কেন্দ্র তার খুব কাছেই। আগে ছিল সুখেনবাবু, এখন জুটেছে আরেক ছোকরা—রমার ভাই অহীন। সঙ্গে ছায়ার মত বেঁধেছে লীলারাণী। আ মরণ! বয়সের বাছ-বিচার নেই রে পোড়ারমুখী! বাসিনী কপালে করা ঘাত করে। ঘণ্টাকে সামনে পেলে লীলার ঘরের দিকে আঙুল তুলে

ফিসফিসিয়ে বলে, কী করছে রে সব? নাকি তাসপাশা খেলছে! ঘণ্টা রেগে যায়।...বয়স হয়ে চোখের দোষ হয়েছে নাকি? সাধ থাকে, তো দেখে এসো না। খেলগে দুহাত!

সন্ধ্যা-সকাল অহীনের আসার অন্য কোন অর্থ খুঁজে পায় না বাসিনী। তেমনি পায় না রমাও। সময়-সময় তারও খুব খারাপ লাগে ব্যাপারটা। মুখ ফুটে বলতে পারে না অহীনকে—বলার সাহস তার নেই। এমন কি মায়ের কানেও কথাটা সে কদাপি তুলতে পারবে না। তার ধারণা, লীলা-অহীন সম্ভবত চুটিয়ে প্রেম চালানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। নিজের ভাই বলেই এটা খারাপ লাগে।

অথচ লীলা প্রেস রমাকে শুধু কাজের নয়, অন্য কী গভীর বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে ততদিনে। নিজের জীবনকে সে যেন ক্রমশ প্রেসের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। লীলা তার ওপর আগের মত কর্ত্রীপনা দেখায় না। রমার অধিকার বেড়েছে। সত্যি বলতে কী, সুখেনের জায়গা সেই দখল করেছে অবশেষে। তাই পয়সাকড়িও বেশ পাচ্ছে আজকাল।

একদিন এ পাড়ার দিকে এসে বাসিনীকে চুপিচুপি জিজ্ঞেসপত্তর করেছিল রমা। লীলা তখন প্রেসে। ঘণ্টাও সেখানে হুকুমবরদার হাজির যথারীতি। রমা এটা-ওটা নানান কথার পর অহীনের প্রসঙ্গ তুলেছিল অহীন কী করে এখানে?

ব্যস! বাসিনীর ততদিনের ভরাকুম্ভে যেন ঘা লেগে সব গলগল করে বেরিয়ে গেল। অহীনের সর্বনাশ করবে ওই সর্বনাশী সত্যচরণের করেছে, সুখেনবাবুর করেছে, এবার অহীনের পালা। ও যে আগুনের ঢেলা—যার গায়ে লাগবে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তার বিনাশ করবে। সাবধান মা, সাবধান। তারপর...রাক্ষুসীর মত মুখভঙ্গী করে বাসিনী বলেছিল, এই যে তুমি, তুমি মালক্ষ্মী, এমন সোন্দর 'ছিক্ষিত' বড়লোকের মেয়ে, তোমারও...হুঁ হুঁ...এটা আমি নিখে দোব, সাবধান বাছা...তবে বলবে, তুমি বাসিনী, তুমি কেন এখানে পড়ে রয়েছ?...তাহলে শোন খাঁটি কথা—রূপপুরে যাব কোথা মা? পা-জোড়া রাখব কোথায় বলো? সেই যে সাত বছরের মা-বাবাখাকী মেয়েকে কুমুদ খেলার সাথি করেছিল, সেই

তা পেথম সর্বনাশ গা! মাটিছাড়া পা তুখানা কুমুদের বাড়ি মাটি পেল। কিন্তু কুমুদের মেয়ে সে মাটি রাখলে না মা, বানের জলে ধুয়ে দিলে! আমি তাহলে যাই কোথা বলো?···তবে কাল আমার দয়াল হয়ে আসছেন—এ শীতেই আমি মরব, দেখে নিও...আর বাঁচব না!

কিছুটা হেসে, কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে রমা ফিরে এসেছিল। বাসিনীকে এসব জিজ্ঞেসপত্তর করল, লীলার কানে তুলে দেবে না তো সে? সপ্তাহ কেটে গেলেও লীলার ব্যবহার বদলায় নি দেখে সে আশ্বস্ত হয়েছিল। এবার ভেবেছিল, কোন ছলে অহীনকে কিছু বলবে এ প্রসঙ্গে। সাহসের অভাব তো আছেই—কিন্তু ওদিকে শোভার ট্রেনিং এখনও শেষ হয় নি, সংসারের সব খরচ এখন রমাই জোগাতে পারছে—যার ফলে বাড়িতে কিঞ্চিৎ প্রতাপও বেড়েছে রমার। অহীন যখন তখন হাত পাতলে পয়সা পায়। তাই অহীনের পক্ষে হয়ত দিদিকে পালটা আঘাত করা সম্ভব না হতেও পারে।

বলবে-বলবে করে দিন কেটে যাচ্ছিল লীলা সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরে যায়। রমাকে রাত নটা অব্দি থাকতেই হয়। সব উত্তম যেন রমার ওপর রেখে লীলা নিশ্চিন্ত থাকতে চায়। রমা আগে ভাবত, আহা বেচারী! জীবনে এত অশান্তির আগুন ওর! সে সমবেদনা ক্রমশ অহীনের ব্যাপারে উবে গেছে। এখন সকাল-সকাল লীলার বাড়ি ফেরায় একটি মাত্র অর্থ আছে। তা হচ্ছে, অহীনের সঙ্গে তুপুর রাত্তির অব্দি আড্ডা দেওয়া। রমা বাড়ি ফিরেই তার খোঁজ করে। অহীন নেই। জগদীশের আড্ডা এখন কিছুদিনের মত ফাঁকা। এবং সে জেগে থাকে। অহীনের সাড়া পেলেই সে বলে, কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ? ফের আজেবাজে জায়গায় যাওয়া শুরু করেছিস? একবার অনেক হাঙ্গামা করে নিষ্কৃতি পেলি···অহীন শুধু হাসে। দিদিদের ওপর সে কোনদিনই রাগ দেখায় না। ছোট অম্মু অবশ্যি দাদাকে পরোয়া করে না কোনদিনই। সে একটু ঠোঁটকাটা মেয়ে। বলে, যেন পরমহংস এলেন। মুখে অনবদ্ধ হাসিটি···ইস! অহীন তবু হাসে। তারপর রমার কাছে এসে চাপা গলায় বলে, তোর বসের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম। বাপ্‌স, তোর চাকরী

বহাল রাখতে প্রতিদিন এক গ্যালন করে তেল খরচা হয়ে যাচ্ছে। সকালে পাঁচটা টাকা দিস তো। দিবি?

ভঙ্গী দেখে রমাকে হাসতে হয়। সকালে টাকাও দিতে হয়। দিয়ে বলে, তোকে যে বাড়ি দেখতে বলেছিলাম, দেখেছিস!

কিসের?

রমা অবাক হয়। কিসের মানে? প্রেসের।

অহীন মাথা চুলকে বলে, ওঃ, তাই তো! তোর বসও বলছিল আজ। দেখব 'খন।

রমা গজগজ করে, শেষ অব্দি আমাকেই লাগতে হবে। একদম সময় পাইনে, যা ঝামেলা পড়েছে। এদিকে প্রেসে পা রাখবার জায়গা নেই।

অহীন সকৌতুকে বলে, লীলা প্রেসের সাইনবোর্ড বদলাবে মনে হচ্ছে।

তার মানে?

'রমা প্রেস' হবে, এই আর কী!

রমা আহত হয়। বলে, বেশ, ছেড়ে দেব প্রেসের চাকরী। তুই সংসারের দায়িত্ব নিবি।

ঝগড়ার আমেজ লক্ষ্য করে মা উঠে আসেন।··

কদিন পরেই অহীন খবর আনল বাড়ির। সদর রাস্তার ধারেই মস্ত বাড়ি। নীচে একটা প্রকাণ্ড হলঘর। ওপরে চারটে কামরা। ওপরে-নীচে লম্বা বারান্দা। প্রেসের পক্ষে আদর্শ বাড়ি। মামলা চলছিল শরিকে-শরিকে। সম্প্রতি একপক্ষ ডিক্রি পেয়েছে। তবে হলঘরে একটা পরিবার বাস করে—তাদের উচ্ছেদ করতে হবে নিজ দায়িত্বে। তা না হলে ওপরের ঘরগুলোই শুধু পাওয়া যাবে। সেলামীর রেওয়াজ আজকাল মফঃস্বলেও চালু হয়েছে। তবে এ বাড়ির মালিক খুব জানাশোনা লোক—সেলামী রেহাই পাবার চান্স আছে। কিন্তু কয়েক বছর ধরে মামলা চলায় অনেক খরচা হয়ে গেছে ভদ্রলোকের—কিছু বিবেচনা করতে হবে বৈকি।

রমা বলল, ঠিক আছে। লীলাদিকে বলব সকালে।

অহীন জানাল, আমি বলেছি। উনি রাজী। এইমাত্র আসছি ওখান থেকে।

রমা বিরক্ত হয়ে বলল, তুই আগে ওঁকে বলতে গেলি কেন। সবতাতে ফোঁপরদালালী তোর।

তার মানে? অহীন অবাক!···বাড়ি যে নেবে, তাকে বলায় কি অপরাধ হয়েছে রে বাবা! ··পরক্ষণেই মুখ টিপে সে হাসল।···ও আই সী! বাঃ, চমৎকার! এতকাল সুখেনদার সঙ্গে থেকেও লাইন পাই নি, তুই কেমন করে পেলি রে?

বাজে বকিস নে। তুই এসব বুঝিস কী?

অহীন আঙুল তুলে কপট গাম্ভীর্যে বলল, মাইণ্ড ছাট, চাকরীটা আমিই জুটিয়ে দিয়েছি কিন্তু।

মাথা কিনে নিয়েছিস! বলে রমা চুপ করে গেল।

অহীন বলল, ঠিক আছে বাবা। টু-পাইস কামিয়ে নে না, আমি বাগড়া দেব কেন? তবে দেখিস, তোর বসটি বড্ড ডেঞ্জারাস!

অনু বলল, কী হচ্ছে সব রাতদুপুরে? আমার একজামিনেশন সামনে। ডিসটার্ব করো না।

অহীন অনুর চিবুকে ঠোনা মেরে চাপা গলায় বলল, জানিস অনু, আমাদের বড়দি এবার ভিলেনের ভূমিকায় নামছে!

পরদিন সকালে স্বয়ং লীলাই এখানে হাজির। আদর-অভ্যর্থনার ঘটা পড়ে গেল। রমার মা স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির মহিলা। তিনিও অসম্ভব কথা বলতে থাকলেন। শুধু চা খেয়েই রমাকে নিয়ে লীলা বেরোল। অহীন তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। লীলা যাবার মুখে ওর ঘরে একবার উঁকি মেরে গেল। এইতে রমার মন কিছুক্ষণের জন্যে কটু হয়ে গেছে।

আচায্যিপাড়ার শেষদিকে ফেলটুবাবুর বাড়ি। সেকেলে ঢঙের বিরাট দোতলা দালান। প্রকাণ্ড আঙিনা, ঠাকুরবাড়ি—ছকবন্দী ঘর চারপাশে। বড় বড় থাম। সবখানে একটা স্যাঁতসেঁতে জীর্ণতার ভাব। ফাটা দেয়ালে শ্যাওলা আর আমরুল গজিয়েছে। কোথাও বা বটের চারা। অজস্র পায়রার বাসা কড়িকাঠে কিংবা ভেন্টিলেটারে। ভাঙা খড়খড়ি দিয়ে মুখ বাড়িয়েছে বাইরের আগাছা। অথচ তার মধ্যেই বাস করছে কয়েকটি পরিবার। ওপরে-নীচে পায়রাদের মত অসংখ্য মানুষ গিজগিজ করছে

খোপে-খোপে।

গেটের সামনে রিকসো দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা নামল। সামনে একদঙ্গল ছেলেমেয়ের ভিড়। রোগা হতশ্রী আধ-ন্যাংটো ছেলেমেয়েগুলো চেঁচামেচি থামিয়ে গভীর কৌতূহলে ওদের লক্ষ্য করছিল। ভিতরটা যেমন অপরিচ্ছন্ন তেমনি অন্ধকার লাগে। লীলা একটু ইতস্তত করে রমার দিকে তাকাল। রমা একটু হেসে বলল, ভিতরে যাবেন, না খবর দেব ?

লীলা বলল, থাক। খবর দাও।

রমা ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার আগেই এক বর্ষিয়সী মহিলা বারান্দা থেকে হাঁটুতে হাত রেখে নীচে নেমে বলে উঠলেন, ফেলটুর কাছে এসেছ বুঝি ? পরক্ষণে মুখ ফিরিয়ে দোতলা লক্ষ্য করে চেঁচালেন, অ ফেল্টু, এই ছাখ কারা এসেছে রে !

তারপর প্রশ্নবান : কী উদ্দেশ্য ? কোথায় থাকা হয় ? ফেলটুর কাছে কেন, কথাটা আমাকে বললেই তো হয়।···হয় না বুঝি ? অ, তা তেমন কথা হলে ফেল্‌টুর আড্ডায় গিয়ে বললেও চলত।

লীলা বিরক্ত হয়ে বলল, রমা, পরে আসব'খন।

ভদ্রমহিলা বললেন, এখানে আসবার দরকার কী, জগার দোকানে ওর দেখা পাবে। ও এখন ঘুমুচ্ছে। দশটার আগে উঠবে না।

ততক্ষণে আরও একদল নানা বয়সের মেয়ে উঁচু বারান্দায় ভিড় জমিয়েছে। ওদের চাহনিগুলো বিঁধছিল গায়ে। রমাও বলল, তাই চলুন। বরং অহীনকে পাঠিয়ে দেব।

রিকসোর দিকে পা বাড়াতেই পিছনে ফেলটুবাবুর চটির শব্দ আর অমায়িক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হ্যালো রমা, হ্যালো ম্যাডাম !

দুজনে ফিরল।

ফেলটুবাবু বাড়ির দিকে দু'হাত প্রসারিত করে বলল, চলে যাচ্ছেন কী! আপনারা আসবেন বলে আজ ভোর-ভোর শয্যাত্যাগ করেছি। অহীনের সঙ্গে সেইরকমই কথা ছিল। আসুন, আসুন।

চলতে-চলতে ফের ফেলটুবাবু বলল, অন্য কেউ হলে পাত্তাই দিতুম না। স্বয়ং আপনি। ওঃ, সুখোটা থাকতে কতদিন মনে লোভ হয়েছে—

—একবার আলাপ হচ্ছে না কেন? কী সৌভাগ্য দেখুন তো!

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠবার সময় নীচের ভিড় থেকে একটা মন্তব্য কানে এল লীলার।···বাবা আসুন, তারপর মজা দেখাচ্ছি। এ-বাড়িটাকেও জগার আড্ডা ভেবেছে নাকি?

চকিতে মুখ ফেরাল লীলা। যে বলল, তার মুখটা আশ্চর্য সুন্দর। বয়সে লীলার চেয়ে কিছু ছোটই হবে। চোখে চোখ পড়লে মুখ ফেরাল সে।

রমাও শুনেছিল। লীলার হাতে আঙুলের স্পর্শ দিয়ে চাপা গলায় সে বলল, ছেড়ে দিন।

নীচে ফের মন্তব্য: মামলা জিতে ধরাকে সরাজ্ঞান করেছে। পার্টিশান দেবার কথা তো ওরই, আমরা দেব না। পার্টিশান দিক, দিয়ে যা খুশি করুক বাড়ির মধ্যে।

অপমানবোধে অস্থির হয়ে লীলা ওপরের চওড়া বারান্দায় পৌঁছল। রমা আগে, তার আগে ফেল্টুবাবু। কোণের ঘরের দরজায় থেমে ফের হাতদুটো সামনে চিতিয়ে ফেল্টুবাবু বলল, আসুন।

রক্ত যখন টাটকা, তখন তার যে ঔজ্জ্বল্য বা রঙ, এ-ঘরের সবকিছু হয়ত একদিন তেমনি ছিল। রক্ত পুরনো হলে যেমন ম্যাটমেটে আর কালচে হয়ে ওঠে, এখন অবশ্য সেইরকম দশা হয়েছে। বেশ বড় ঘর। প্রকাণ্ড পালঙ্ক। একটা ভাঙা-চোরা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে মধ্যিখানের ছাদে। মেহগিনি রঙের কয়েকটি দামী চেয়ার—সবগুলোর গদি শতছিন্ন। একটা আলমারী—খানকয় বাঁধানো ইংরিজী বই—শতবর্ষের প্রাচীন। বাকিটা শূন্য। মস্তো পাথরের টেবিলে একরাশ তেমনি পুরনো কাগজপত্র আর ওষুধের শিশি। পালঙ্কের নীচে আর কোণ জুড়ে গুটিকয় এলুমিনিয়ম তৈজস, কুকার, মায় বাটনাবাটা শিলনোড়া। মোজেককরা মেঝে জলে ছপছপে। সেই জল মুছছিল এক মধ্যবয়সী মেয়ে—সম্ভবত ঝি। এদের ঢুকতে দেখে সে বেরিয়ে গেল। ফেল্টুবাবু বলল, সতী, কুকারটা বারান্দায় নিয়ে যা। চায়ের জল চাপিয়ে দে। নাকি কফি খাবেন?

লীলা মাথা নাড়ল। রমা বলল, থাক।

সে কি! ফেলটুবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠল।···কী সৌভাগ্য আমার! স্বয়ং হিরোইন আমার ঘরে...বলেই সে জিভ কাটল।···সরি ম্যাডাম। খুব আপত্তিকর কথাবার্তা বলছি যেন। ক্ষমা করবেন। মাতাল মানুষ, কী বলতে কী বলে ফেলি। তবে আপনাদের অমর্যাদা করব না, আমি যতই বখে যাই। মেয়েদের প্রতি এখনও ভীষণ শ্রদ্ধা আছে। ওঁরা কি না স্বয়ং প্রকৃতিঠাকুরাণী। কথাটা কে বলেছিল জানেন? পরমহংসদেব। ···এই বলে যুক্তকর কপালে ঠেকাল সে। পুনশ্চ বলল, আমি যে সুরা পান করি, তাও নাকি ওনার শক্তিরস। বড় অদ্ভুত, তাই না?

ছারপোকার কামড়ে লীলা উসখুস করছিল। রমাটা কী নির্বিকার: লীলার অবাক লাগল। রক্তের নাকি তেতো মিষ্টি আছে। রমার রক্ত তেতো হয়ত। নাকি, দেখতে-দেখতে এত তাড়াতাড়ি মুটিয়ে গেল, চামড়াও পুরু হয়ে গেলে, ছারপোকার দাঁত বসে না।

ফেলটুবাবুর চোখ সতর্ক ছিল সম্ভবত। বলল, অসুবিধে হচ্ছে বসতে? হবেই। বরং আপনি খাটে বসুন পা ঝুলিয়ে। ডোণ্ট মাইণ্ড, খাট আমার খুব পবিত্রই থাকে। পৈতৃক খাট কিনা—গঙ্গা-জলে ধোওয়া। তবে ওই কোণার টেবিল-চেয়ারটার দিকে যেতে বলবো না। ওখানে বসেই আমার রাজ্যাভিষেক হয় দুবেলা। হ্যাঁ, খাটেই বসুন বরং। আপনাকে ওখানেই মানায়। আঃ, সেই যে রূপকথায় আছে···কী আছে যেন?

হাসতে লাগল ফেলটুবাবু। পাঞ্জাবীর হাতাটা গুটিয়ে দিল।

ওদিকে বাইরে সতী নাম্নী মেয়েটি কুকার জ্বেলেছে। আড়চোখে এদের লক্ষ্য করছে। সমস্ত ব্যাপারটাই অপ্রীতিকর ঠেকছিল লীলার কাছে। রমা কিন্তু নির্বিকার।

লীলা ওকে লক্ষ্য করে মৃদুকণ্ঠে বলল, কথা বল। উঠব।

ফেলটুবাবু বাইরে গেলে রমা বলল, সেলামীর কথাটা উঠলে আমি ম্যানেজ করব। আপনি আবার তাড়াতাড়ি ঝোঁকের মুখে রাজী হয়ে বসবেন না যেন। ফেলটুবাবুকে আমি ভালোই জানি। দরকার হলে ফের আসতে হবে। অমন বাড়ি পাওয়া যাবে না।

লীলা বলল, আসতে হয়, তুমি আসবে। আমি না। এরা কী রকম যেন।

সব শরিকের ঝামেলা। এমনি হয়। রমা মন্তব্য করল।

হঠাৎ মুখ একটু ঝুঁকিয়ে চাপাস্বরে লীলা বলল, আচ্ছা রমা, বাড়িটা উনি বেচে দেবেন না?

রমা অবাক হল।···একেবারে কিনে নেবেন?

ধরো, তাই যদি···

দাম কিন্তু অনেক চাইবে। অতবড় বাড়ি। পুরনো হলেও এখনও মজবুত আছে। দেখেননি এখনও। ফেরার পথে দেখিয়ে নিয়ে যাবো।

লীলা মুখ ফিরিয়ে বলল, দেখার দরকার কী! অহীন তো সব জানে।

রমা বলল, পঞ্চাশ-ষাট হাজার চেয়ে বসবে, দেখবেন।

অত বেশি?

রমা অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বলল, তার চেয়ে ভাড়ায় পাওয়াতে ক্ষতি কিসের? আপনি কেনার কথা তুলবেন না যেন।

লীলা চিন্তিতমুখে চুপ করল। সত্যি সত্যি কি বাড়িটা কিনতে পারবে সে? রূপপুরে আর কয়েক বিঘে মাত্র ধানী জমি আছে। সজল সেটা দেখাশোনা করে। ধান নগদ দামে বেচে টাকা দিয়ে যাবার কথা। সে আর কত হবে! অবশ্য, একটা জলার কিছু অংশ মালিকানার দরুণ সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে। জলাটা এখন খাল। এই টাকাটার ব্যাপারে তদ্বির করার দরকার আছে। হয়ে ওঠে না। আর আছে মায়ের একরাশ অলঙ্কার। সব বেচেছে, ওগুলো বেচতে হাত ওঠেনি তার। এইগুলো সব মিলিয়ে বেচলে বাড়িটা কেনা হয়ত অসম্ভব হয় না। কিন্তু কেন? প্রেসের জন্যে সত্যি সত্যি কোন নেশা ছিল তার?

এখন ক্রমশ সব বিস্বাদ লাগে। সবই অর্থহীন। চারপাশে একটা বিকট শূন্যতা হাঁ করে আছে। মাঝে মাঝে সেই মুখব্যাদান তাকে ভীত করে তোলে। অবহেলায় সবকিছু ভাঙতে ভাঙতে এ কি করে ফেলছে সে?

ফেলটুবাবু চায়ের কাপ হাতে এগিয়ে এলেন।···স্রেফ চা। আপাতত

আর কিছু দিতে পারছি না. দুঃখিত। একা মানুষ। কোনরকমে চালিয়ে নিচ্ছি এমনি করে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও চা খেতে হল। লীলা বলল, বাড়ির ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম।

খাটের নীচে থেকে একটা মোড়া টেনে নিয়ে সামনে বসল ফেল্টুবাবু। বলল. হ্যাঁ, এবার একটু সিরিয়াসলি আলোচনা করা যাক। দেখুন, আপনার প্রেসের পক্ষে ভারি উপযুক্ত হবে. তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু মুশকিল আছে।

রমা প্রশ্ন করল, কী মুশকিল?

নীচের হলটাই আপনাদের দরকার হবে। অথচ ওখানে দাদা কজন ভাড়াটে ঢুকিয়ে রেখেছেন ওদের সরানো এক ঝামেলা আছে।

সে আর ঝামেলা কী? আপনার আড্ডার লোকদের বললেই হবে। তাছাড়া, অহীনকেও বলব। ··রমা হেসে উঠল।

লীলা একটু অবাক হয়ে রমার দিকে তাকাল। বলল, তা কেন? ওদের ওপরে ঘর দিলেই চলবে।

ফেল্টুবাবু হাসল। সে আপনার দয়া। কিন্তু সব ভাড়া আপনাকেই গুনতে হবে. মাইণ্ড দ্যাট।

লীলা বলল, ওরা ভাড়া দেয় না?

কী দেয় না-দেয়, সে দাদাই জানত অ্যাদ্দিন। আমি এখনও ওদিকে পা বাড়াইনি। তবে যা বুঝেছি. খুব বেশি একটা নয়। ও তো দাদা জেদ করে দখল রাখবার জন্যে বসিয়েছিল। বাবার আমলে ওখানে গানের আখড়া বসত দেখেছি। সে স্বর্গরাজ্যের কথা আর বলে লাভ নেই। ···ফেল্টুবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রমা বলল, সে দেখা যাবে। এখন কত কী চান-টান বলুন, ফেল্টুবাবু।

ফেল্টুবাবু ফের জিভ কেটে বলল, ফেল্‌টুদা নামেই সবাই ডাকে ম্যাডাম। আমার আসল নাম কিন্তু ইন্দ্রমোহন। ইন্দ্রমোহন ব্যানার্জী।

লীলা বলল, জানি।

জানেন? কে বলল? সুখেন বুঝি?

না, অহীন।

অহীন একটা আশ্চর্য ছেলে! ভেরি গুড বয়।

রমা বলল, বলুন ফেলটুদা।

কী বলব?

বাড়ির কথা।

সে হচ্ছে। আচ্ছা ম্যাডাম, সুখেনের কোন চিঠিপত্র পেলেন?

লীলা মুখ ফেরাল। রমা বলল, ও কথা থাক্ ফেলটুদা।

ফেলটুবাবু সগর্জনে বলল, থাকবে কী! তোমার কাছে ব্যাপারটা কিছু নয়। কিন্তু ওর কাছে এটা একটা জীবনমরণ সমস্যা। স্কাউণ্ড্রেলটা এমনি করে কতজনের যে সর্বনাশ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে এও জেনে রেখো রমা, যেখানেই থাক্, জগার হাত থেকে ওর বাঁচোয়া নেই। জগা খুঁজছে দুজনকে। (লীলার উদ্দেশে) আশ্চর্য দেখুন ম্যাডাম, হারামজাদা আপনার মত মেয়েকে এমন অবহেলা করল, ওর···

লীলা উঠে দাঁড়াল।

ফেলটুবাবু দমে গিয়ে বলল, উঠছেন? সে কি! আমার যে অনেক বলবার কথা আছে।

রমা অধীর কণ্ঠে বলল, বাড়ির কথাটা আগে হয়ে যাক্ ফেলটুদা।

বাড়ি? সে কি হতে আটকাবে? ফেলটুবাবু বলল।···হয়েই আছে একরকম। স্বয়ং লীলাদেবী নিচ্ছেন, না করার যো আছে?

কত কী লাগবে, সেটা বলুন।

কিস্সু লাগবে না। আজই প্রেস তুলে নিয়ে এসো তোমরা।

তার মানে? মাসে কত লাগবে বলবেন না?

কিস্সু লাগবে না। ও আমার পড়ে-পাওয়া ধন। ফেলটুবাবু অমায়িক দিলখোলা হাসল।

বারে! তাই হয় নাকি? এ তামাসার কথা নয় ফেলটুদা।

আমি কি তামাসা করছি নাকি? কত বিরাট সব সম্পত্তি ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলুম, এ তো একরত্তি! যাও, প্রেস এনে ফেলো।

রমা বিরক্ত মুখে বলল, কাগজে কলমে সব সেটল্ করতে হবে তো!

এমনি আনা যায় নাকি?

ঠিক আছে, লিখে দিচ্ছি।

এবার লীলা হাসিমুখে বলল, কী লিখে দেবেন?

লিখে দেব, শ্রীমতী লীলা দেবী যাবজ্জীবন প্রেস করিবেক, এই বাটির মালিকানা তাঁহার উপর বর্তিয়া থাকিবে···

পাগল না কী! লীলা ঢুম করে বলে বসল, বরং এক কাজ করুন না ওটা বেচে দিন: কত দাম লাগবে?

ফেল্‌টুবাবু আহত কণ্ঠে বলল, বেচে দেব? কেন? এমনি দিলে নেবেন না?

বেশ বোঝা যায়, সকাল থেকে কিছু গিলে মেজাজ দরিয়া হয়ে রয়েছে। তবে জাতমাতাল, পা টলে না বা কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যায় না। অতীনকেই পাঠাতে হবে আবার। এ মাতাল সামলানো লীলার পক্ষে সম্ভব নয়।

রমা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নাঃ, বড্ড মিছেমিছি সময় কাটিয়ে দিলেন ফেলটুদা। আমাদের সময়ের তো দাম আছে। আরো কত জায়গায় সব কাজ আছে। বরং পরেই আসব, এখন যাই। আর···একটু ঝুঁকে লীলাকে ফিসফিস করে সে বলল, টাকা আছে সঙ্গে?

লীলা মাথা নাড়ল। তারপর ব্যাগ খুলে কয়েকটা দশ টাকার নোট বের করল। সে রমার ইঙ্গিতটা বুঝেছিল।

টাকা দেখে ফেল্‌টুবাবু বিনয়ে গলে বলল, টাকা দিচ্ছেন?

রমা বলল, হ্যাঁ। বায়না করে গেলাম। ভাড়া চান, ভাড়া—লীজ দিতে রাজী থাকলে তাও বলবেন, নয়ত বেচে··· ··

করুণ মুখে ফেলটুবাবু কথা কাড়ল, বেচে দেব? তাহলে তো উকিলবাবুর কাছে পরামর্শ করতে হয়। জানেন, এই মামলাপত্র করে জিতিয়ে দেবার পেছনে তিনিই আছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করা উচিত?

হাসি চেপে লীলা বলল, তাই নাকি? কোন উকিল বলুন তো?

চেনেন নাকি? তা চিনবেন। আপনিও তো শুনেছি, ও লাইনে

অনেক হেঁটেছেন। আমার উকিলবাবু বেশ নামকরা লোক। শঙ্কর ভট্‌চাযি্য। চেনেন? ওর জামাইও কলকাতার নামকরা ব্যারিস্টার। এক মেয়ে ডাক্তার। এক মেয়ে পাইলট। উড়ো জাহাজ চালায়। বাপ্‌স্‌!

গুমোট মুখে লীলা মাথা নাড়ল। তারপর বলল, কারুর কাছে যেতে হবে না। বাড়ি আমি দেখিনি এখনও। যাবার পথে দেখে যাচ্ছি। বিকেলে অহীনকে পাঠাবো আপনার কাছে।

ফেলটুবাবুও উঠল হন্তদন্ত।···ঠিক আছে। চলুন, আমিও সঙ্গে যাই ভেতরের ঘরগুলো দেখবেন।

তিনজনে নামবার পথে ফের সেই কৌতূহলী ভিড় দেখতে পেল। ফের সেইরকম মন্তব্য পিছনে। রিকশোওলার কথা মনে পড়ল এতক্ষণে। রমা বলল, ওকে বিদেয় করে দিই। লীলা মাথা নাড়ল।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির কাছে পৌঁছল। সারাপথ অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছিল ফেলটুবাবু। কিছু সুখেনের, কিছু নিজের। বড় একা, কিন্তু ভাল লাগে না। চুলে পাক ধরে এলে পুরুষমানুষের জীবনে কী আর বাকি থাকে। বিয়ে-টিয়ে করতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু এ বয়েস সে আশাও বড় কম। জগার আড্ডা ভেঙে আব ওঠাবসার জায়গা নেই। শহরটাও যেন শ্মশান করে দিয়ে গেল সুখেনটা। বন্ধুবান্ধব বলতে তো ওরাই টিকে ছিল পরিশেষে। কে কোথায় গা ঢাকা দিল!

বাড়ি যথোপযুক্ত। দেখে শুনে লীলার জেদ চেপে গেছে মাথায়। রমার পরামর্শ মানতে রাজী নয় সে। মাসে-মাসে ভাড়া গোনার চেয়ে কেনাই ভালো। এখন ফেলটুবাবুকে শঙ্কর ভট্‌চাযি্যর কাছে ঘেঁষতে দেওয়া ঠিক হবে না। তার জন্যে অহীনকে পিছনে লাগিয়ে দিতে হবে। কিছু বাড়তি টাকা খসবে, খসুক। মাতালকে বশ মানাতে দেরী হবে না।

শীতের দিন। ইতিমধ্যেই দুপুর নেমেছিল। ফেলটুবাবুর কানে রমা শেষবারের মত মন্ত্র শুনিয়ে বিদায় নিল। পুরনো বাড়ি। তবে নগদ টাকা একসঙ্গে অনেক পেলে ফেলটুদা ওই পায়রার খোপ ছেড়ে

নির্বিবাদে কোথাও সুন্দর একটা বাড়ি করে নিতে পারবেন। একা মানুষ —তবে এইরকম বাড়ি করে ফেললে বিয়ে করতেই বা দোষ কী? নতুন বাড়ি, নতুন বৌ—একটা টুকটুকে অসাধারণ রূপসী মেয়ে। জুটবে না? নিশ্চয় জুটবে। ফেলটুদার চেহারা এখনও রাজপুত্রের মত। একটুও টসকায়নি।

কিন্তু ফেলটুবাবুকে সঙ্গ ছাড়াতে বেশ খানিকটা সময় গেল। পথে দস্তুরমত সীন ক্রিয়েট হবার দাখিল। তবে লোকটা ভালো। অভদ্রতা করছে না। দুজনে ওকে ছেড়ে আসবার পর প্রাণ খুলে একচোট হেসে নিল। তারপর লীলা বলল, আমি এখন বাড়ির দিকে যাব। তুমি?

রমা ঘড়ি দেখে বলল, প্রেসে। এতক্ষণ কী সব হচ্ছে কে জানে! কানাইটাকে একেবারে বিশ্বাস হয় না। টাইপ চুরি করার বদনাম আছে ওর। আচ্ছা, চলি।

স্নান-খাওয়া হয়নি যে তোমার!

স্নান করব না। শীত করছে। ওখানেই কিছু খেয়ে নেব'খন।

নাঃ। বাড়ি থেকে ফিরে এসো। অত কাজ-কাজ করে শরীর নষ্ট করতে আমি বলিনি।

শাসন-অনুযোগ না মেনে রমা হাঁটতে থাকল হন্তদন্ত হয়ে। লীলা কিছুক্ষণ ওর চলে যাওয়াটা দেখল। রমাই প্রেস চালাচ্ছে আসলে। চালাক। বড় ক্লান্তি লীলার। কিছু ভাল লাগে না। রমাকে না পেলে কবে সব ভাসিয়ে দিত এতদিনে।

এক সময় একটা রিকশো ডেকে বাড়ির পথে চলল সে। বাড়িটা কিনে নেওয়াই ঠিক হবে। নগদ টাকা আর অলঙ্কার একই কথা। চুরি-চামারির ভয় আছে। বাড়ি তো আর চুরি যাচ্ছে না। কিন্তু যদি সাধ্যের অতীত দাম চেয়ে বসেন ফেলটুবাবু?

নাঃ, চাইবে না। মাতাল মানুষ। বড় বংশের লোকগুলোর মন এমনি হওয়া উচিত। সত্যি, বড় অদ্ভুত লোকটা! সব কিছুই ছিল একদিন, আজও অনেকখানি আছে—অথচ এমন কিছু একটা নেই—যা থাকলে

ও অন্য মানুষের মত স্বাভাবিক হতে পারত। কারুর হাসির পাত্র হত না। কেমন একটা মৃদু মমতায় লীলার মনটা কিয়ৎক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে থাকল। এমন সরল মানুষকে বড় সহজে ঠকানো যায়। রমা সেই ঠকানোর ষড়যন্ত্র করছিল—লীলা তা হতে দেয়নি, দেবে না।

কিন্তু মাতাল···মাতালকে সহ্য করা সত্যি অসম্ভব। ঘৃণা সংস্কার থেকে উঠে এসে মমতাটুকু নষ্ট করে দিচ্ছিল লীলার। কেন যে ওসব ছাইপাঁশ খায় মানুষ? যে খায়, তার তো সর্বনাশ হয়। তবু বোঝে না।

বাড়ির সামনে রিকশো থেকে নামল সে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোল। পরক্ষণে থমকে দাঁড়াল। বসবার ঘরে সোফায় বসে ছেঁড়া ময়লা পাঞ্জাবী গায়ে একটা লোক সামনে ঝুঁকে পত্রিকার ছবি দেখছে। বড় বড় বিশৃঙ্খল চুল মাথায়, গোঁফ দাড়িতে আচ্ছন্ন মুখ, ঠিক যেমন রাস্তার উদ্দেশ্যহীন লোকদের দেখতে পাওয়া যায়। আর তার পাশে মেঝেয় বসে বাসিনী ক্রমাগত হাতমুখ নেড়ে কী কথা বলছে। লোকটা শুনছে কি না বোঝা যায় না।

মুহূর্তে লীলার সারা শরীর আগুন হয়ে উঠেছে। মাথা ঘুরে উঠেছে। দেয়াল ধরে সামলে নিচ্ছিল সে।

বাইশ

তারপর কিছুক্ষণ চারপাশের সাদা দেয়াল মসৃণ শিলিঙ ফুলগাছ সমেত বাড়িটা কাঁপানো জলের মত অস্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছিল। আর সেই অস্বচ্ছতার ভিতর ভাঙচুর প্রতিবিম্বের মত লোকটাকেও খুব অস্থির মনে হচ্ছিল। সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল লীলার দিকে। মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল। অসাধারণ ভব্যতায় মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে যেন অভিবাদন জানাল গৃহকর্ত্রীকে।

একটা ঘোরতর দুঃস্বপ্ন ছাড়া কী! প্রচণ্ড ভয়ে লীলার শরীর নীল হয়ে গেল! ছেলেবেলায় শোনা জুজু তাহলে আছে? নাকি

রূপকথার রাক্ষস এল পৃথিবীতে সত্যিসত্যি কি রাজপুত্র আছে? সোনারূপোর জীবন-মরণকাঠি মাথায় আর পায়ে রাখা হতভাগিনীদের সব স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে বারবার। তাই নিজের জোরেই নিজে তৈরী হওয়া ভালো।

অবশেষে বাসিনী ডেকেছে। কিন্তু সে কী ডাক! বাঘিনীর মত রক্ত-কাঁপানো গর্জন। বাসিনী উঠে দাঁড়িয়ে ঠিক কুমুদের মত আঙুল তুলে ডেকেছে, লীলারাণী!

লীলা ছুটে বাড়ির ভিতর ঢোকবার চেষ্টা করছিল। বাসিনী সামনে। ফের সে গর্জেছে, লীলারাণী, ইদিকে আয়।

পলকে সম্বিৎ ফিরে পেল লীলা। যেন রাজ্যের সব অধিকার ওবা জড়ো করে বড় গলায় হাঁকছে। ছোটলোকের মেয়ে বাসিনী—তার হাতে লীলার ইচ্ছেও বুঝি খাঁচায়পোরা পাখি। আর ওই উদ্ভট আগন্তুক! লীলা মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর হনহন করে ভিতরের বারান্দায় গেল। কর্কশকণ্ঠে ডাকল, ঘণ্টা—ঘণ্টা!

ঘণ্টা নেই। তার প্রেসে থাকবার কথা। তাহলে?

সে হাঁফাতে হাঁফাতে ফের ডাকল, বাসিনী, শুনে যাও।

বাসিনী ততক্ষণে রণচণ্ডী। রাক্ষুসীর মত দাঁত ছরকুটে গেছে। ঠোঁটের দুপাশে পানের চাপচাপ লালা। প্রচণ্ডভাবে মুখ নেড়ে পান চিবুতে চিবুতে তৈরী হচ্ছে।…লীলা, খবর্দার, যদি ভালোমানুষের বেটি হোস্, যদি রূপপুরের কুমুর পেটে জন্মে থাকিস্, বাবা তোর এক। লীলা-রাণী, দেবতা তেত্রিশ কোটি—বিধেতাপুরুষ একজনাই। আর আকাশে সূয্যি—সেও এক বৈ দুই লয়, চন্দদেব—তিনিও একজনা…ওরে পোড়াব-মুখী, মনে কী ভেবেছিস তুই? কুমুদ নাই, আমি আছি। হুঁ বাবা, বাসিনী মরে নাই!…

লীলাও গলা চড়িয়ে ডাকল, বাসিনী!

বাসিনী এক পা এগিয়ে মহাকালীর ভঙ্গীতে শূন্যে অদৃশ্য খড়্গ আস্ফালন করে পাল্টা চেঁচাল, আয়, ইদিকে আয়। ওনার পায়ে ধর, পায়ে মাথা কুটে ক্ষমা-ভিক্ষে কর লীলা। নইলে আজ রক্তারক্তি কাণ্ড

হয়ে যাবে। ফেলে দে আইন-অজিয়তী, আস্তাকুঁড়ে ফেলে দে সব কাগজপত্তর। ইস, কী আমার ছারকপালে গবরমেণ্টো! রে, কাগজে নেকে দিলেই হল? ডাক্ তোর শ্বশুর ভট্টাচায্যিকে—মুখে মারব ঝাঁটার বাড়ি।

লীলা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওদিকে লোকটা হলুদ দাঁত বের করে হাসছে নিঃশব্দে। দৃশ্যটা উপভোগ করছে যেন।

বাসিনী তার পেটে গুঁতো মেরে বলল, হাঁ করে দেখছিস কী? ধর, ওকে এক্ষুনি ধর! গাওয়াগাড়ি ভাড়া করে শীগগীর নিয়ে পালা নিজের ঘরে। আ মরণ! ফের হাসছে। নজ্জা করে না দত্যির মতন মিনসেটা? বলদ, বলদ!...তারপর সে লীলার দিকে অগ্রসর হল। যেন চুলের ঝুঁটি ধরে মেয়েকে বরের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিতে আসছে সেকালের এক পাড়াগেঁয়ে মা।

তৎক্ষণাৎ লীলা সজোরে চড় মেরেছে বাসিনীর গালে। তারপর পিঠে একটা লাথিও।

বাসিনী বুড়ো হয়েছে। চড় খেয়ে মাথা ঘুরে উঠেছিল। তার ওপর লাথি। কাঁক করে ওঠার পর ভিরমি খাওয়ার মত পড়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ওর ভাঙা-গলায় কান্না শোনা গেল। কুমুদিনীর নাম ধরে সে কাঁদছিল। কাঁদছিল—যেন দমহারানো ভেঁপু।

ইত্যবসরে সত্য গলা ঝেড়ে শান্ত স্বরে ডেকেছে, লীলা!

বাসিনীর পড়ে যাওয়া এবং হঠাৎ কেঁদে ওঠায় অপ্রস্তুত হয়েছিল লীলা। কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না সে। তখন সত্যর ডাক শুনে সে অসহায়ের মত উঠোনের ফুলগাছঘেরা বেড়ার খুঁটিটা লক্ষ্য করল। ওপড়ানো যাবে তো? আয়, ঘণ্টাটা কেন প্রেসে চলে গেল? সে ফিরলে তার সঙ্গে যাবার কথা ছিল যে!

সত্য ফের বলল, লীলা! আমি পাগলামি করার জন্যে তোমার এখানে আসিনি। ভুল বুঝো না লক্ষ্মীটি। আমি ভালো হয়ে গেছি। বিশ্বাস করো, যমুনা মরে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে।

লীলা মুখ নামাল। সে থরথর করে কাঁপছিল। কোথায় হারাল

সব সাহস, হারাল চিৎকার করার মত গলার জোর, আশেপাশের বাড়িগুলো সব নিস্তব্ধ, বাইরে দু-একটা রিকশো সাঁৎ করে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোন পথচারীও নেই পথে।

সত্য বলল, যমুনার ছেলের জন্যে এসেছি। যমুনা মারা গেছে শুনেছ? না শোনবারই কথা। যমুনার ছেলে আমার সমস্যা! তাকে আর নার্সিংহোমে রাখতে চাচ্ছে না। তিন মাসের ছেলে—বেঁচে থাকতেই ও এসেছে। তুমি তাকে নেবে?···তোমার তো ছেলেপুলে নেই। নেবে তুমি? অনেক ঘুরেছি—কেউ জায়গা দিতে চায় না। দিদির কাছে গিয়েছিলাম, দিদি মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে।

লীলা কঠোর স্বরে বলল, তুমি যাও। এক্ষুনি চলে যাও বলছি। তা না হলে সেদিনের মত···

সত্য স্মিত হাসল। যাবো। আমি নিজের কথা ভাবিনে লীলা। ওকে তুমি রাখবে?··অবশ্যি শেষ অব্দি কোন অনাথ আশ্রমেই দিতে হবে তাহলে। আমার পাপের বোঝা আমিও বইতে পারছি না—আঃ, একটু হাঁফ ছাড়তে চাই লীলা।

বাসিনী গুনগুনানি থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, এই রইল তোমার পাপের সংসার, রইল তোমার সব—আমি চললাম। কই চল্ বাবা সত্যচরণ, কেউ নাই তোর—আমি আছি। চল্। ওর আশা আর করিসনে। পালা এ বেশ্যাপুরী থেকে।

পরক্ষণে সত্যর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে রাস্তায় নামল। সত্যকে আর কথা বলবার অবকাশই দিল না সে। কয়েক মিনিটের মধ্যে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল আচম্বিতে।

লীলা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য, সারাজীবনের সঙ্গী এই সংসার এই সুখ-দুঃখে ভরা জীবনের গণ্ডী অক্লেশে মুহূর্তে ডিঙিয়ে চলে গেল বাসিনী। তার এত ঔদ্ধত্য এত সাহস এমন কণ্ঠস্বর—কোনদিন ভাবতে পারা যায়নি। যাকে ভেবেছিল রক্তের সূত্রে ক্রীতদাসী, তার সম্রাজ্ঞীর ভূমিকা আশা করেনি।

সারা বাড়িটা নির্জীব হয়ে পড়েছে। রোদের রঙ বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

চারপাশে একটা ধূসরতা ঘনিয়েছে কখন। আর কী শীত, কী শীত! মাথাটা দুহাতে ধরে ঘরে ঢুকল লীলা। বিছানায় উবুড় হয়ে শুল। নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল। বাইরে হাট করে দরজা খোলা। বাইরের দুরন্ত হাওয়া এসে খোলা দরজা পেরিয়ে উঠোনে ঘুরপাক খাচ্ছে। ফুলের ঝোপ নাড়া দিচ্ছে। সব স্তব্ধতা কাঁপিয়ে শুধু ওই উত্তর-হাওয়ার ঝাপটানি।

কতক্ষণ এভাবে পড়েছিল, তারপর অহীন এসে ডেকেছে। লীলা উঠে বসল। চোখ মুছে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, এস।

অহীন একটুখানি চুপ করে থাকার পর বলল, জোর ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। ব্যাপার কী?

লীলার বেশবাস বিশৃঙ্খল, সারা মুখে একটা অপরিচ্ছন্ন আর্দ্রতা, আর বাড়ির দরজা হাট করে খোলা—অহীনের এইসব বৈসাদৃশ্য চোখে পড়বারই কথা। লীলা পা ঝুলিয়ে বসল মাত্র—বুকের একটা পাশ ঢাকা উচিত ছিল, সেটা অজানিতেই। চুল খোঁপা খুলে এলোমেলো হয়েছে। কপালের আদ্ধেকটা ঢেকেছে।

দেখে ফের অহীন ঠাট্টা করে বলল, একেবারে বিষাদের প্রতিমূর্তি যে! এদিকে বাড়ি একদম ফাঁকা···

লীলা খাটের কোণায় মুঠো রেখে চিবুক ঘষতে ঘষতে জানালার বাইরে তাকিয়ে জবাব দিল, বাসিনী চলে গেছে।

চলে গেছে মানে?

আর আসবে না।

কেন? কোথায় গেল সে? দেশে?

কী জানি! লীলা মুখ না ফিরিয়ে শুধু চোখের দৃষ্টিটা এদিকে রাখল। ···আচ্ছা অহীন, এই যে সব আইন-টাইন করা হয়েছে, এত কোর্টকাছারি, এসব কি শুধু লোকদেখানো ভড়ং? কোন মূল্য নেই?

তা কেন হবে? অহীন অবাক হল।···কী বলছেন, বুঝতে পারছিনে কিছু।

লীলা শুধু চোখের তারায় হাসবার চেষ্টা করছিল। সে-হাসির চেষ্টাও বেশ করুণ দেখায়। বলল, তা যদি না হবে, তাহলে…

তাহলে কী?

তাহলে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছিনে কেন? কেন দিনরাত্তির বুকে ভয় পুষে বেড়াচ্ছি, কেন সব সময় মনে হয়, হঠাৎ আমাকে কখন ধরে ফেলবে—তারপর…

হিস্টিরিয়া রোগীর মত কাঁপছিল লীলা। হাঁফাচ্ছিল। অহীন একটু ঝুঁকে বলল, বুঝিয়ে বলবেন, না প্রলাপ বকবেন?

আমার অনেক কথা তোমাকে বলেছি, কিন্তু আসল কথাটা বলিনি। আমি…আমি খুব ভীতু, ভীষণ ভীতু আসলে। সব জোর আমার লোকদেখানো।…বিড়বিড় করতে থাকল লীলা। শোকার্তার মত অসংলগ্ন তার কথাবার্তা।…আর কেউ নেই আমার। এত একা, এত একা হয়ে গেছি ভাই।

অহীন তার একটা হাত মুঠোয় ধরে পাশে বসল। বলল, দেখুন লীলাদি, যে যাই ভাবুক, আপনি আমার দিদির মত। আপনিও আমায় ছোটভাইয়ের মত স্নেহ করবেন। আমাকে সব খুলে বলতে এত দ্বিধা কেন বলুন তো?

লীলা মুখ তুলে বলল, আজ আবার ও এসেছিল।

কে?

সেই লোকটা।

এবার হো-হো করে হেসে উঠল অহীন।…আরে কী মুসকিল, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি—বেশ কিছুদিন আগে আমি আর ঘণ্টা পথে দাঁড়িয়ে আছি, একটা পাগলা কোত্থেকে ছুটে এসে ঘণ্টার হাত ধরে বলতে শুরু করেছে—কাকেও বলিসনে, ওরা আমাকে মারবার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঘণ্টা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সে এক বিকট আর্তনাদ করে দৌড়ে পালাল। ঘণ্টা বলল, রাণীচকের জামাইবাবু। কী আশ্চর্য কাণ্ড! ভেরী স্যাড। তারপর তো আপনি বলছিলেন, একদিন নাকি আপনাকেও জ্বালাতন করছিল। লালু মেরে ভাগিয়ে দেয়। আজ আবার এসে

পাগলামি করছিল বুঝি? থানায় জানিয়ে দিন না, পাগলামি ঠাণ্ডা করে দেবে।

লীলা একটু চুপ করে থেকে বলল, ও আর পাগল নয়। তাই আমার বড্ড ভয় করছে। হয়ত আবার আসবে।

তাই নাকি?

আজ এসেছিল—ওর ছেলেকে আমার কাছে নাকি রাখতে চায়।

ওর ছেলে—মানে, সেই যে মেয়েটি···

হ্যাঁ। মেয়েটি নাকি মারা গেছে। ছেলে নার্সিং-হোমে আছে।

আপনি রাখতে চাইলেন না?

না।

যান, আপনি ভীষণ নিষ্ঠুর মেয়ে।

ও-কথা থাক। লীলা ততক্ষণে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সে ফের বলল, ও কথা থাক অহীন।

বাসিনী তাহলে ওর সঙ্গে গেছে? বাঃ, চমৎকার তো! তাহলে আপনার আর ভয় কী, ছেড়ে দিন ও-কথা। এখন একটা কথার জবাব দিন তো?

কী কথা?

আচ্ছা পরে হবে। কিন্তু খাওয়াদাওয়া হয়নি এখনও—সে তো বুঝতেই পারছি। খাবেন, চলুন। অহীন উঠে দাঁড়াল।

তুমি কোথায় যাচ্ছো?

রান্নাঘরে। দেখি, বাসিনী কী সব রান্নাবান্না করে রেখেছে। চলুন, আমিই আজ গৃহকর্ত্রীর মত সামনে বসিয়ে খাওয়াব। হাত-পাখা ঘোরাব···সরি, এখন শীতকাল যে!

হাসতে হাসতে অহীন সত্যি রান্নাঘরের দিকে এগোল। লীলাও উঠল। আরে! সত্যিই অহীন···

নাঃ, আহারে রুচি নেই। সব ক্ষিদে উবে গেছে। লীলা উঠোনে নেমে বলল, অহীন, পাগলামি করো না। ক্ষিদে পেলে সে দেখব 'খন। তুমি শীগগির একবার প্রেসে গিয়ে ঘন্টাকে পাঠিয়ে দাও। এক্ষুনি।

বলবে, রিকশো করে চলে আসে যেন।

অহীন রান্নাঘরের ভিতর চিৎকার করছিল, আরে বাবা, তোফা! ইলিশ মৎস্য যে! ও লীলাদি, কী সর্বনাশ, মাছ কি এখনও জ্যান্ত আছে? তাহলে লাফাচ্ছে কেন? হায় বাসিনী, তুমি এ কী করলে!

খাওয়াদাওয়া হল না শেষ অব্দি। রান্নাঘরের দরজায় দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলেছে, এমন সময় রমা হাজির। থমকে দাঁড়িয়েছিল সে। তারপর ফিরে চলে যাচ্ছিল কিংবা সেইরকম তার পদক্ষেপ, অহীন চেঁচিয়ে ডাকল, বড়দি, তোর বস কিছুতেই পাতে বসতে চায় না। এদিকে এসে একটু ম্যানেজ করে নে তো। আমি ততক্ষণে চট্ করে প্রেস থেকে আসছি।

রমা ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, প্রেসে আবার কী? আমি তো আসছি ওখান থেকে।

ঘণ্টাকে ডাকতে বললেন যে।

ঘণ্টা প্রেসে নেই।

লীলা উদ্বিগ্নমুখে ছুটে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। রমা জানাল, ঘণ্টা বাসিনী আর সত্যবাবুর সঙ্গে চলে গেছে। ঘণ্টা বলে গেছে, তার কিছু জিনিসপত্তর এখানে রইল। পরে একদিন এসে নিয়ে যাবে। বাসিনী তাকে ছাড়ল না—কী আর করা যায়।

অহীন গম্ভীরমুখে মন্তব্য করল, বেশ দিনটা গেল তাহলে! অসম্ভব নাটক!

কিছুক্ষণ ওরা চুপচাপ বসে রইল বাইরের ঘরে। লীলার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে ওরা দুজনে কোন কথা বলতে উৎসাহ পাচ্ছিল না। লীলার ওপর এই দিনটা যা গেছে—বন্যা নয়, ঝড়ই। এ-বাড়িতে লীলাকে এখন একা থাকতে হবে—এটাই একটা ভয়ঙ্কর সত্য। অমানুষিকও। অহীন বা রমা দুজনেই খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল লীলাকে। মাঝে মাঝে বড় রহস্যময়ী মনে হয় ওকে। আবার কখনও এত অসহায় লাগে যে সত্যি সত্যি ওদের দুঃখ হয়, সমবেদনা অনুভব করে। এখন ওরা জানতে চাচ্ছিল লীলার মনোবল কতখানি টিকে আছে! সেও হঠাৎ সব ছেড়ে গ্রামে পালিয়ে যাবে না তো। গেলে রমার ভাগ্যে কী হবে কে জানে।

প্রেস তো আর সে কিনে নিতে পারছে না। অন্য কেউ কিনলে তাকে রাখবে কিনা—সেও ভাবনার কথা।

সুতরাং এক সময় রমা একটু কেসে গলা ঝেড়ে নিয়ে বলে উঠল, লীলাদি, কী ভাবছেন? বরং প্রেসে চলুন। রাজ্যের কাজ জমে গেছে। আপনি তো প্রুফ দেখতে শিখেছেন। চলুন তো, দুজনে ওই নিয়ে বসি।

লীলা মুখ তুলল মাত্র। কোন জবাব দিল না।

অহীন বলল, তোদের প্রুফরীডার নেই?

রমা জবাব দিল, নাঃ। সুখেনবাবু যদ্দিন ছিলেন, নিজেই দেখতেন। তারপর আমি।

আমায় রাখবি?

রমা হাসল।...আমি কী জানি? আমার বসকে জিজ্ঞেস কর।

লীলাদি, রাখবেন? প্রুফ দেখতে আমি অল্প অল্প জানি।

লীলা বলল, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না ভাই। ওসব রমার কাজ। যা ভালো বোঝে, করবে। আমার বড্ড মাথা ধরেছে। কিছু ভালো লাগছে না।

অহীন উঠল।...দিদি, তুই তো এখন প্রেসে যাবি। আমি এঁর কাছে থাকছি। তুই গেলে আমার ছুটি।

রমা কটমট করে তাকিয়ে বলল, না। তুই প্রেসে যা। নটা অব্দি থাকবি। তারপর বাড়ি ফিরে যাস। চাবি কানাইয়ের কাছে থাকে। চিঠি লিখে দিচ্ছি, আজ থেকে চাবি তোকেই দেবে। কিন্তু সকাল নটার মধ্যে দরজা খুলে দেওয়া চাই ওদের।...রমা ব্যাগ খুলে একটা স্লিপ বের করে লিখতে থাকল।

অহীন বলল, তুই?

আমি এখানেই থাকব। এই নে চিঠি।

তোরা দুজন মেয়ে—একা-একা থাকবি? ভয় করবে না?

কিসের ভয়?

রাক্ষসের।

রমা চড় তুললে হাসতে হাসতে অহীন বেরিয়ে গেল। লীলা উঠে

দাঁড়িয়ে বলল, চল, ওঘরে যাই রমা। আমার বড্ড শীত করছে।

বাইরে বিকেল। রোদের রঙ ময়দানের ঘাস থেকে একটু করে মুছে যাচ্ছে। দূরে কাশিমবাজার মিলের চিমনিটা আকাশের ধূসরতায় মিশে যাচ্ছে ক্রমশ। বাইরে তবু একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে যেন হাত ধরাধরি শিশু-নারী ও পুরুষেরা বেড়াতে বেরিয়েছে। কোথাও খেলার ছুটোছুটি। শীতের বিকেলে শহরের কেউ আর ঘরে নেই। শেষ রোদ গায়ে নিতে সবাই মাঠের দিকে চলে এসেছে। কেবল ওপাশের খৃস্টান কবরখানার দীর্ঘ প্রাচীন অশ্বত্থ আমলকী আবলুস গাছের পাতায় হলুদ রঙ—পাতাঝরা দুরন্ত হাওয়া থামলে গাছগুলোকে নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছিল। আর তাদের চারপাশ ঘিরে নীল কিংবা ধূসর কুয়াশা জমে উঠছিল। জানালার সামনে রমা—বিছানায় লীলা শুয়ে আছে, তার কপালে রমার হাত।

অহীন সামনে থাকলে নির্ঘাৎ বলত, বসের মাথায় হাত দিলে সর্বনাশ হয়—হাতটা নীচেই দে!…অবশ্যি রমা আজকাল মত খোসামুদেই হোক, অতটা নীচে নামতে পাববে না। এটা তার সত্যি সত্যি একটা সমবেদনা—মেয়েদের প্রতি মেয়েদের স্বভাবসুলভ দরদ। তাছাড়া আর কী?

একটু পরে আলো জ্বেলে দিল রমা। তারপর বলল, এখন কেমন বোধ করছেন?

সে কথার জবাব না দিয়ে লীলা বালিশের নীচে হাতড়ে একগোছা চাবি বের করল। চাবিটা রমাকে দিয়ে বলল, ওই নীচের বাকশোটা খোল তো।

এক কোণে গুটিকয় সেকেলে বাকশো পরপর সাজানো রয়েছে। সবগুলোই রঙীন ঢাকনাপরা। বেশ ভারি বাকসোগুলো। নামাতে হাঁপানি ওঠে। নীচেরটা খুলে রমা বলল, তারপর?

ভিতরে ঠাসা কাপড়চোপড়। সবই সেকেলে ফ্যাসানের। চওড়া নকসীপাড় রঙীন সিল্কের শাড়ি। কিছু জর্জেটের কিছু জমজমাট ফুলতোলা লম্বাহাতা রেশমী ব্লাউজ—আরও সব টুকিটাকি। লীলা বলল, একেবারে নীচে একটা টিনের স্যুটকেস আছে। পেয়েছ?

রঙচটা মরচেধরা স্যুটকেসটা তুলে এনে রমা বলল, কী আছে ? বেশ ভারি তো।

গয়না। আমার মায়ের।

কী হবে ?

নিয়ে এসো। কাজ আছে। আর, জানালাগুলো বন্ধ করে দাও। শীত করছে।

বিছানায় নিয়ে গিয়ে স্যুটকেসটা খুলতেই রমা অবাক হয়ে গেল। ঠাসা একরাশ গয়না—শুধু গয়না নয়, অজস্র ভাঙাচোরা টুকরো, কিছু আস্ত সোনার বাট। লীলা বলল, এর মধ্যে বন্ধকী গয়নাও অনেক আছে।

শেষ অব্দি সেকালের ফ্যাসানের কথাই মাথায় এল রমার। কী ভারি গয়না পরত মেয়েরা ! কোন মানে হয় না।

কিন্তু একটা মানে হয়।

ফেল্টুবাবুর ওই বাড়িটা কেনা যায়। চারশো ভরি সোনা নিয়ে যে মেয়ে নির্বিবাদে রাত কাটাচ্ছে এই নিরিবিলি এলাকায়, তার সাহসেরও পরিমাপ করা যায় বৈকি। তুরু-তুরু বুকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল সোনার দিকে। অবশ্যি না বলে দিলে সে চিনে উঠতে পারত না। আজকাল নকল সোনায় বাজার আর শরীর অলঙ্কৃত।

অনেকটা রাত্রে দুজনে মুখোমুখি বসে লুচি তৈরী করল। বেগুন ভাজল। দিনের রান্না ফেলে দিতেই হল। অহীন বলেনি, বেড়াল ইলিশ মাছের নিকেশ করেছে। দরজায় খিলকপাট একেবারে বন্ধ। ঘরে সোনা আছে জেনেই রমা এতদিন পরে শহরটাকে ভয়ের চোখে দেখছিল।

তারপর একই বিছানায় শুয়েছে দুটিতে। একই লেপের তলে। জানালায় খুটখুট শব্দ হতেই রমা কাঠ। লীলা একটু হেসে সাড়া দিয়েছে, অহীন নাকি ?

অহীনই। টিঁকে আছে কিনা দেখতে এসেছিল। বলে গেল, সব স্যাঙাতদের বলা আছে, এদিকে লক্ষ্য রাখবে। তবে পাগল-টাগল দেখলে তারা কিছু বলবে না।

লীলা রসিকতাটা গায়ে মাখেনি।

রমা কিন্তু ঘুমোতে পারেনি সারাটি রাত। সোনার ভয়—তার ওপর বারবার ঘুমের ঘোরে লীলার ককিয়ে ওঠা—কখনও দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরা—এমনকি গায়ে পা তুলে দেওয়া···কী বিচ্ছিরি শোওয়া এই ভদ্রমহিলার! স্বামীবেচারার বুঝি প্রাণান্ত হত। নাকি ওইটাই পুরুষের যত সুখ। রমার জানতে ইচ্ছে করে। আঃ পঁচিশটি বছর কদাচিৎ এমনি জাগন্ত রাত্রি এত দুঃসহ হয়ে ওঠে। পুরুষের ভালোবাসা কী, রমা জানে না। জানবার দিকে মনই ছিল না। মন ছিল বাঁধা সংসারের চাকায়। কবে স্কুল-ফাইনাল পাশ করেছে, মনেই পড়ে না। মা বরাবরই অসুস্থ। বাবার চাকরীও তেমন সুবিধের নয়। কত ভাবনা ছিল মাথায়। চাকরীর জন্যে ছুটোছুটি করেছে। মেলেনি। আসলে রমা নাকি দেখতে সুশ্রী নয়। একটা অসঙ্গত রকমের পুরুষালি তার শরীরে—চেহারায়, চালচলনে ছন্দোবদ্ধ। অহীন—অহীনও টাকা চেয়ে না পেলে কুৎসিত ঠাট্টা করেছে—তোর মত খেঁদিপেঁচার কাছে হাত পেতেছি, এই তোর সৌভাগ্য। রমার নাকটা বড় বিশ্রী গড়নের রমা জানে। খারাপ লাগে বলে আয়না না দেখে চুল আঁচড়ায়।

টেবিল-ল্যাম্পটা সারারাত জ্বলেছে। সে আলোয় লীলার ঘুমন্ত মুখ দেখে সে এতদিন পরে যেন প্রথম ঈর্ষা অনুভব করতে শিখছিল। কত কী হারিয়ে যায় অগোচরে! 'আপনি কী হারাইতেছেন, তাহা জানেন না!' সত্যি।···

সাতসকালে ফেল্টুবাবু হাজির। ভরা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে রমাই গেল দরজা খুলতে। কাপটা নিজেরই। কিন্তু ফেল্টুবাবু উল্টো বুঝে সেটা ধাতস্থ করে একগাল হাসলেন—স্ট্রেঞ্জ ওয়েলকাম! ভেরি ভেরি হ্যাপি রমা। আর ইউ গণকঠাকুরাণী? আমি যে চা না খেয়েই বেরিয়ে পড়েছি—তাও টের পেয়ে বসে আছ দেখছি।

রমা একটু অপ্রস্তুত হয়েছিল। সে ভেবেছিল, অহীন। যাই হোক, বসবার ঘরের দরজা খুলে ফেল্টুবাবুকে বসতে বলে চলে এল সে। দু-একটা চুমুকও দিয়েছে ইতিমধ্যে—সেকথা আর বলা যায় কোনমুখে?

একটু পরেই লীলা এসে দেখা করল। কোণের দিকে বসে সে মৃদুকণ্ঠে বলল, বাড়িটা কিনে নেব ভেবেছি। দরদামের কথা জিগ্যেস করতে অবশ্যি সাহস হয়নি। এখন আপনি যদি···

সে হচ্ছে। হাত তুলে থামাল ফেল্টুবাবু।··আমি এলাম, মানে জাস্ট একটুখানি আড্ডা দেওয়া আর কী। ওঃ, সুখেনের কাছে আপনার কত কথাই যে শুনেছি। কতবার ভেবেছি—যাই, নিজেই যেচে গিয়ে আলাপ করে আসি। পারিনি কারণ কী জানেন? ওই সুখোটাকে ভীষণ ভয় করতুম। ও একটা ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যাল। ও সব করতে পারে। তবে ওই যে বলেছি, জগার হাতে ওর রেহাই নেই! অপেক্ষা করুন—কীচকবধের দেরী নেই!

হা হো করে হাসতে লাগল ফেল্টুবাবু। ধূসর কটস্উলের পাঞ্জাবি—খোলা বোতাম, গলার নীচে সোনার চেনটা চকচক করছে। মাঝে মাঝে আঙুলে জড়িয়ে একটু টেনে আনছে। মাথায় পুরু খসখসে লাল মাফলার পাগড়ির মত জড়ানো। সাদা পাজামার তলায় হরিণের চামড়ার চটি। হাতে কালো ছড়ি। কড়ে আঙুলে একটা মোটা পলাবসানো চাঁদির আংটি। বেশ মেজাজী চেহারায় বসে রয়েছে। বিস্কুটরঙা আলোয়ান কোমরে পেঁচানো—লীলা রূপপুরে থাকতে বাসায় বসা একটা ট্যাসকোনা পাখি দেখেছিল—তেমনি দেখাচ্ছে ফেল্টুবাবুকে।

আর স্বীকার করতে হয় ভদ্রলোকের চেহারা সুন্দর। উজ্জ্বল গৌর রঙ কিছুটা নিষ্প্রভ - হয়ত শীতে—হয়ত অত্যাচারের মালিন্যে। চোখের নীচে খয়েরী ছোপ। তাহলেও পুরুষোচিত। বরং রাজোচিত বলাই শোভন। মাতাল না হলে এইসব পুরুষ জীবনে অনেক কিছুই করতে পারত।

আপনার খারাপ লাগছে না তো? ফেল্টুবাবু চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে ফের বলল।···সাতসকালে এসে জ্বালাতন করছি বুঝি?

লীলা আঙুলে আঙুল জড়িয়ে সলজ্জ হেসে বলল, তা কেন? আজ আবার আপনার কাছে যেতাম।

আমার সৌভাগ্য। তবে কী জানেন, ও নরকে আপনার না যাওয়াই

ভালো। বরং মাঝে মাঝে আমিই আসব এখানে।

লীলা কথাটা স্পষ্ট করে দিল।...বাড়ির ব্যাপারেই যেতাম। খুব শীগগির হলেই ভালো হয়।

বাড়ি উঠে পালাচ্ছে না আপনার সুখেনের মত। সে হবে'খন। ফেল্টুবাবু বলতে লাগল। জানেন, ওই যে মেয়েটি নিযে সুখেন ভেগেছে, সে একটা ইযে। ও আপনি ভাববেন না। যেইসানকে তেইসান মিলে গেছে। এবার সুখেনের আর রেহাই নেই। শিবি ওকে ঠিক জাযগায় ঠুকে বসিয়ে দেবে। অবশ্যি যদি ইতিমধ্যে জগা একটা খুনখারাবি না কবে বসে।

রমা ওদিকে উনুনে আঁচ দিযেছিল। এ বাড়ির সব দায় কাঁধে নেবার লক্ষণ তার আচরণে। এক ফাঁকে এসে লীলাকে বাঁচাল সে। ফেল্টুদা, একটু উপকার করবেন?

চওড়া জানুতে চাপড় মেরে ফেল্টুবাবু বলল, আলবৎ করব। বলো, বাঘের দুধ চাই?

না, মূলো।

মূলো? সে কী হবে? ফেল্টুবাবু আকাশ থেকে পড়ল।

মুগের ডালে দেব।

তাই বলো! ফেল্টুবাবু হতাশভাবে মাথা নাড়ল।

আর চাই পালংশাক বরবটি টমাটো।

হুম!

আজকাল বাজারে গঙ্গার টাটকা ইলিশ উঠেছে। না পেলে গঙ্গার ধারে যান। জেলেদের কাছেই পাবেন।

ফেল্টুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে দু'পকেটে হাত ভরে কাঁচুমাচু মুখে বলল, কিন্তু সঙ্গে টাকাকড়ি নেই যে।

আমি দিচ্ছি।

থলে?

তাও দিচ্ছি।

লীলা অবাক। হাঁ হ'য়ে করে উঠেছে সে।...আরে, ও কি রমা!

সত্যি সত্যি ওঁকে বাজার পাঠাচ্ছ যে!

রমা নির্বিকার মুখে বলল, অহীনের পাত্তা নেই এখনও। প্রেসে ছুটতে হবে একটু পরেই।

অহীনকে আসতে দাও।

ফেল্টুবাবু থলেটা হাতে নিয়ে বলল, অহীন এখনও ঘুমোচ্ছে। তাছাড়া ও তো একটা বাউণ্ডুলে। বাজার করার জানে কী! দেখুন না, বাজারশুদ্ধ নিয়ে পৌঁছচ্ছি। রমা, অন্তত গোটা দশেক টাকা দিও কিন্তু।

কী দিল রমাই জানে। পকেটে গুঁজে দিতেই ফেল্টুবাবু ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। লীলা গম্ভীরমুখে বলল, এটা কী হল রমা?

রমা হাসল। ফেল্টুদা এমনি মানুষ। দেখবেন, খেতেও চাইবে।

সে কি!

হ্যাঁ।

তুমি ওঁকে খেতেও বলবে নাকি?

আপত্তি কী।

কী যে কর, বুঝিনে।

রমা শাসনের সুরে বলল, চুপচাপ বসে থাকুন তো। যা করার আমিই করব।

লীলা উঠল।...তাই কর। আমি একবার বেরোব।

কোথায় যাবেন আবার?

তোমাদের বাড়ি হয়ে অহীনকে নিয়ে যাব আঢ্যিমশায়ের গদীতে।

গয়না বেচতে?

রমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কয়েকমুহূর্ত। লীলা তার ঘরে চলে গেল। উঠোনে নামবার সময় রমা মুখ ফিরিয়ে দেখল লীলা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে পড়েছে। চিরুনিতে তার হাত। রাগে বিরক্তিতে জ্বলে উঠতে গিয়ে সামলে নিল রমা। লীলার উদ্দেশ্যে বলল, শীগগির ফিরবেন। নৈলে আমার প্রেসে যাওয়া হবে না।

পুবের জানালা দিয়ে সকালের সব রোদ লীলার গায়ে পড়েছে। অনেক মেঘঝড়জলের পর পরিচ্ছন্ন সতেজ গাছের মত উজ্জ্বল হয়েছে সে। বরং শেষ অব্দি ভালোই লাগল রমার।

তেইশ

রমার শোওয়ার ভঙ্গী লীলারও পছন্দ নয়। এখন শীত—লেপের আড়াল রয়েছে, তা না হলে সে এক অনাছিষ্টি দৃশ্য দেখা যেত। গ্রামের মেয়ে হিসেবে লীলার অবশ্য নানারকম শোওয়ার ভঙ্গী বিস্তর দেখা আছে। রূপপুরের বাড়িতে হরু ঘণ্টার মা বাসিনীরা তো বটেই, বাবা নায়েব ছিলেন—সে সুবাদে অনেক লোককে তাদের বাইরের ঘরে শুয়ে থাকতে দেখেছে। এখন ভাবলে লজ্জা করে। অবশ্য ওরা গ্রামের মানুষ। শরীরের মাংস নিয়ে মাথাব্যথা কম, ডাল-ভাতের মত সহজ সব। বাবাও কি কম যেতেন? নায়েবমশাই নামেই—মায়ের ভাষা 'দশ হাত কাপড়েও ন্যাংটো!' সব সময় হাঁটুর ওপর গোটানো থেকেছে। মায়ের ধমক খেলে অপ্রস্তুত হেসেছে বাবা। নিবারণদার নতুন বৌ—রাণীগঞ্জের মেয়ে, পাড়াতুত জ্যাঠশ্বশুরকে প্রণাম করতে এসেছে। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন যেন ব্যাঘ্রচর্মধারী মহাদেব—পা বাড়ালেই দিগম্বর হবার দাখিল। ওই অবস্থায় আশীর্বাদ করছেন। পরে মা ফেটে পড়েছিলেন—এবার তোমাকে সায়েবী পাতলুন পরিয়ে ছাড়ব! নয়ত মোছলমানদের মত—ওই যে কী বলে··বাবাই যুগিয়ে দিয়েছিলেন—পায়জামা! পাতলুন-পায়জামা পরে কী হবে কুমু, মানুষ ন্যাংটো হয়েই আসে—ন্যাংটো হয়েই চলে যায়। বেশ আছি। কথাটা এত ভাল লেগেছিল বালিকা লীলার। আজও কানে বাজে।

তবে এসব সাজে পুরুষমানুষকে। কিন্তু রমা! দুষ্টুমি করে লীলা কোন কোন রাতে লেপ তুলে দিয়েছে। রমার এত ঘুম। আরও কুঁকড়ে ফেলেছে শরীরকে, ভুরু কুঁচকে ঠোঁটে অর্ধেকজাগা হাসি, বেপরোয়া। এই সব মেয়ের বিয়ে হলে কী করবে?

বাইরের ঘরে একটা খাট আছে। সেটা এঘরে আনা যায়। কিন্তু রমা কী ভাববে? তাছাড়া লীলার কী একটা বিশ্রী অভ্যাস হয়ে গেছে—একলা শুলে গা ছমছম করে, ঘুম আসে না। কদিন আগে ভুল করে

পাশের জানালাটা বন্ধ করা হয় নি। হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। রমাকে ডেকেছিল, সাড়া পায় নি। মাথার কাছের টেবিলে জল থাকে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। জল খাবার পর জানালার ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল সে। বাইরে শীতের রাতের জ্যোৎস্না কবরখানায় কোন আলো নেই। ঘন নীলরঙা কুয়াশা আর জ্যোৎস্না মিলে একটা দূরের জগৎ—কোন শব্দ নেই, কোন স্পন্দন নেই, নিঃসাড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মনে হয়েছিল, হয়ত চোখের ভুল, একটা ছায়া নড়াচড়া করছে কবরখানার পাঁচিলের এপাশে। তারপর সেই ছায়াটা এসে তার অযত্ন-লালিত সব্জাক্ষেতের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়েছে স্থিরভাবে। চোর-ডাকাত নয়ত? বুক কেঁপে উঠেছিল লীলার। নগদ টাকাকড়ি আগের দিন অনেকগুলো ছিল। আজ আর নেই। বড়জোর পেতে পারে সামান্য কিছু হাতের বা কানের সোনা, একটা রিস্টওয়াচ—আর কী! ভয় সত্ত্বেও একটু হেসে জানালাটা প্রায় নিঃশব্দে বন্ধ করেছিল সে। তারপর শুয়ে পড়েছিল। অনেকটা রাত অব্দি ফেল্টুবাবু জ্বালাতন করে গেছে। ওকে নিয়ে সে এক সমস্যা। অহীন এসে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে গেছে—তা না হলে যেত কিনা কে জানে! আজকাল তো ভদ্রলোকের হাতে প্রচুর টাকা। প্রচণ্ড মদ খাচ্ছে আর এখানে-ওখানে অনাছিষ্টি কাণ্ড করছে। অহীন বলে, ফেল্টুদার আশা, শহরটা চুপসে দেবে একেবারে।…

ফেল্টুবাবু নয়ত? মাতালের পক্ষে এমন ঘোরাঘুরি খুবই সম্ভব। তারপর একটু তন্দ্রামত এসেছে লীলার—হঠাৎ মনে হল খুব কাছেই কে তার নাম ধরে ডাকছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোরটা কেটে গিয়েছিল লীলার। কান পেতেছিল। আর কোন শব্দ শোনে নি। কিন্তু ভয় পেয়ে রমাকে ডেকেছিল। রমার ঘুম ভাঙাতে তাকে চিমটি কাটতে কাতুকুতু দিতে, শেষ অব্দি রেগে খামচা-খামচি করে সে এক মারাত্মক লড়াই। তারপর যদি-বা মেয়ের ঘুম ভাঙল, চোখ বুজেই বলল, দরজা-জানালা বন্ধ আছে তো? তাহলে চুপচাপ ঘুমোন। বরং কাল থেকে অহীনকে বলব, বাইরের ঘরে শোবে।

কে ডাকছিল তাকে? কার ছায়া দেখেছিল কুয়াশাভরা জ্যোৎস্নায়? অত ঠাণ্ডায় দুপুর রাতে কে কী ষড়যন্ত্র নিয়ে ফিরছিল কে জানে। কণ্ঠস্বরটা বুঝতে পারে নি। পরদিন অহীনকে সব বলাতে সে ফেল্‌টুবাবুর কাছে নাকি জিজ্ঞেস-পত্তর করেছিল। ফেল্‌টুবাবু মাকালীর দিব্যি কেটেছে। না, ফেল্‌টুবাবু নয়, একথা ঠিকই। কারণ সে রাতে ফেল্‌টুবাবুকে রিকশো করে তাব বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে অহীন। টানতে-টানতে নিয়ে গিয়ে তার ঘরে শুইয়ে রেখে তারপর বেরিয়েছে। শীত এখন পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসেছে। মাতালকেও তার দাঁত বিলক্ষণ কাবু করে। শীতের রাতের শহরে মাতালদের সচরাচর ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় না। সবাই তখন ঘরের স্ফূর্তি চায়। ওই ফেল্‌টুবাবুই তো বলে—শীত এলে মনটা মুষড়ে যায় রে! ওই যে কথায় বলে না—মাঘ মাসে যার ইয়ে নেই সে যাক না শ্মশানঘাটে।

রমার ব্যবস্থামত অহীন কিন্তু শুতে রাজী হয় নি। বলেছিল, বড়দিকে কম মনে করবেন না। ও একশো ডাকাত রুখতে পটু। আমি আজে-বাজে প্রকৃতির ছেলে, কোথায় কখন কী অবস্থায় থাকি বলা যায় না।

রমা চোখ পাকিয়ে বলেছিল, তোকে প্রেসের দায়িত্ব দিতে চান দিদি, আর তুই এমন পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াবি?

যা বাব্বা। কী কথায় কী বলে। প্রেসে দারোয়ানী করব, আবার এখানে এসেও ছারোয়ানী করব। কী পেয়েছিস আমাকে তোরা?

কথাটা বলেছিল লীলার সামনেই। তাই লীলা দুঃখিত হয়েছিল বইকি। কিন্তু বিকেলে ওই অহীনই লীলাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেরোলে লীলার মন হাল্কা হয়ে উঠেছিল। পথে অহীন বলেছিল, বড়দি মেয়েটার সব আমার ভালো লাগে, বুঝলেন? ভালো লাগে না ওর বলবার ভঙ্গিটা। যেন সব তাতেই একটা আপিস আপিস ভাব। পৃথিবীটা এই সব লোকেরাই নীরস করে ফেলছে। তবে বুঝতে পারছি, আমার লীলাদি ভীষণ ভয় পান আজকাল—তিনি সরলা অবলা স্ত্রীলোক…

লীলা হেসে ফেলল, কী সব বলছ?

অন্যায় বলছি নাকি? নৈলে দিনদুপুরে যখন তখন ভূত দেখছেন

কেন ?

তারপর লীলা অনেকক্ষণ আর কথা বলে নি। ইদানীং সে প্রায়ই ভূত দেখছে এখানে ওখানে। ভীড়ের মাঝে একটা লোক ময়লা পাঞ্জাবী, রুক্ষু চুল, গাছতলায় শুয়ে থাকা কোন পাগলা, হয়ত আচমকা পিছন থেকে কে তার নাম ধরে ডেকে উঠবে···একটু 'কান পাতলা' যাকে বলে, সেইরকম। গঙ্গার ব্রীজ হবে বলে এপার-ওপার মাটি জড়ো করেছে—সেই উঁচু পথের মাথায় কে সেদিন সামনে ঝুঁকে গঙ্গার জল দেখছিল। অহীন বলেছিল, চলুন ওদিকে। উঁচু থেকে আমাদের শহর দেখে আসি। বাপ্‌স, কী এলাহি কাণ্ড না চলেছে! বড় বড় ড্রোজার আর কপিকল হাজার টন লোহা সিমেণ্ট···যাই বলুন, টাকার কিন্তু অভাব নেই। কেবল চাকরী চাইলেই···লীলা আনমনে জবাব দিয়েছিল, চাকরী পেলেই কি তুমি করবে? অহীন হাসছিল। আপনি দিচ্ছেন বুঝি? লীলা বলেছিল, প্রেসটা তোমার দিদির সঙ্গে মিলে চালাও। যা হবে, সবই তো তোমাদের। আমার আর কী চাই। অহীন আরো হাসল। বাপ্‌স, এক্ষুনি বৈরাগ্য ধরে গেল? চলুন, উঁচুতে ওঠা যাক। উঁচুতে উঠলে নাকি বিষয়-বৈভব সবই তুচ্ছ লাগে। কই, পারবেন না বুঝি? এ কি লীলাদি, আপনি না শতমুখে গল্প ঝাড়েন পাড়াগাঁয়ের গেছো মেয়ে!

পশ্চিমের পড়ন্ত রোদের সবটুকু গায়ে নিয়ে কে অবহেলায় ঝুঁকে পায়ের নীচে জল দেখছে। কে ও?

···জানেন, বাঙালী মেয়েরা আজকাল পাহাড়ে চড়ে। তুষারশৃঙ্গ না কি বলে, তা সব সুচের ডগার মত। সেখানে পতাকা পুঁতেছে। কই হাত দিন! লীলা ঘেমে উঠে বলেছিল, থাক। ব্রীজ শেষ হলে ওঠা যাবে। আমাকে আবার একবার প্রেসে যেতে হবে। বাইণ্ডারদের টাকা দিতে হবে নাকি, রমা বলছিল।

লীলার মুখটা বুঝি অসম্ভব লাল দেখেছিল অহীন। ফেরার পথে দুম করে বলে উঠেছিল, আজকাল বুঝি আর ক্রীম মাখেন না লীলাদি? আপনার গাল ফেটেছে দেখেছেন?

লীলা আলগোছে গালে হাত বুলিয়ে নিয়ে পিছন ফিরে সেই

লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করছিল। জবাব দেয় নি কথাটার। লোকটার গায়ে কি পাঞ্জাবী, না শার্ট ?

প্রেসে ফিরে গিয়ে সে এক কাণ্ড। ফেল্টুবাবু রমার সঙ্গে হাত মুখ নেড়ে গল্প জুড়েছে। অহীনকে দেখেই সোজা জানিয়ে দিল, ডোণ্ট ডিসটার্ব। আমি রমাকে একটা প্ল্যান দিচ্ছি। বসুন মিস ঘোষ। বরং আপনাকেই আগাগোড়া সবটা বলি। ফাইনান্স'র তো আপনিই।

শুধু ওখানেই ক্ষান্ত হয় নি ফেল্টুবাবু। লীলার বাসায় এসে যথারীতি দশটা অবধি কাটিয়ে অহীনের টানাটানিতে শেষে উঠেছিল। ভদ্রলোক অতগুলো টাকা পেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ। সাহুমশাইরা একটা আধা-বিলিতী ধাঁচে জার খুলেছেন ওদিকে। বারে লোক মন্দ জোটে না। নতুন নতুন মুখ সব। তাদের সবাইকে নাকি একদিন খাইয়ে ফেলেছে ফেল্টুবাবু। অহীন সঙ্গে ছিল হাত ধরে টানাটানি করেও রুখতে পারে নি। দু-চার পাত্র পেটে পড়ার পর তখন ফেল্টুবাবু স্বয়ং বাংলা বেহার উড়িষ্যার মহান নবাব। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল—এভরি বডি অন মাই একাউণ্ট। পকেট থেকে মুঠোমুঠো দশ টাকার নোট বের করে সাহুমশায়ের হাতে গুঁজে দিচ্ছিল

ও টাকা তো লীলার। লীলার কেন লীলার মায়ের। তার বাবার ঐ টাকার সঙ্গে কয়েক পুরুষের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। রূপপুরের মাঠের সোনা ফলান সব জমি। কত অভাগা চাষা-ভূষোর অশ্রুতে ভিজে মাটির টুকরো। কত গৃহস্থবধূর অলঙ্কার! কে জানে—অনেক ভালবাসা, দুঃখ দাবি কান্নার স্পর্শে করুণ, ঘোষ বাড়ির লোহার সিন্দুকে বন্ধকী কবালায় কত সব বিচিত্র ইতিহাস লেখা ছিল! হতভাগিনী মেয়ে এল কুলনাশিনী। সব ভাঙল। উন্মূল হল কতদিনের পুরনো গাছ!

সজল নিঃশব্দে গভীর দুঃখ আর হয়তো ঘৃণা নিয়ে ফিরে গেছে রূপপুর। এই শীতে সব জমি থেকে ফসল উঠছে। গ্রামের মানুষের চোখে শীতের সোনালী রোদে ভরা পৃথিবী স্বর্গের প্রত্যাশায় পূর্ণ! সবটুকু বেচে দিল লীলা? পা রাখবার একবিন্দু মাটিও রাখল না!

লীলা যখন ভাঙে, এমনি করেই নির্বিকার মুখে মুচড়ে দুমড়ে ভাঙে।

পৃথিবী একদিকে, সে আরেকদিকে। সে যেন সব কিছু ভাঙতে এসেছে, গড়ার দায়িত্ব তার নয়। নিষ্ঠুর রাক্ষসীর মত তাকায় চারপাশে··· কিন্তু এর পর ? আর কী রইল তোমার লীলা ? কী ভাঙবে আর ? ছুটো বাড়ি, একটা প্রেস। ব্যস ! যদি তাও এমনি করে ভেঙে ফেল, কী হবে তোমার ভেবেছ ?

ও রঘুপণ্ডিতের ছেলে। ওর চালচলনে মুখের কথায় এই সব পণ্ডিতী আছে বিস্তর। কথা বললে থামতে চায় না। উপদেশ দিতে নামলে ওকে সামলানো কঠিন। প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী করে সজল। তার অবশ্য কোনরকমে চলে যাবেই।

লীলা বাসিনীর দরুন মাসে মাসে টাকা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সজল হ্যাঁ-না কিছুই জবাব দেয়নি। হয়ত এসব কথা বলার পিছনে তার একটা মতলব ছিল। বুদ্ধিমতী লীলা সেটা আঁচ করে নিজ মুখেই তুলেছিল কথাটা। কাছে দেবার মত টাকা থাকলে তখনই দিয়ে ফেলত, ছিল না। ব্যাঙ্কেও আমানতের অঙ্ক চড়ায় ঠেকেছে। এখন শুধু প্রেস ভরসা।

কিন্তু বুড়িটা একটা জারজ ছেলেকে নিয়ে মেতে উঠল—এ রাগ পড়তে চায় না। ভাবলে তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলে ! ভেবেছ তোমায় টাকা পাঠাব ? কক্ষনো না। যেদিন শুনব, ও আপদ বিদেয় করে রাণীচকেই লোকটার বাড়ি থেকে রূপপুরে গেছে, সেদিন। এখন নয়।

আজ অব্দি টাকা পাঠায়নি লীলা। বাসিনী লোক পাঠাক, তারপর দেখা যাবে।

কিন্তু লোক পাঠাল কই বাসিনী ? রাগের ঝোঁকে কাপড়-চোপড় যা ফেলে গিয়েছিল, সজলের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সজল রাণীচক হয়ে যাবে। ঘণ্টার গুলোও দিয়েছে। ঘণ্টা তার মায়ের কাছে থাকে। শীগগীর নাকি বিয়ে করে ফেলছে সে। রূপপুরে থাকলে সব খরচ দান-ধ্যান যা দরকার, লীলাকেই দিতে হত। খুব বাঁচা গেছে বাবা ! এখন নিজের দিকেই আঁটোসাঁটো হয়ে আসছে সব—আসুক। কতদূর ডুববে ?

তল অব্দি দেখা যাবে না হয়। জীবনে মাঝামাঝি নামে কোন জায়গায় থেকে গায়ের জ্বালা মেটে না। হয় এপার, নয় ওপার।··

এমনি করে একটা অন্ধ প্রচণ্ড মারাত্মক শক্তি লীলাকে টেনে নিয়ে চলেছে কোথায়—আবছা বোঝবার মত বয়স আর মানসিক পরিণতি লীলার হয়েছে। আর সে-ভয়ে সে-হতাশায় ভীত থাকে না। এখন লীলার ভয়, অন্য ভয়। ভূতের ভয়। কে নাম ধরে ডাকে। কে বলে—খুব হয়েছে, ফেরো লক্ষ্মীটি। পাগলামি ভালো হযেছে জানতে পারা সবচেয়ে মারাত্মক। পাগলরা তখনই নাকি সবচেয়ে ভয়ানক হয়ে ওঠে। এদিকে হয়ত এত দিনে সে একতলা ছোট্ট বাড়ির উঠোনে আগাছা গজিয়েছে। সাপ চলে। শেয়াল এসে দাঁড়িয়ে থাকে। শিউলিতলার পাশে, টিউবেলটা ডুবে গেছে ঝোপেঝাড়ে। চামচিকের বাসা, চড়ুইয়ের বাসা। আরশোলা ইঁদুর ছোটাছুটি করে। কুমুদের দেওয়া খাটের নীচে ঘুণপোকার শব্দ ওঠে সারা রাত। দেয়ালের কোণে গোখরোর খোলস। মাঝরাতে ফণার ছায়া সাঁৎ করে হেলে পড়ে ইঁদুরের দিকে···

রমা, রমা, শুনছ? এই?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে লীলার ঘুম ভেঙেছে। প্রচণ্ড জোরে চুল খামচে ধরেছে রমার। রমা চোখ খুলেই দেখেছে, ঘরভরা উজ্জ্বল আলো। কী হয়েছে?

আমার বড্ড গা কাঁপছে।

রমা জড়িয়ে ধরেছে নিবিড়ভাবে···ব্যস। এবার চুপচাপ ঘুমোন তো।

তারপর সকাল হলে ফের সেই সপ্রতিভ মার্জিত আচরণ—প্রতিদিনের লীলা ফিরে এসে সংসারের খবরদারী করে। রাত এলেই মুখ শুকিয়ে যায়। ঘুম হারায়। আর ভাবনা···ভাবনা···ভাবনা, ছাই-পাঁশ হাতী-ঘোড়া অনাছিষ্টি মাথামুণ্ডুহীন।

লীলা জেগে থেকে ইদানীং একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার করছে, জানতে পারলে রমা হয়ত শুতেই চাইত না। ভাগ্যিস ও বড্ড ঘুমকাতুরে। ওর অপরাধ নেই। সারাটি দিন—তারপর রাত নটা-দশটা অব্দি বা খাটছে,

ঘুম খুবই স্বাভাবিক। ও ঘুমোলেই কাপড়-চোপড় অসম্বৃত হয়ে যায়। তখন লীলা যেন তার ভাবনার চাপ থেকে বাঁচতে পনেরো পয়েন্টের টেবিল ল্যাম্পটা জেলে একটু লেপ তুলে রমার দেহ খুঁটিয়ে দেখে। মজার কথা, বাসিনী এমনি করে ঘুমন্ত কিশোরী লীলাকে দেখত। লীলার বরাবরই ঘুম পাতলা। জেগে উঠেই দেখত ওই বিশ্রী কাণ্ড। বাসিনীর কৌতূহলী জ্বলন্ত চোখ থেকে যেন তাপ বেরোচ্ছে। লীলা চেঁচামেচি করত। বাসিনী একটু হেসে বলত, কিছু না। তোমার বয়স দেখছি বাছা। সবায় দেখে মা-মাসিরা। দেখতে হয়।

রমার মধ্যে পুরুষালি একটা ভাব রয়েছে, তা তার দেহের মধ্যেও যেন ছায়া ফেলেছে। পরক্ষণে লীলা নিজের প্রতি ঘৃণায় কটু হয়ে ওঠে। সে কি বাসিনীদের মত বুড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ? কেন এ অশালীন কৌতূহল?

অভ্যাসটা কতদূর এগোবে কে জানে, ঘুচল অবশেষে। ফেল্‌টুবাবুর সতীর এক বোনঝি ছুলি—অহীন তাকে সঙ্গে করে এনে সঁপে দিল লীলার হাতে। ছুলির বিয়ে হয়েছিল যার সঙ্গে—সে লোকটা কাকে নিয়ে সুখেনবাবুর মত কলকাতা পালিয়েছে। কোন পাত্তা নেই। তবে ছুলি বাবুবাড়ি কাজকর্ম করেই মানুষ হয়েছে। রান্না-বান্নাতেও পটু—অবশ্যি যদি এনাদের রুচিতে না বাধে।

মেয়েটি বেশ সুশ্রী—হাতের কাজকর্মও ছিমছাম পরিষ্কার। ভালোই লাগল লীলার। বিশ্বাসী না হয়ে উপায় নেই। সতীমাসির ঘুপটি ঘরে তার ঠাঁই হয় না। তার ওপর আছে হাজারজনা ইতর গুণ্ডার চোখ। বরং বড়লোকের বাড়ি নিরাপদে থাকবে।

অহীনের দ্বিতীয় বক্তব্য হল, রমার জন্যে মা বকাবকি করেন। দিন-রাত্তির কোথায় থাকে, কী করে—কোন খবর নেই। তার ওপর কে দেখেছে নাকি এখানে ফেল্‌টুবাবু আসেন। মায়ের কানে তুলেছে। সুতরাং মা বলছেন, ওর চাকরীতে দরকার নেই। অহীনের মত যোগ্য ছেলে থাকতে তাঁর মেয়ে একটা নচ্ছার জায়গায় পড়ে কী বিপদ বাধাবে—সেটা কি ঠিক হবে?

রমা ছিল না তখন। এ সময় তার এখানে থাকবার কথা নয়। কিন্তু অহীনের নিঃসঙ্কোচ কথাগুলো শুনতে শুনতে লীলা রাগে জ্বলে উঠেছিল। আশ্চর্য ভদ্রমহিলা তো! মুখে এক ভিতরে অন্য! তবে রাগ করা সম্ভব হল না শেষ অব্দি। কথাগুলো পাচার করে এনেছে তাঁর ছেলে।

লীলা বলল, এ সব কথা আবার রমার কানে তুলো না। ও রেগে-মেগে কী সব করে বসবে। আর আমি একা-একা চোখে সর্ষের ফুল দেখব।

অহীন বলল, কেন? আমিও তো রয়েছি। রামের ছোট ভাইয়ের নাম কী ছিল যেন······

লীলা সকৌতুকে বলল, রাম মরেছে। এখন শুধু সীতা আর লক্ষ্মণ বাকি রইল।

নিজেকে সীতা ভাবতে খুব ভালো লাগছে বুঝি? রোমাঞ্চ হচ্ছে?

লাগছে বৈকি।

ঠিক আছে। গণ্ডী টেনে দিন। পাহারায় রইলাম। কিন্তু সাবধান—রাবণ আছে। সে বড় মায়াবী স্কাউণ্ড্রেল।

লীলা একটু ঝুঁকে ওর হাতের চেটো নিল। নখের আঁচড় কেটে বলল, তাহলে আজ থেকে তুমি শুচ্ছ এখানে।

অহীন হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, সুড়সুড়ি লাগছে। কিন্তু খাওয়াটা কি মাযের হোটেলে সেরে আসতে হবে নাকি? একে তো মা কেন জানি না চটে আগুন হয়ে থাকেন আজকাল—তার ওপর যদি শোনেন, এখানে শুচ্ছি···

কেন? চরিত্র নষ্ট হবে?

লীলা এমন ভঙ্গীতে কথাটা বলল যে, অহীন কয়েক মুহূর্তে থ বনে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। এতদিন লীলাদির সঙ্গে মিশছে। ঠাট্টা-ইয়ারকিও কিছু না হয়েছে, এমন নয়। অথচ আজ এই প্রশ্নটায় কী যেন আছে—তা অশালীন হয়ত নয়, কিন্তু লীলাদির পক্ষে এটা এক অস্বাভাবিক স্পষ্টতা। ভিতরে খুব মারাত্মক জোর না থাকলে এমন সোজাসুজি কথা কাকেও বলা যায় না সম্ভবত।

অহীন হাড়ে হাড়ে জানে, লীলা সতীসাধ্বী মেয়ে নয়। বুঝতে পারে মারাত্মক সর্বনাশা আগুনের পাশে তার বাস। অন্তত এই তার ধারণা। আর অহীনও খুব সাধুসন্ত প্রকৃতির নয়—মুখে যাই বলুক।

অথচ লীলার মধ্যে কী যেন আছে··হয়ত তা অসহায়তা, করুণার প্রত্যাশা কিম্বা কোন একটা দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণ ক্ষমতা। তা না হলে কেন সে তার সঙ্গ ছাড়তে পারে না। বরং ভালোই লাগে মেলামেশাটা। নিজের মনে কোন গোপন অভিসন্ধি আছে বলে কোনদিন তো টের পায় না। তা যদি টের পেত, হয়ত কবে··

নাঃ। এ একটা অভ্যাস। শুধু অভ্যাস। সেই যে রাতে লীলার সঙ্গে তার বাড়ি এসেছিল একই রিকশোয়, পরদিন ভোরে জগদীশের দোকানের সামনে বস্তা চোরাই মাল ফেলে গেল, সেটা অহীনেরই পরামর্শে—আর সেই রাত থেকে লীলাকে তার ভীষণ ভালো লেগে গেল—সবকিছু খুঁটিয়ে বিচার করলে অবশ্য সন্দেহে মন স্যাঁতসেঁতে হয়ে ওঠে। লীলা অসাধারণ সুন্দরী—জেদী আর একটু বন্য প্রকৃতির—সব মিশিয়ে ব্যাপারটা রোমান্সেরই কাছ ঘেঁষে যায়। তাহলেও অহীনের কাছে লীলা যেন এক ধরা-ছোঁওয়ার বাইরের জিনিস। বয়স, মানসিক দূরত্ব—হিসেব করলে কত কী মাথামুণ্ডু কৈফিয়ত পিলপিল করে পথ আগলে দাঁড়াবে। দেহটা হয়ত সব—কিন্তু সবসময় সব নয়। দেহের ভিতর যেন বা একটা মায়া-দেহের অস্তিত্ব টের পেয়েই সরল প্রেম ঘোরালো হয়ে ওঠে। জটছাড়ানো কঠিন হয়।

লীলা দুষ্টু-দুষ্টু হেসে ফের প্রশ্ন ছুঁড়ল, কী খোকাবাবু, খাবি খাচ্ছ জবাব দিতে? আমার কিন্তু লজ্জাটজ্জা নেই। জানোই তো আমি কী!······

অহীন গম্ভীর মুখে বলল, দেখুন, চরিত্র-টরিত্র ওসব থাকে বাবা-মায়েদের। আমরা যারা এখনও ছেলেপুলে হয়ে আছি, তাদের আবার ওসব কী!

নির্লজ্জ ভঙ্গীতে লীলা মন্তব্য করল, তা বৈকি। তুমি তো খুকুসোনা। গাল টিপলে দুধু বেরোয়···যাও, ফাজিল কোথাকার।

অহীন হাসল না। বেরিয়ে গেল। যাবার পথে বলে গেল, দুলি,

চললাম রে। তোর মাসিকে আসতে বলব'খন।

বিকেলে প্রেসে যেতে রমা জানাল, একটা কথা বলছিলাম লীলাদি। মা বলছেন···

সে তো আগেই শুনেছে লীলা। কথা কেড়ে বলল, তাতে কী! তুমি আজ থেকে বাড়িতেই শোবে। ঢুলি নামে মেয়েটা আমার কাছে থাকছে। আর অহীন রয়েছে। বাইরের ঘরটা খালি পড়ে থাকে।

রমা মুখ নামিয়ে বলল, মা জানতে পারলে হয়ত আপত্তি করবেন। বরং

বরং কী? লোক দেবে? লীলা হেসে উঠল। আজ মন যেন কোন কটুতাকেই স্পর্শ করছে না।

কেন, তাতে অসুবিধে কী? আমাদের নতুন দারোয়ান রয়েছে। সে এখানে না শুয়ে ঘণ্টার মত আপনার ওখানেই থাক। সকালে এসে প্রেস খুলবে।

কে, ওই বাহাদুর? তাহলেই হয়েছে। ওর ভোজালি দেখে আমিই ভিরমি খাই। কোত্থেকে কী সব জোটাচ্ছ তুমি। থাক বাবা, ওতে আমার দরকার নেই। এখানে এত সব মেসিনপত্তর রয়েছে—ওকে যে কাজে রাখা হয়েছে সেকাজেই থাক।

লীলা উঠল। রমা একগাদা কাগজ তুলে ধরে বলল, এগুলো সই করুন।

কী ওসব?

খরচপত্তরের ভাউচার।

ও তুমিই সই কর। আমাকে মুখে বুঝিয়ে দেবে, তাহলেই চলবে!

বারে, তা কি হয়? সে তো বেআইনী।

লীলা আপিস ঘরের ভেতরটা দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, দিনে দিনে এত ঝামেলা বাড়িয়েছ কেন, বুঝি না রমা! রোজ একগাদা কাগজে সই করাচ্ছ। যেন সেরেস্তাখানা—বাবার এইরকম সব ব্যাপার ছিল দেখেছি।

রমা খুব ভদ্র কণ্ঠস্বরে বলল, বাবার মেয়ে যখন, আপিস থাকবে,

কাগজে সই করতে হবে।

না করলে ক্ষতি হবে বুঝি?

বাঃ! ইনকাম ট্যাক্সে ধরবে। অডিটফডিট একশো হ্যাঙ্গামা আছে না? প্রেস যে বড় হয়ে গেছে খুব।

লীলা কচি খুকীর মত প্রশ্ন করল, লাভটাভ হচ্ছে তো?

সে এখন কী বুঝবো। বছরের শেষে জানা যাবে। তবে লোকজনের মাইনে তো আপনাকে আর পকেট থেকে দিতে হচ্ছে না আগের মত!

দুজনেই হেসে উঠল এবার। তারপর একরাশ কাগজ আর খাতার পাতায় সই করে লীলার আঙুল যখন ব্যথা করছে, ফেল্টুবাবু হাজির। লীলা নিজের সইগুলো দেখছিল। ইংরেজীতে অন্তত নামটা সই করতে পেরেছে জানলে বাবা কী খুশিই না হতেন। এখন কি ফের লেখাপড়া করা যায় না? অহীন মধ্যে মধ্যে বলে কথাটা। চুপচাপ বসে না থেকে একটা কিছু নিয়ে থাকা ভালো। প্রেস যারা চালাবার ঠিক চালাচ্ছে—মধ্যে মাঝে একটুখানি দেখাশোনা তত্ত্বতল্লাসই যথেষ্ট। অহীন কাছে থাকতে কিছু খোয়াবার ভয় নেই। সুতরাং বছর খানেক খেটে স্কুল ফাইনালটা পাশ করে, তারপর প্রাইভেটে আই-এ বি-এ···

আজকাল নাকি ঘরে ঘরে বৌঝিরা এটা করছে। লীলার বয়স আর কত হয়েছে? চব্বিশ না পঁচিশ? হয়ত পঁচিশই। তার বেশি নয়। তাহলে কি শুরু করবে এখন থেকেই? আজই অহীনকে বলবে কথাটা। কিন্তু অহীন আসবে তো রাতে শুতে? সব ঘরের চাবি-তালা এঁটে বেরিয়েছে একা। একা পথে পা বাড়ালেই পাশটা কেমন খালিখালি লাগে। বড্ড ফাঁকা—বড় একা মনে হয় নিজেকে। অভ্যাস! লীলার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। পাশে ছায়ার মত অহীন ঘোরে। তাই অভ্যেস।

ফেল্টুবাবুকে দেখেও না দেখার ভান করে পাশ কাটাচ্ছিল লীলা। সুযোগ ছিল অভাবিত—কারণ ফেল্টুবাবু অভ্যাসমত চিৎকার করে ওঠে নি—হ্যাল্লো মিস ঘোষ, হ্যাল্লো রমা! সে নিঃশব্দে ঢুকেছিল। কাঠবোর্ড দেওয়া আপিসঘরটা বেশ বড়। কয়েকটা আলমারীও পাওয়া গেছে অল্প দামে। ফেল্টুবাবুর সেগুলো! সব ওপরের ঘরে ছিল। সেখানে

এখন এ বাড়ির ভাড়াটেরা উঠে গেছে। সামনের মাসে ভাড়া পাওয়া যাবে। সর্বসাকুল্যে শতিনেক টাকা। প্রেস লোকসান যাক, ওই একটা নির্দিষ্ট আয় রয়ে গেল। লীলার চলে যাবে কোনরকমে। হয়ত আগের মত পরা হবে না রকমারি নানান রঙের দামি শাড়ি, নানান ডিজাইনের গয়না উঠবে না গায়ে। এখন তো শীতের ঋতু—ঝরানোর পালা। গাছগুলো সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে চারদিকে। নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে ক্রমশ একটার পর একটা। লীলারও তাই।

পথে নামতেই পিছনে ফেল্‌টুবাবুর মুখ ফুটল। মিস ঘোষ চলে যাচ্ছেন নাকি?

ঘুরতে হল লীলাকে। হাসতে হল। হ্যাঁ চলি। অনেকক্ষণ এসেছি। আপনার খবর কী?

খবর নিয়ে আপনাদের কাছে আসি নে, সে তো ভালই জানেন। ফেল্‌টুবাবু সিগ্রেট জ্বেলে ধুঁয়োর রিঙ পাকালেন গুটিকয়।···বসবেন না আর? শীতের সন্ধ্যায় বেশ একটুখানি জাঁকিয়ে আড্ডা দেওয়া যেত। কিছু সুখ-দুঃখের কথা বিনিময় করা যেত। অহীনটার সঙ্গে দেখা হল। গঙ্গার ওদিকে যাচ্ছে দেখলাম। ডাকলাম—বলল, আপনি চলুন, আসছি। যাক গে, আজ আমার মন ভালো নেই ম্যাডাম। তাই ভাবলাম একবার এদিকেই যাই।

রমা সকৌতুকে বলল, কেন তা বলতে পারি। আজ বিস্যুৎবার, তাই না?

তাচ্ছিল্য করে ঠোঁট বেকিয়ে ফেল্‌টুবাবু বলল, তাতে কী হয়েছে! ইচ্ছে থাকলে সবই মেলে।

রমা বলল। তা মেলে। ধেনো কিম্বা দিশী।

তুমি তো সব খবরই রাখো দেখছি। ওসব আমি খাইনে।

আগে খেতেন।

রমাটা বড্ড ইয়ে হয়ে গেছে।

লীলা কথা শুনছিল। অর্থাৎ শোনবার ভান করে কেটে পড়ার ফাঁক খুঁজছিল। ইত্যবসরে সে নিঃশব্দে পা বাড়াতেই ফের ফেল্‌টুবাবু কী

বলতে যাচ্ছিল। সেই সময় রমা লীলার দিকে চোখ টিপে ফেল্টুবাবুকে ডাকল, ফেল্টুদা, শুনুন। জরুরী কথা আছে।

ধেৎ! তুমি আমায় বড্ড হেনস্থা কর।

আহা, শুনুনই না। মনের মেঘ কেটে যাবে দেখবেন।

সেই ফাঁকে বিকশো থামিয়ে লীলা চেপে বসেছে। ভীড়ে মিশে গেছে রিকশোটা। ওয়াটার ট্যাঙ্কের কাছে এসে লীলা রিকশো ছাড়ল। অকুতোভয়ে সোজা গঙ্গার দিকে এগোল। অহীন আছেই কোথাও।

কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে আছে এপার ওপার। কোথাও-কোথাও আলো, তা পাণ্ডুর নয় শুধু, ঘুমন্ত মুখের মত লাগে। পিছনে গাছপালার আড়ালে জ্যোৎস্না। সে-জ্যোৎস্নাও একটা আভাষ মাত্র; আলো নয়। হাড়-কাঁপানো শীত এখানে। সামনে কালো জলের ওপর কুয়াসা দুলছে। দূরে কণ্ঠস্বর কদাচিৎ। কোথাও কোন লোক নেই। অহীন কোথায় আছে খুঁজে বের করার চেষ্টা বৃথা।

তবু যেন জেনে-শুনেই এসে পড়েছিল ওদিকে। বাসের ভেঁপু বাজছে ওপারে। হঠাৎ বুক কেমন করে উঠল—একটা তরঙ্গ উঠল যেন। ছলাৎ করে বাজল কোথায়। একদা ওই বাসের ভেঁপুর শব্দে বাড়ি ফেরার তাগিদ ছিল। শহর থেকে ঘাটের নীচে নামতে গিয়ে রক্তে একটা দোলা লাগত। বাড়ি ফেরার সুখে আপ্লুত হত মন। সবই অভ্যাস! কেমন চমক লেগেছিল হঠাৎ। আগের মত ঘাটের এপারে যেন দাঁড়িয়ে আছে খেয়ার আশায়। ওই বুঝি বাসটা ছেড়ে দিল।

রূপপুরে আর কেউ নেই। কিছু নেই। সেই সব মাঠ বন গাছপালা সে আকাশ—ছেলেবেলায় দেখা বন্যার জলে ফেনার পুঞ্জ, শামুক ফুল, ঝিনুক, তিতির খরগোস, সাপ, বাঘ ঘণ্টা বাসিনী নিয়ে ওদিকে একটা জগৎ রয়ে গেল—লীলা সেখানে যাবে না! গাড়ি চেপে যেতে শুনবে না—কোথাকার মানুষ গো, কোন্ বাড়ি যাওয়া হবে···রূপপুর ঘোষ বাড়ি···অ, নায়েবমশাইদের নোক?···তেনার মেয়ে আছেন সঙ্গে···

ওদিকের আকাশে মোটা একটা তারা। নিষ্প্রভতার মধ্যেও উজ্জ্বল সে। ওদিকে এখন রূপপুরের মাঠে শীতের জ্যোৎস্না পড়েছে। শেয়াল

ডাকছে। হলুদ ধানের ওপর চবচবে শিশির। পৌষ-সংক্রান্তির রাতে ষষ্ঠীতলায় কথক গানের আসর বসেছে।

হঠাৎ ঘৃণায়—অভাবিত ক্রোধে লীলা অস্থির হয়ে উঠেছে। কেন ঘৃণা, কেন ক্রোধ—কার ওপর, স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। অথচ মনে হচ্ছে, লাথি মেরে সরে আসাই ভালো। তার ভালো-মন্দভরা সুখ-দুঃখময় জীবনের গত বাইশটি বছর হাস্যকর আর তুচ্ছ মনে হয়েছে। তুচ্ছ আর অর্থহীন। তাকে বড় ভুলিয়ে রাখা হয়েছিল পৃথিবীর ভালো-ভালো জিনিসগুলো থেকে। বঞ্চনা করা হয়েছিল। আজ তার শোধ নেবে সে।

রিকশো করে বাড়ি এসে তখন মনে পড়েছে, আজ কিছুক্ষণের জন্যে সেই ভূতটার ভয় তার মনের আনাচে-কানাচে কোথাও ছিল না তো, এ বড় আশ্চর্য। আজ ভূতটা দেখলে সে তার গলায় নখ বিঁধিয়ে দিত।

দুলি রান্না সেরে চুপচাপ বসেছিল। কর্ত্রীকে দেখে বলল, অহীনবাবু এসেছিল এইমাত্র। আবার আসবে এখানেই থাকবে।

লীলা ক্ষিপ্তভাবে বলল, বসতে বল নি কেন? বলে গিয়েছিলাম না?

চব্বিশ

রিকশো করে গেলে মন্দ হত না। মাত্র মাইল চারেক পথ। বিশেষ করে খোলামেলা আকাশের নীচে অপর্যাপ্ত রোদ—যা গায়ে নিলে মনটা ছুটির বেহালায় সুর হয়ে বাজে। হ্যাঁ, ছুটির দরকার ছিল। হাঁফ ছাড়তে চাইছিল মন সবরকম কাজ-অকাজের দায়িত্ব থেকে। ব্যবসা-বাণিজ্য ওসব আর যারই ধাতে থাক, আমার নেই। লীলা বলছিল। চলো, কিছুক্ষণ বাঁচতে যাই। কিন্তু রিকশোর সামনে প্রকাণ্ড উত্তরের বাতাস। অনেকটা সময় নেবে। ঠাণ্ডা লাগবেও বেশ।

তাহলে বাস। বাসেই যাওয়া যাক।

ওরে বাবা, দমবন্ধ হয়ে যাবে। যা ভীড় হয় বাসে।

তাহলে ট্যাকসি ভাড়া করতে হয়। সারাদিন ঘোরাঘুরি আর যাতায়াতে পঞ্চাশ-ষাট টাকার বেশি চাইবে না।

লীলা চোখ কপালে তুলেছিল। অত বেশি?

অহীন বলেছিল, বারে! ফুর্তি করতে চলেছেন, টাকা ছাড়া ফুর্তি হয় নাকি?

লীলা একটু হেসেছিল। টাকা দিয়ে অনেক ফুর্তি কিনে দেখলাম। এবার বিনি টাকায় কিছু চাই।

শেষ অব্দি ট্রেনে যাওয়াই স্থির হয়েছিল। মাত্র কয়েক মিনিটের পথ—পরের স্টেশন মুর্শিদাবাদ। অতীত কালের বাংলা-বেহার-উড়িষ্যার রাজধানী। কবর আর ধ্বংসস্তূপ দেখতেই দেশ-দেশান্তরের মানুষ আসে। নেমকহারাম দেউড়ি কবরখানায় ঢুকে এক নেমকহারাম বুড়োর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানে। জাফরাগঞ্জে কোন ছেলেখাকী রাক্ষুসী নবাবনন্দিনীর অন্ধকার গুহায় লুকানো কবরের কাছে, নয়ত যে ঘরের ভিতর শেষ তরুণ নবাবকে তলোয়ারে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল, তার শেষ দেয়ালটি গঙ্গায় ধ্বসে গেছে জেনে, কে বলে ওঠে—না, না। এ অসম্ভব।

শীতকালে টুরিস্টদের বড় ভীড়। রিকশো মেলা কঠিন। ওরা হাঁটছিল।

অনেকদিন পরে লীলা সেজেছে। একেবারে লালে লাল সর্বাঙ্গ। কাঁধে উপচেপড়া একটা থুপিখোঁপায় ফুল গুঁজেছে একরাশ। বুনো ফুল পথের পাশেই ফুটেছিল ঝোপে। কপালে লাল মোটা টিপ। বুকের ওপর লকেটহার। কানে সেকেলে ধাঁচের মোটা ইয়ারিং। ইচ্ছাকৃতভাবে কোমরে ভাঁজ তুলে হাঁটছে—গরবিনীদের মত লাগে। হাঁটতে হাঁটতে পীচের পথে পাথর-কাঠ বা টুকরোটাকরা কিছু দেখলে স্লিপারের ডগায় কিক করছে। রক্তলাল পুলওভারটা কাঁধে ঝোলানো। রোদের তাপ বেড়ে গেছে কিছুটা। কপালে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। চোখে গগলস।

অহীনকে ঈষৎ ভব্য দেখাচ্ছিল। বেশ পরিচ্ছন্ন। তারও চোখে গগলস কাঁধে ব্যাগ। একটা ক্যামেরাও। মোতিঝিলের পথে দু-পাশে বড় বড় অশথ শিরীষ দেবদারুর গাছ। কোথাও ফাঁকা, কোথাও ঘন

ছায়া। ইতিমধ্যে ঝোপঝাড়ের পাশে লীলাকে দাঁড় করিয়ে কয়েকটা ছবিও তোলা হয়ে গেছে।

আরো কিছুটা হেঁটে লীলা হঠাৎ দাঁড়াল। আর কতদূর ?

বেশি দূরে নয়। এসে গেছি। ওই যে জঙ্গল মত দেখছেন···অহীন দেখাল।

কী আছে ওখানে ?

কবর।

কবর দেখবার জন্যে এমনি করে হাঁটাচ্ছ ? অদ্ভুত ছেলে তুমি।

মুর্শিদাবাদে আর কী আছে কবর ছাড়া !

ধুর, ও দেখে কী হবে ?

ঘসেটি বেগমের নাম শোনেন নি ? নবাব সিরাজদ্দৌল্লার মাসি ?

আমি কারুর মাসির নাম জানি না।

এই মরেছে !

অহীন ইতিহাস নিয়ে পড়ল। লীলা কিছুটা শুনছে কিছুটা শুনছে না। ঝোপঝাড় ফুল পাখি কাঠবেড়ালির দিকেই তার মনোযোগ বেশি। মোতিঝিলে পৌঁছনোর আগেই অহীন দেখল, এবার সে শ্রোতা। লীলা গাছপালার গল্প বলছে। এত জঙ্গল চারপাশে, বাঘও আছে বৈকি। একবার একটা বাঘ দেখেছিল লীলা।

সেই ভুল বাঘটা তো ? অনেকবার বলেছেন। অহীন সুযোগমত বাধা দিল। জানেন লীলাদি, একসময় এই জায়গাটা কী ছিল ? বিরাট প্রাসাদ লোকজন সৈন্য-সামন্ত···নবাব সিরাজদ্দৌল্লা মাসির ধনসম্পদ দখল করার জন্যে একদিন হঠাৎ চারদিক থেকে প্রাসাদটা ঘিরে ফেললেন। আর ওই যে দেখছেন ঝিলটা—ওটা ছিল অশ্বখুরাকৃতি !··· কল্পনা করছেন কিছু ?

আমি কল্পনা করতে পারিনে।

চোখ বুজে দেখুন—যা সব বললাম, স্পষ্ট দেখবেন।

আমি কিছু দেখছিনা।

হতাশ হয়ে অহীন বলল, ফিরে গিয়ে আপনাকে ইতিহাস পড়াব।

লীলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।···অহীন কই আমাকে বই দিলে না! পড়াবে বলছিলে—তার কী হল?

পড়বেন? সত্যি সত্যি তো?

চারপাশে লোকজন আছে। তা না হলে লীলা অহীনের হাতটা হাতে নিত। তাকে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ওখানে দরজা-জানালাবিহীন ঘরের মত একটা নিরেট কূপের গায়ে নাকি গোলার আঘাতের চিহ্ন—ভিড় করে সবাই দেখছে। লীলা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, আদিখ্যেতা সব। চল।

অহীন পা বাড়িয়ে বলল, এবার কিন্তু রিকশো করতে হবে।

এবার কোন কবর?

অহীন হাসল। মুর্শিদকুলিখাঁর—কাটরায়।

লীলা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, কবরটবর আমি দেখব না। অন্য কোথাও চল।

তাহলে হাজারদুয়ারী চলুন।

একটু পরেই ওরা হাজারদুয়ারীর প্রাঙ্গণে পৌঁছল। লীলা এতখানি পথ আর কোন কথা বলেনি। হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে কেমন গুম হয়ে রইল। রিকশো থেকে নেমে অহীন উঁচু সিঁড়িতে পা রেখে পিছনে ফিরল। লীলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন স্থানীয় গাইড-গোছের ওকে বোঝাচ্ছে—জানেন ম্যাডাম, এই বাড়িটা ১৮৮৫ সালে নবাব হুমায়ুন জাঁহা তৈরী করিয়েছিলেন। একেবারে ইটালিয়ান স্থাপত্য। এর ভিতর অনেক আজব জিনিস দেখতে পাবেন। একটা আশ্চর্য আয়না···সামনে দাঁড়ালে আপনি পাশের লোকের চেহারা দেখবেন, নিজেরটা নয়। আর একটা থালা রয়েছে। খাবারে বিষ থাকলে তা ফেটে যায়। একটা কামান আছে—তা মানুষখেকো।

লীলা ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিল—সে কিছু দেখবে না।

গাইড নাছোড়বান্দা। তাহলে ইমামবাড়া চলুন। ওই যে—এই যে—বাড়িটা। মুসলমানদের ধর্মগুরু হজরত মোহাম্মদের নাতি ইমাম হোসেনের পায়ের চিহ্ন রয়েছে।

অহীন এসে বাঁচাল।

গঙ্গার ধারে সুন্দর গম্বুজের নীচে গোলাকার চত্বর। নীচে সিঁড়ি গঙ্গার জল অব্দি নেমে গেছে। লীলা ধুপ করে বসে বলল, জায়গাটা মন্দ লাগছে না। তবে বড্ড ভিড়।

অহীন একটু ঝুঁকে বলল, হঠাৎ কী হল আপনার বলুন তো?

কী হবে? কিচ্ছু না। তবে এমন নিস্পৃহ হয়ে পড়লেন কেন? কেমন যেন উদাস-উদাস··· !

নাঃ। আমার খুব ভালো লাগছে তো।

লাগছে না।

তুমি গণক।

হাতটা নিল অহীন। কিছুক্ষণ নিবিষ্টমনে দেখার পর বলল, আপনার মনে একটা ঝড় উঠেছে। তা নিয়ে এত ব্যস্ত যে, বাইরের কোন চমক দাগ কাটছে না। ঠিক বলছি না?

হাত ছাড়িয়ে নিল না লীলা। বলল, ঝড় নয়। ক্ষিদে।

চলুন, কোন হোটেলে যাই।

হোটেলে নোংরা লাগে।

তাহলে রেস্তোর"ায় চলুন। সামান্য কিছু খেয়ে নেওয়া যাবে।

না।

উঠে দাঁড়িয়ে লীলা বলল, ওপারে কী আছে?

ওপারেই ছিল সুবিখ্যাত হিরাঝিল। নবাব সিরাজের সুরম্য প্রাসাদ।

এখন আছে সেটা?

অহীন হেসে ফেলল। কোন চিহ্নই নেই আর। তবে রোশনীবাগে নবাব সুজাউদ্দৌল্লার কবর আছে।

ফের কবর?

কবরে এত আপত্তি কেন? সব কবরই ইতিহাস। ইতিহাসের শেষ কবরে। আপনি-আমি সবারই শেষ।

ওরা হাঁটছিল গঙ্গার ধারে-ধারে। লীলা বলল, ইতিহাস নিয়ে পণ্ডিতী

থামাও তো। নতুন কিছু থাকলে দেখাও।

তবে খোশবাগে চলুন। সিরাজদ্দৌল্লার কবর···অহীন জিভ কেটে বলল, থুড়ি কবর তো দেখবেন না।

এপারে ভীষণ ভিড়। ওপারেই চল। লীলা গম্ভীরমুখে যেন আদেশ করছিল।

সাহানগরের ঘাটে খেয়া পেরিয়ে সামনে গ্রাম। এলাহিগঞ্জ-ডাহাপাড়া। ঘন গাছপালার আমবাগান বাঁশবন আর ক্ষেতভরা সরিষার হলুদ ফুল। মেঠো পথ। ধুলোওড়ানো এলোমেলো বাতাস। অহীন বাঁদিকে ঘুরল। খোশবাগেই যাবে। পথেও টুরিস্টদের ভিড। পথের পাশে একটা ছাতিম গাছের নীচে লীলা দাঁড়াল।

অহীন বলল, কী হল?

বুঝেছি। ফের তুমি কবর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছ।

তাহলে কোথায় যাবেন?

বরং চল না ওই জঙ্গলটার দিকে যাই।

যাঃ! লোকে কী ভাবছে?

মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটা। অহীন অপ্রস্তুত হাসল। লীলা বলল, ওদের ভাবতে দাও না। সে বেশ মজা হবে। চল।

একরকম জোর করে অহীনের হাত ধরে টানতে টানতে লীলা এগোল। চষা ক্ষেতের ওপর আগাছার জঙ্গল ভেঙে ঝোপঝাড় পেরিয়ে বাঁশবনের ভিতর এসে ছাড়ল।

নির্জন। অতি নির্জন চারিধার। সামনে শুকনো মিয়ানো ঘাস-ঢাকা একটুকরো ফাঁকা জমি। অল্প রোদ পড়ে আছে সেখানে। লীলা ধুপ করে বসে ডাকল, এস।

অহীন পা ছড়িয়ে একটু তফাতে বসেছে। একটা ঘাসের কুটো দাঁতে কাটতে কাটতে সে লীলাকে লক্ষ্য করছিল।

বেশ জায়গাটা কিন্তু। লীলা বলল। অনেকদিন এমন জায়গা দেখিনি। এত ভাল লাগছে বলার নয়। তোমার বুঝি খারাপ লাগছে?

অহীন জবাব দিল না।

কথা বলছ না যে!

আপনাকে দেখছি।

কেন?

আমায় ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন।

লীলা খিলখিল করে হেসে উঠল।···যে সব সময় নিজেই ভূতের ভয়ে অস্থির, সে অপরকে ভয় দেখাবে কী!

ভূতের ভয় আপনি কি সত্যি করেন?

করি।

আসল ভূত দেখেননি। ওটা ভুল ভূত—আপনার সেই ভুল বাঘটার মত।···আরে একি, আপনার বুকে শুঁয়াপোকা!

লীলা সেটা দেখে নিয়ে বলল, শুঁয়াপোকাটা এল কোত্থেকে? এই লক্ষীসোনা, ফেলে দাও তো।

আমার সাহস নেই বাবা। আপনিই ঝেড়ে ফেলুন।

এস না। গা শিরশির করছে এবার। লক্ষীটি!

যান। মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া অভ্যেস নেই।

হ্যাঁ, তুমি কচি খোকা।

অহীনকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল। সে হাসবার চেষ্টা করে বলল, এইজন্যেই আপনাকে ভয় করে। আরে, ফেলে দিন ওটা। গলার দিকে যাচ্ছে যে!

তুমি ফেলে দাও এসে।

বাধ্য করছেন?

করছি।

কেন?

কৈফিয়ৎ দিতে বসলে তোমার সেই ইতিহাস হয়ে যাবে। কই, এস।

সন্তর্পণে একটা শুকনো কাঠির সাহায্যে অহীন পোকাটা তুলে ফেলে দিল। জুতোয় পিষে মারল। তারপর বলল, সত্যি লীলাদি, আপনি আন্‌নেসেসারী ভীষণ খাটাতে পারেন। চলুন, এবার ওঠা যাক। ক্ষিদে পেয়েছে।

লীলা হাসতে হাসতে বলল, ওখানে একটা জমিতে মুলো আছে দেখলাম। উপড়ে নিয়ে এসো কয়েকটা।

মুলো খাবো? বাঃ!

খেতে দোষ কী। ক্ষিদে পেলে বনে-জঙ্গলে ওই তো খেতে হয়।

আপনি খান। কই, উঠুন।

তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। চল, কোথায় যাবে। লীলা উঠল। হাসল একটু। চোখে গগল্‌স, কী বুঝি আড়ালে ঝিলিক দিচ্ছিল। অহীনের নিতান্ত অনুমান।

সেই আগাছার ক্ষেত ভেঙে পথে এসে উঠতেই একটা দলের মুখোমুখি হয়েছে ওরা। সামনের লম্বা ফর্সামত ভদ্রলোক অহীনকে প্রশ্ন করলেন, ওদিকে দেখবার কিছু আছে নিশ্চয়ই।

অহীন আমতা-আমতা করছিল। জবাব লীলা দিল, আছে। এক নবাবনন্দিনীর কবর। যান না, ওই তো বাঁশবনের ভিতরে। বেশ কিছুদূর হাঁটলে একটা মাটির ঢিবি দেখবেন।...

পুরো দলটা প্রায় দৌড়ে বনবাদাড় ভাঙতে শুরু করেছে। লীলা হাসিতে ভেঙে পড়ছিল। অহীন বলল, এই মাইরি, আপনি যেন কী! ওরা কী ভাববে বলুন তো! ছিঃ।

লীলা বলল, ওদের সঙ্গে মেয়ে তো নেই। ওদের ভয় পাবার কী আছে। এখন তাড়াতাড়ি চল তো। ট্রেন ধরতে হবে।

এত তাড়াতাড়ি ফিরবেন?

খুব ঘোরা হল। হাত-পা ব্যথা করছে। বাপস্‌, কম হাঁটালে!

খেয়া পেরিয়ে রিকশো চেপে স্টেশনে পৌঁছানোর মুহূর্তে ডাউন ট্রেনটা প্লাটফরম ছেড়েছে। হতাশ হয়ে দুজনে খোলা আকাশের নীচে একটা বেঞ্চে বসল। পুরো তিনটি ঘণ্টা পরে ফের একটা ট্রেন রয়েছে। বাসে বা রিকশোয় যাওয়া যায়। তাহলে ফের পিছু হটে শহরের ভিতর দিকে যেতে হয়। বাসস্ট্যাণ্ড কিছুটা দূরে। অহীন রিকশো খুঁজে এল। এখনই আপ ট্রেন এসে যাচ্ছে। রিকশোওয়ালাদের গরজ নেই। টুরিস্ট বাগানোর তালে ওঁৎ পেতে রয়েছে ওরা। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে

ফিরল সে। বরং বাসস্ট্যাণ্ড অব্দি রিকশো করে যাওয়া যেতে পারে। লীলা মাথা নাড়ল। থাক। চল, ওখানে কিছু খেয়ে নেবে। তিনটে ঘণ্টা গল্প করে কাটিয়ে দেব।

দুজনে উঠে এসে প্লাটফরমের ওপর মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়াল। লীলা বলল, আমি কিন্তু কিচ্ছু খাবো না। মাথা ধরেছে। তুমি যা খাবে খেয়ে নাও।

সে কি! তাহলে আমিও খাবো না।

ছেলেমানুষী করো না। যা বলছি শোন।

আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমি খাব?

লজ্জা করছে?

যান। আপনি না খেলে আমি খাবো না।

ইতিমধ্যে একটা ঠোঙাভরতি মিষ্টি পৌঁছে গেছে হাতে। লীলা বলল, থাক। ওতেই হবে। তারপর একটা মিষ্টি তুলে অহীনের মুখে গুঁজে দিল। চারপাশে ভিড়। অহীনের লজ্জা করছিল। খারাপ লাগছিল। বড্ড বাড়াবাড়ি করছে লীলা। লোকেরা কী ভাবছে কে জানে। অহীনকে ঠিক দেবরের মত দেখাচ্ছে—নাকি দূরসম্পর্কের ভাইয়ের মত! ততক্ষণে লীলা পা বাড়িয়েছে। ওয়েটিং-রুমে গিয়ে একটু গড়িয়ে নিই। দাঁড়াতে পারছি না। মাথা ধরেছে খুব।

খাওয়া শেষ করে পাশের রকমারি ভাণ্ডার থেকে একটা মাথাব্যথা দূর করার ট্যাবলেট কিনে অহীন ওয়েটিং-রুমের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় আপ লালগোলা লোকাল এসে গেছে।

প্ল্যাটফরমটা মুহূর্তে সমুদ্র হয়ে উঠেছে। ভিড় ঠেলে এগোতে গিয়ে ডানদিকে ট্রেনের জানালায় চোখ পড়ে গেল অহীনের।

থার্ড ক্লাশ কামরা। ব্যাপারীগোছের যাত্রীতে ঠাসা। টাকওয়ালা একটা লোক জানালার ধারে বসে রয়েছে। তার গোঁফটা এত বিসদৃশ লম্বা আর ঘন না হলে অহীনের দৃষ্টি যেত না ওদিকে। সে পরক্ষণেই চমকে উঠল। লোকটার ওপাশে মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে—গায়ে খয়েরী শার্ট, উস্কোখুস্কো চুল, হতশ্রী চেহারা সুখেন বসে আছে না?

ধাক্কা মেরে ভিড় ফাঁক করে অহীন কাছে গেল। সুখেনদা!

সুখেনও চমকে উঠেছিল। সোজা হয়ে বসল। তারপর তাড়াতাড়ি হাতে ধরে-রাখা গগলসটা পরে নিয়ে অপ্রতিভ হাসল। অহীন তুমি এখানে?

আপনি···অহীনের গলা কাঁপছিল!···এখানে! কী আশ্চর্য!

ব্যবসাবাণিজ্য করছি ভাই। কলকাতা থেকে ফিরছি।

সর্বনাশ! থাকেন কোথায়! শিবানীর খবর কী?

শ্বশুরমশাইকে বলে দেবে না তো?

যান, কোন মানে হয় না। কী ভাবেন আমাকে!

সুখেন একটু কেসে বলল, এবার পুরোদস্তুর সংসারী হয়ে গেছি ভাই। লালগোলায় আছি। সামান্য কারবার আছে। শিবানী—শিবানী ভালই আছে।

অহীন অন্যমনস্কভাবে বলল, কিসের কারবার? ফের প্রেম নয়ত?

নাঃ। ভ্যারাইটি স্টোর্স গোছের।

কেমন চলছে?

মোটামুটি ভালই। তোমাদের খবর কী?

বেশ ভালই। লীলাদি···

সুখেন লোকটাকে আড়াল করে জানালায় ঝুঁকল। চাপাস্বরে বলল, তোমাকে হঠাৎ পেয়ে ভালই হল। ভাবছিলাম লালুর সঙ্গে যোগাযোগ করে শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে একটা আপোষ করে ফেলব। শিবির ইচ্ছে তাই। ও নিজেই যেতে চেয়েছিল—বারণ করেছি। তুমি লালুকে বলবে লালগোলা আসতে?

অহীন ঘাড় নাড়ল।

তুমিও এসো সুযোগমত। স্টেশনে নেমে 'জলযোগ' নামে একটা খাবারের দোকান দেখবে। ওখানে কিন্তু আমার নাম বললে কেউ চিনবে না। বলবে, সন্তুবাবুর দোকান কোথায়। যাবে তো?

যাবো।

চাকরী পেয়েছ?

না।

আমার ওখানে চলে এসো। বড় কারবারের স্কোপ আছে হাতে। এপার-ওপার পদ্মার জল কেনাবেচা হয়। বুঝেছ?

ট্রেনের হুইসিল শোনা গেল। ট্রেনটা চলতে থাকল। অহীন হাঁটল পাশে পাশে।

ডবল রিডবল লাভ। শুধু একটু রিস্ক মাত্র। বিনিপুঁজির ব্যবসা। কী, আসছ তো?

যাবো।

লালুকে বলো।

বলব।

জনশূন্য প্লাটফরমে একা অহীন দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনটা নেই। দূরের বাঁকে গাছপালার ওপর ঘন কালো ধোঁওয়া দেখা যাচ্ছে। অহীন সেদিকে তাকিয়েছিল। একসময় চমক ভাঙল। লীলা এসে ডেকেছে।

অহীন অদ্ভুত হাসছিল। নিঃশব্দে।

কী ব্যাপার তোমার? এখানে কী করছ?

দাঁড়িয়ে আছি।

কার সঙ্গে কথা বলছিলে দেখলাম। চেনা কেউ?

হ্যাঁ।

বন্ধুবান্ধব?

বলতে পারেন। তবে লোকটা আজকাল বর্ডার এলাকায় চোরা-কারবার করে। অদ্ভুত কারবার সব। পদ্মার এপার-ওপার জল বেচা-কেনার কারবার। আমাকেও দলে টানতে চায়।

যাবে নাকি?

তা মন্দ হয় না। পদ্মার চরে গুলি খেয়ে মরার মত আনন্দ আর কিসে আছে? আজকাল আমরা ভীষণভাবে মরতেই তো চাই।…ওহো, এই যে একটা ট্যাবলেট এনেছি। চলুন, জল এনে দিই।

সেদিন বাড়ি ফিরতে বিকেল গড়িয়ে গেছে। লীলাকে পৌঁছে দিয়ে

অহীন চলে গিয়েছিল। ফিরল অনেক পরে রাত্রের দিকে। এসেই বলল, আজ একটা মজার গল্প শোনাব লীলাদি।

লীলা ওর অপেক্ষা করছিল। ভাগ্যিস আজ ফেল্টুবাবু এদিকে আসে নি। সে বলল, গল্প পরে হবে। আগে খেয়ে নাও।

বাড়িতে খেয়ে এলাম। মায়ের মুখ যা হয়েছে দেখলাম না! উঃ! আপনি আমাকে কাল থেকে রেহাই দিন লীলাদি। বাড়িতে না শুলে আর ম্যানেজ করা কঠিন। দিদিও কেমন পাথর হয়ে যাচ্ছে।

তুলি রান্নাঘরের বারান্দায় চুপচাপ বসে রয়েছে। বড় শান্ত মেয়ে। কথা বলে কম। দৃষ্টিশক্তিও ততটা নেই। তা না হলে দেখত ঘরের ভিতর পর্দার আড়ালে একটা বিসদৃশ ঘটনা ঘটেছে।

বিসদৃশ। কেননা অহীনও একটু অবাক হয়েছিল। লীলা ওর হাত ধরে টেনেছে। তারপর বুকের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অগ্রজারা যেভাবে কনিষ্ঠদের আদর করে, সেইভাবে মুখ একটু তুলে যেন ফিসফিসিয়ে কিছু বলতে চেয়েছে।

তৎক্ষণাৎ জোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে খাটের ওপর ফেলে অহীন ছুটে বেরিয়ে গেল। যেন ভয় পেয়ে পালাল।

পঁচিশ

সেদিন রাত্রে অহীন অমনি করে পালিয়ে গেলে বেশ কিছুক্ষণ দুলে দুলে হেসেছিল লীলা। হাসির উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়েছিল। খাটের একটা কোণা আঁকড়ে হাসি সামলানোর চেষ্টা করছিল সে। যেন অহীনকে জোর জব্দ করা হয়েছে। ছেলেবেলায় কালী-পুজোর সময় মজার কাণ্ডটা মনে পড়ছিল। কালীপুজোয় খুব ধুমধাম হত রূপপুরে। জমিদারের কাছারীবাড়ির লাগোয়া ছিল কালীমন্দির। বিরাট দেউড়ীর পরে উঠোন—চারপাশে বড় বড় থামওয়ালা বারান্দা—সামনে মধ্যখানে মন্দির। চারপাশেই সিঁড়ির ধাপ। হাড়িকাঠটা ছিল উঠোনের মধ্যে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জমিদার—রক্ষণাবেক্ষণ করতেন লীলার বাবা প্রাণকান্ত

নায়েবমশাই। অবশ্য সে-বাবদে যথারীতি একটা দেবোত্তর সম্পত্তি তো ছিলই—সেটা নামে সেবাইত একজন থাকা সত্ত্বেও আসলে ভোগ করতেন প্রাণকান্ত! রঘু পণ্ডিতের মাসতুতো দাদা আদিনাথ পুজোআচ্চা করত মাত্র—পেত হাততোলা মত। নায়েবমশাই যা দয়া করে দিচ্ছেন তাই যথেষ্ট। আসলে লোকটা ছিল আত্মভোলা সদাশিব গোছের। সব সময় কারণে বুঁদ থাকলে মেজাজ অমনি দিল-দরিয়া হয় হয়ত। কালী-পুজোর রাত্রে রূপপুরে প্রায় সবাই মাতাল—তা কুমুদিনীর যতই ঘেন্না থাক না কেন মাতালের ওপর। এমনকি স্বয়ং প্রাণকান্তও দু-এক চুমুক খেয়ে ফেলতেন। সে রাত্রে তো সব মদই কারণ; নেশা নয়। তিনি অবশ্য বাড়ি ফিরতেন সেই ভোর বেলা। ভিড়ের মধ্যে স্বামীকে লক্ষ্য করার সুযোগ কুমুদিনীর থাকলে তো!

এগুলো অবশ্য লীলার শোনা কথা। তা সেবার কালীপুজোর রাত্রে সবাই যখন বদ্ধ মাতাল, চত্বর থেকে জমিদারের পাঁঠাটা কোন্ ফাঁকে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে। প্রায় শতখানেক বলি হয়। প্রথমে ওই পাঁঠাটা বলি না হলে তাদের সময় আসে না। দিব্যি সব স্নান করিয়ে সিঁদুর ইত্যাদি যথাবিহিত ব্যবস্থা সেরে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এখন বলির লগ্ন সমাগত। জমিদারের পাঁঠা নেই। পাগলের মত সব খুঁজছে। সবাই চেঁচাচ্ছে!—শিগগির 'ফাস্ট বয়'কে খুঁজে বের কর। আদিনাথের খুব পড়েছিল পেটে। সবাই যখন খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত, সে হতাশ হয়ে থামের পাশে বসে পড়েছে। তারপর প্রায় মূর্চ্ছাহত কিংবা নেশার ঘোরে নিঃসাড় হয়ে আছে। মাতালের কাণ্ড। সেই সময় কে চেঁচিয়ে উঠেছে—পেয়েছি, পেয়েছি, এই তো ব্যাটাচ্ছেলে ফাস্ট বয়!

ধূলিধূসরিত অর্ধোলঙ্গ আদিনাথকে হাড়িকাঠে টেনে তার মুণ্ডুটা গলিয়ে দিতে সবাই ব্যস্ত। কে শোনে কার কথা! রামু কামার খাঁড়া তুলে তৈরি। রাধু বায়েন দলবল নিয়ে কেশরফোলানো সিংহের মত ঢাকগুলো তুলে দাঁড়িয়ে গেছে। অবিশ্রান্ত জয় মা জয় মা চিৎকারে পুজোমণ্ডপ ফেটে পড়ছে। এদিকে আদিনাথের নেশা গেছে ছুটে। সে প্রচণ্ড কেঁদে বলছে, ওরে আমি রে, আমি···আমি!

লীলা বারান্দায় থামের পাশে দাঁড়িয়ে যা-যা দেখছিল, অবিকল মনে পড়ে। হয়ত ওটা স্রেফ রসিকতা, হয়ত মাতালদের তুখোড় মাতলামি। তার কিন্তু ভীষণ ভয় লেগেছিল। সত্যি সত্যি বলি দিয়ে দেবে না তো!

দিল কই? ছাড়া পেয়েই আর আদিনাথের পাত্তা নেই। অমাবস্যার রাত্রে তখন তাকে খুঁজে বের করা সমস্যা। শেষ অবধি পাঁঠাটা পাওয়া গিয়েছিল কিনা মনে নেই, কিন্তু আদিনাথের পালিয়ে যাওযার দৃশ্যটা স্পষ্ট চোখে ভাসে।··

ঠিক সেই রকম একটা হাস্যকর কাণ্ড ঘটে গেছে। তাছাড়া আর কী বলা যায়! লীলার হাসি শুনে তুলি এসে উঁকি দিচ্ছিল পরদার ফাঁকে। তখন লীলা তাকে ওই গল্পটা শুনিয়েছিল। তবে অহীনের কথা কিছু বলেনি।··হঠাৎ ঘটনাটা মনে পড়ল, বুঝলি তুলি। লীলা বলেছিল।··· পুরুষমানুষগুলো ভীষণ বোকা হয়। ওদের জব্দ করা কী সোজা রে।

তুলি মন্তব্য করেছিল, শুধু বোকা নয়, বদমাসও।···তা খাবেন না? সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

হাসি থামিয়ে গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ জানালার বাইরে কিছু দেখবার চেষ্টা করার পর লীলা বলেছিল, নাঃ খিদে নেই। তুই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড।

সে কি! তিন জনের রান্না আছে।

যা পারবি খা, সকালে ভিখিরী ডেকে দিয়ে দিস্।

তুলি অবাক হয়ে চলে গেলে লীলা তখন চমকে উঠে ভেবেছিল, অহীনকে জব্দ করতে গিয়ে নিজেই জব্দ হয়ে গেল না তো? আসলে অহীনকে সত্যি সত্যি চুমু খেত না, কোন অসভ্যতা করার ইচ্ছেও ছিল না —ওটা একরকম ভঙ্গী। একটা কৌতুকপ্রদ ভান। নিতান্ত তামাসা। অহীন কি এটা অপমান বলে ধরে নিল? ওর যা বয়স, তাতে এই ধরনের ছেলেমানুষী ভাবপ্রবণতা হযত খুব স্বাভাবিক। এখন একটু সখী-সখীভাব ছেলেদের থাকে—লীলা দেখেছে। কিন্তু অহীন···

চকিতে লীলার মনে পড়েছিল, অহীন তত অবোধ সরল ছেলেমানুষ নয়। সুখেনদের মত আড্ডায় মিশেছে। শিবানীকে নিয়েও কাটিয়েছে।

এ-অভিজ্ঞতার পরিধি তার বয়সের চেয়ে বড়।

লীলার এই খেলা-করা ভঙ্গীটি মোটেই শোভন হয়নি। বেড়াতে গিয়ে যা সব করছিল, পরে নিজের কাছেই খারাপ লেগেছে। কেন সে ওকে নিয়ে নিতান্ত খেলায় মেতে উঠতে চেয়েছে? সে তো ভালভাবে জানে, অহীনকে ভালবাসার বা তাকে নিয়ে অন্য ধরনের কোন আশা-স্বপ্নের ন্যূনতম অংশও দানা বাঁধেনি মনে। নিতান্ত একটু সাহচর্য মাত্র—একা-হয়ে পড়া জীবনের বাইরের দিকটায় কেবল খুশির হাওয়া বইয়ে রাখবার ইচ্ছে মাত্র। মনের কথা খুলে বলার মত সঙ্গী একজন তো চাই।

রমাকে তাই ভেবেছিল—দেখেছে রমা তা নয়। ও অন্য ধাতুর মেয়ে। পাড়ার ব্রততীরা আছে। তারা সব অল্পবয়সী, তার ওপর লেখাপড়া শিখছে স্কুল-কলেজে, সংসারের তাপ কী টের পায়নি—তাদের সঙ্গে আর যাই হোক, এ-একাকীত্ব ঘোচাবার মত উপকরণ মেলা দায়। তাই অহীনকে সে কাছে টানতে চাইছিল। তার আচরণে কিছু সরলতা আর আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করে সে মুগ্ধ হয়েছিল।

কিন্তু তারপর থেকে দিনরাত্রি আর যেন কাটছে না লীলার।

দিনে প্রেসে গিয়ে খবরদারী করবার চেষ্টা করে, অথচ একসময় ভয়ানক ক্লান্তিকর আর অর্থহীন মনে হয় সবকিছু। তালগোল পাকিয়ে যায় চিন্তাভাবনা। ওদিকে রমা যা কয়ে তুলেছে, লীলার পক্ষে আয়ত্তের বাইরে—কয়েকটি মাসেই রমা একটা জটিল বিচিত্র আর যেন বা দুর্জ্ঞেয় পরিমণ্ডল তৈরি করে ফেলেছে। তার মধ্যিখানে গুটিপোকার অদৃশ্য পোকাটির মত রমার অবস্থিতি। ওর ভাষা বোঝাও কঠিন লীলার পক্ষে।

এক ফাঁকে খগেন এসে চুপি চুপি বলে যায়, এবার একটু নিজের চোখে দেখাশোনা করুন মা। এতবড় এস্টাটপত্তর করে ফেলেছেন, আর অবহেলা করবেন না। আমার কাছে ব্যাপারটা খুব সুবিধে মনে হচ্ছে না। অপরের হাতে ছেড়ে দেওয়া কি ভালো হচ্ছে?

লীলা অন্যমনস্ক চোখ তুলে তাকায় মাত্র।

খগেন বলে, অনবরত লোক রাখা হচ্ছে। কাজ যা, তাতে ফাঁকি না দিলে এর অর্ধেক লোকেই চলে যায়। তার ওপর ওই ফেল্টুবাবু···

কী করেছে ফেল্টুবাবু ?

চারপাশটা দেখে নিয়ে ফিসফিস করে খগেন, ফেল্টুবাবু সবসময় এখানে এসে আড্ডা দেন। বেশ তো বুঝি—এক সময় তাঁরই ছিল এই বাড়িটা, আসছে আসুক—কিন্তু মা, আমরা আপনার কর্মচারী। তাঁর ধমক খাব কেন বলুন তো ? যেন তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি। এসেই এখানে-ওখানে তম্বী খবরদারী…হ্যাঁ মা, ওনার সঙ্গে নাকি রমাদির বিয়ে হচ্ছে, কানাই বলছিল ?

লীলা রমাকে ডাকতে গেলে খগেন জোড়হাত করে বলে, রক্ষে করুন মা। চেপে যান। কানাই হয়ত তামাসা করে। ও আবার একটা মানুষ ? তবে খাটে ভীষণ। ওই দেখুন না, দাড়ি কাটবারও সময় পায় না। হি হি হি…হাসতে হাসতে খগেন কেটে পড়ে পার্টিশানের ওদিকে।

ক'দিন পরে রমা এক সকালে লীলার বাড়ি এল। অনেকদিন পরেই বলতে হয়। রাত্রে বাড়িতে থাকার জন্যে বাহাদুরকে লীলাই ডেকেছিল। অহীন সম্পর্কে রমা কোন প্রশ্ন আর তোলেনি, লীলাও কিছু বলেনি। বাহাদুর সেই থেকে রাত্তির ন'টার পর গিয়ে ভোর অব্দি বাইরের ঘরে শুয়ে থাকে। তারপর প্রেসে চলে আসে। দুটো বেলা খাওয়াটা লীলার ওখানে চুকে যায়।

রমা এসে চিন্তিতমুখে বলেছিল, খুব জরুরী ব্যাপারে আসতে হল দিদি। ভেবেছিলাম এ মাসের মাইনেপত্তর কালেকশান থেকেই মিটে যাবে। হল না। গভর্নমেণ্টের টাকা পেতে সেই মার্চের শেষ সপ্তা—এদিকে ওদের মাইনের দিন এসে গেল। অবশ্যি খুব বেশি লাগবে না। অ্যাডভান্স দেওয়া আছে অনেক। প্রতি সপ্তায় প্রত্যেকেই কিছু না-কিছু নেয় তো।

লীলা বলল, কত টাকা ?

শ'-পাঁচেক হলেই চলবে।

এত বেশি !

রমা একটু হাসল।…বাজারের অবস্থা তো দেখছেন। মাইনের হার আগের চেয়ে বাড়িয়ে দিতে হয়েছে। তা না হলে লোক পেতাম না।

রমা একসময় প্রতিশ্রুতি আদায় করে উঠল। লীলা দরজা অব্দি এগিয়ে দিতে গিয়ে বলল, প্রেস-ট্রেস মেয়েদের কর্ম নয়। একজন পুরুষ-মানুষ থাকলে ভালো হত। কদ্দিন এমন ঘরের খেয়ে মোষ তাড়াব?

লীলা হাসতে-হাসতে বলছিল কথাটা। রমা কিন্তু হাসল না। গম্ভীর মুখে বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। অহীনকে পেলে ভাল হত। ওর পাত্তা নেই। দিনে কোথায় ঘোরে, ফেরে অনেকটা রাত্তিরে। কথা বলতে ইচ্ছে করে না আমার।

লীলাও গম্ভীর হল।···অহীন কিন্তু এখানেও আসে না আর।

জানি।

কে বলল তোমাকে?

শুনেছি। বলে রমা চেপে গেল। অহীন নিজেই রমার কাছে বলে এসেছিল, তোর বস সত্যি একটা ইয়ে। খবর্দার, ওর ধারেকাছে যেতে বলবিনে আমাকে।

কী হয়েছে ওর? লীলা প্রশ্ন করল।

কে জানে। বরং একটা কথা ভাবছিলাম দিদি।

বলো।

ফেলুটুবাবু মাতাল হলেও লোকটা সৎ। শিক্ষাদীক্ষা মন্দ নেই। তাছাড়া এখানে ওঁর একটা মানসম্মানও যথেষ্ট রয়েছে। ওঁকে যদি বলি···

মাইনে দিতে হবে তো?

রমা এবার হাসল।···আপাতত ওঁর টাকার অভাব নেই, সে তো বুঝতেই পারছেন। ও আমি ম্যানেজ করে নেব।

যা ভালো বোঝো কর। বলে লীলা হাসি চেপে সরে এল। ঘরে ঢুকে সোফায় অর্ধশায়িতভাবে কিছুক্ষণ জানালার বাইরে চেয়ে থাকল।

কোন যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছিল না সে। লীলা প্রেস। ব্যাপারটা কী? আর ওই রমা—যে ক্রমশ মুটিয়ে যাচ্ছে, ওই খগেন—যে সবসময় সন্দেহপ্রবণ, কানাই—যাকে দেখলে মনে হয় রাণীচকের সেই লোকটার মত কী ষড়যন্ত্রের অন্ধকারে কোথাও সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলেছে চুপিচুপি। ফেলুটুবাবুর সঙ্গে রমার একটু ঢলাঢলি চলেছে সম্ভবত। বড্ড হাসির

ব্যাপার এটা, আর···আর, এখানে খৃষ্টান গোরস্থানের পাশে একটা নির্জন নিঃঝুম বাড়িতে রূপপুরের ঘোষ-বংশের একমাত্র সলতে জ্বলছে। ওপাশে ওই আগাছাভরা সজীক্ষেত, অনাদরে ফুটে ওঠা হরেক ফুল······ ফ্যাসানেবল আসবাবে ভরা ঘরটাও কখন হাতের নাগাল থেকে দূরে পালিয়েছে। তুমি কোথায় আছ লীলা? কবরখানার দীর্ঘ শিমূলে থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। দেবদারুর ঘন বুনোটে মেশামেশি এখন ছত্রখান। পাতাঝরা নিঃসঙ্গতার দিন—এই সব দিন ক্রমাগত একা আর আলাদা করে ফেলে প্রত্যেককে।

চৈত্র এসে গেল। সামনে ময়দানের ওপর মাপজোক চলেছে। আস্তে আস্তে সব ফাঁকা জায়গা ভরাট হয়ে উঠেছে ঘরবাড়িতে। বিকেলে হঠাৎ প্রেস থেকে চলে এসে লীলা স্টেশনের দিকে কিছুক্ষণ একা হেঁটে যায়। ফিরে আসে। হঠাৎ কোন পাগল দেখলে সেই মুহূর্তে দ্রুত সরে আসে সেখান থেকে। বুকের ভিতরে হাতুড়ি পাড়ে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে কতক্ষণ ধরে নিজেকে দেখে লীলা। চেহারার জেল্লা কমে যাচ্ছে নাকি! চোখের নীচে কালচে ছোপ। গালের ওপরটা খসখসে। বয়সের ছাপ নয় তো? কপালে যেন সন্তর্পণ ছুটি-একটি রেখার আভাষ। চিবুকের আশ্চর্য তিলটা এত মোটা ছিল না তো! গলার খাঁজে রক্ত জমেছে কি? লীলা, তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ? খাটপালঙ্ক আসবাব ঘোরে টালমাটাল। বাইরে চৈত্রের রুক্ষ পৃথিবী দোলে। লীলা ছুটে বেরিয়ে যায়। ডাকে, ছুলি, ওরে ছুলি?

ছুলি সাড়া দেয়। বলুন দিদি।

ব্যস। আর মনে নেই, কেন ডাকছিল। লীলা বলে, থাক্। কিছু না। রাত্রে কী রান্না করবি?

যা বলবেন।

আমার জন্যে কিছু করিসনে। তুই যা খাবি, খাস।

সে কি! উপোস থাকবেন? শরীর খারাপ করছে?

হ্যাঁ।

ছুলি উঠে এসে বলে, একটা কথা বলছিলাম দিদি। আপনি ডাক্তার

দেখান।

কেন রে?

খুব রোগা হয়ে যাচ্ছেন।

লীলা হাসে।···ও আমার সাধের রোগ। পুষেছি।

না দিদি। আপনার রঙ কালো হয়ে যাচ্ছে।

লীলার বুক ছাঁৎ করে ওঠে। কালো হয়ে যাচ্ছে? আয়নায় ফেব নিজেকে দেখে। ব্যস্ত হবার চেষ্টা করে। কিন্তু কাঁটার মত বিঁধে থাকে গুরুতর একটা ভয়। কোন অসুখ হচ্ছে না তো ভিতরে-ভিতরে?

কথাটা একদিন রমাও বলল। ফেলটুবাবু সামনে ছিল। বাড়াবাড়ি ছাড়া তার কথা নেই। অনেকগুণ ফেনিয়ে সে লীলার চেহারার সর্বনাশটা মনে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করল স্বভাবত।

তবু কয়েকটা দিন কেটে গেল মনস্থির করতে। অসুখ—কিছু যেন একটা হয়েছে। অনিদ্রা, মাথাঘোরা, অহেতুক উৎকণ্ঠা, সর্বক্ষণ গা-ছমছম, দুর্বলতা, আহারে অনিচ্ছা···কত কী।

সেই সময় একদিন তুলি জানাল, আপনি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে একটা লোক এসেছিল আপনার খোঁজে। বলল, প্রেসে গিয়ে দেখা করব তাহলে। যায়নি?

কে লোক, কেমন চেহারা?'

মোটাসোটা গোলগাল, বুড়োমত, বড় বড় গোঁফ আছে?

নাম বলেনি?

কী যেন বলছিল, মনে পড়ছে না।

পাগল-টাগল নয়ত?

না, না। পাগল কেন হবে? বলল, ওখানে একটা কী দোকান আছে··হ্যাঁ, চায়ের দোকান। বলল, চায়ের দোকানের সেই ইয়ে... 'তুলি ভুরু কুঁচকে অপ্রস্তুত হাসল।...নামটা পেটে আসছে। মুখে আসছে না।

লীলা চমকে উঠে বলল, জগদীশ নয়তো?

তুলি হাততালি দিল।···হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই নাম।

জগদীশ! জগদীশ কেন তার কাছে এসেছিল? লীলার মন তোলপাড় হচ্ছিল। জগদীশের কথা উঠলেই অনিবার্যভাবে সুখেনের কথা এসে পড়ে। তাহলে কি সুখেন···দাঁতে ঠোঁট কামড়াল লীলা। রাগে ক্ষোভে অস্থির হয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ খাটে শুয়ে রইল। সুখেনের প্রসঙ্গ নিয়ে কেউ এলে সোজা বাহাদুরকে লেলিয়ে দেবে। নয়ত নিজেই ওর ভোজালিটা তুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর।

কিন্তু আকাশপাতাল ভেবে আর সারারাত্তির নানারকম স্বপ্ন দেখে সকালে শয্যাত্যাগ করেই লীলা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়েছে।

রিকশো না করে হেঁটে কালেক্টারীর কাছে চলে এসেছিল সে। অনেকগুলো চায়ের দোকান রয়েছে। কোনটা জগদীশের কে জানে! কাকেও জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করে।

তার আগে জগদীশ তাকে দেখতে পেয়েছে। এই যে ম্যাডাম, আসুন, আসুন। কী সৌভাগ্য! দয়া করে নিজেই পায়ের ধুলো দিলেন। জগদীশ সাবনয়ে দাঁত বের করল।

লীলা বলল, কাল আমার খোঁজ করছিলেন শুনলাম। কেন?

বলব বৈকি। তবে এখানে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে তো সব কথা বলা যায় না দিদি। দয়া করে আমার ওখানে চলুন।

দোকানে আমি যাব না। যা বলবার এখানেই বলুন।

জগদীশ পা বাড়িয়ে বলল, তাহলে চলুন, বলতে বলতে যাই। প্রেসের দিকে যাবেন তো?

না। বাড়ি ফিরব।

তবে ওদিকেই চলুন।

জগদীশের আচরণ বা ভঙ্গীতে কী ছিল—লীলার সেদিনের মত অসভ্য লাগল না লোকটাকে। বরং হিসেবী আর ঘোর বিষয়ী লোকের মত মনে হচ্ছিল। এত ঝুঁকে হাঁটছিল সে। পরণে হাঁটু অব্দি গুটোনো ধুতি, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, পায়ে সস্তা দামের চপ্পল।

ট্রেজারী এলাকা পেরিয়ে ইরিগেশন বাংলোর কাছে এসে জগদীশ দাঁড়াল। পিছনে লালদিঘি। এক টুকরো ঘাসের মাঠ। বড় একটা

শিরীষ গাছের নীচে গুটিকয় লরী আর বাস দাঁড় করানো। কালিঝুলিমাখা কয়েকটি লোক বালতি করে জল এনে গাড়িগুলো ধুচ্ছে। ওপাশে একটা নতুন বাড়ি—তার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে লীলাকেই যেন লক্ষ্য করছে। লীলা বলল, বলুন।

একটা ঘূর্ণিহাওয়া একরাশ শুকনো-পাতা ঘাসের কুটো নিয়ে ওদের পেরিয়ে গেল। লীলা গগলসের ওপরই দু হাতে মুখ ঢেকে একবার ঘুরল। ঘূর্ণিটা সরে গেলে বলল, কী, বলুন!

জগদীশ গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, বলি। কথাটা খুব প্রাইভেট। আপনার আমার মধ্যেই থাকবে। বুঝলেন?

লীলা বলল, কথাটা আগে বলুন।

আচ্ছা দিদি,······বলেই ঘ্যাঁচ করে জিভ কেটে জগদীশ একটু হেসে নিল। আপনি আমার মেয়ের বয়সী। দিদি বলা ঠিক হচ্ছে না। যত গুণ্ডাবদমায়েস হইনে কেন, ঘরসংসার ছেলেমেয়ে তো একদিন ছিল আমার। আজ না হয় এমন ইয়ে হয়ে গেছি...আপনি যাই ভাবুন আমাকে। একটা মেয়ে ছিল। আমার দোষেই তার হয়ত অনেক সর্বনাশ ঘটেছে। তবে সম্প্রতি...জগদীশ একটু থামল।

লীলা স্থিরদৃষ্টে তাকাল।

আচ্ছা মামণি, একটা খবর জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে। সুখেনের সব হাল-হদিস তো আপনি জানেন। তার······

লীলা বাধা দিয়ে বলল, জানি না। কেন?

দেখুন, যে যেমন লোক, তার তেমন আত্মীয়কুটুম্ব হয় সংসারে। যে গাছের বাকল, সে গাছেই মানায় ভালো। সুখেনের সঙ্গে আপনার মিলবে কেন? ও আমি বেশ বুঝি। ও হারামজাদাকে জব্দ করতে হলে আমাদের মত মানুষ চাই।

লীলা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। বলল, কাকেও জব্দ করার কথা আমি ভাবিনি।

জগদীশ জিভ কাটল ফের। না, না, তা বলছিনে। আপনার কাছে শুধু একটা কথা জানতে চাচ্ছি। সত্যি বলবেন? আমিও তো আপনার

মত একটা মেয়ের বাবা। বলবেন তো?

বলুন।

আচ্ছা, সুখেনের কি এখনও বৌ রয়েছে একটা—কলকাতায় থাকে নাকি?

এবার লীলা হেসে ফেলল।…তাই বলুন। কেন জানতে চাচ্ছেন?

জগদীশ হঠাৎ ফোঁস করে নাক ঝাড়ল। মুখটা ফিরিয়ে নিল অন্য পাশে। স্পষ্টত সে অশ্রু সম্বরণ করছিল। লীলা ভাবল, আদিখ্যেতা মন্দ না।

জগদীশ ধরা গলায় বলল, আমি শালা একটা পাপীতাপী মাতাল লোক। একদিন আপনাকে যা তা বলেছিলাম মনের দুঃখে—মাপ করবেন। বুঝতেই তো পারছেন, খামাকা এতসব চোরামাল আমার ঘাড়ে চাপিয়ে হয়রাণি করা। মেজাজ ঠিক ছিল না।

লীলা হাল্কা মেজাজে বলল, না, না। আমি কিছু মনে করিনি তাতে। আপনার আড্ডার লোকেরাই তো এসব করেছিল।

সে কি আর বুঝিনি! ওই সুখোটা যদি অত বুদ্ধু না হবে তো…

লীলা কথা কাড়ল।—যাক্ গে। সুখেনবাবুর খোঁজ পাননি?

পেয়েছি। লালগোলায় আছে। লালু গিয়েছিল। জগদীশ নির্দ্বিধায় জানাল ..অহীনই খবর দিয়েছিল লালুকে। অহীন ছেলেটা আর যাই হোক শিক্ষিত তো বটে। শিবি আর তার বরকে আজ সে নিজেই আনতে গেছে। তাই কাল আপনার খোঁজ করছিলাম ওই কথাটা জানাবার জন্যে। আজকাল সব আইন বড় গোলমেলে তো। একটা ছাড়া দুটো থাকবার উপায় নেই।

চৈত্রের সকালটা আস্তে আস্তে ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। লীলার চারপাশে শুধু ছায়াছায়া সব দৃশ্য। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সে শুধু বলল, অহীন? ও।

জগদীশ ঘড় ঘড় করে কাসল অথবা হাসল। হ্যাঁ, ভাগ্যিস ওর সঙ্গে মুর্শিদাবাদ স্টেশনে দেখা হয়েছিল সুখেনের। অহীন বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল ওখানে। ফেরার পথে দেখা হয়ে যায়। ঈশ্বরের

কৃপা। আমি তো কম খুঁজিনি মামণি, একমাত্র মেয়ে। কী কষ্টে এতটুকুটি কোলে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম বর্ডার পেরিয়ে। সে কি আজকের কথা? মাথেকো মেয়ে বলেই অতটা প্রশ্রয় দিতাম। তবে এবার সব ঠিক করে ফেলেছি। আমিও জামাইয়ের ওখানে গিয়ে থাকব। শহরটা আর ভাল লাগছে না। এদিকে বয়সও হয়েছে। একটু বিশ্রাম দরকার।

লীলা দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়েছিল। আশা-প্রত্যাশার জ্বলন্ত একটা শরীর তার সামনে যেন ছটা বিকীরণ করছে। পা বাড়ানোর মুহূর্তে সে বলল, সুখেনের একটা বৌ আছে কনক নামে। সে কলকাতায় থাকে। আর···

জগদীশ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, আর কী মা?

বলতে গিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল লীলা। পেটে হাত চাপা দিয়ে একটু ঘুরল হঠাৎ। বলতে চেয়েছিল অহীনের কীর্তি। সে রাতে চোরামালগুলো বস্তা জগদীশের দোকানের সামনে ফেলেছিল—সেটা অহীনেরই পরামর্শে। আর সেই অহীন জগদীশের মেয়েজামাই আনতে গেছে লালগোলা!

জগদীশ অবাক হয়ে বলল, হাসছেন মামণি?

হাসছি। বলে উল্টোদিকে লীলা পা বাড়াল।

জগদীশ অসহায়ের মত শেষ চেষ্টা করল।··কথাটা বললেন না মা? আর···আর কী?

কোন জবাব না দিয়ে হাঁটছিল লীলা। শিরীষ গাছের তলায় হতভম্ব জগদীশ দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপচাপ। সে দেখল, বাড়ির দিকে না গিয়ে মামণি অন্য কোথাও চলেছে হঠাৎ। তারপর ট্রেজারীর কাছে চৌমাথার একটা খালি রিকশো দাঁড় করিয়ে চেপে বসেছে তাতে। রিকশোটা ঝড়ের বেগে ছুটেছে।

জগদীশ শিউরে উঠে ভাবল, অহীনরা ফিরে আসবার আগে তাকে লালগোলা পৌঁছতে হবে। উদ্যোগ আয়োজন যা কিছু করার, সেখানেই হোক্। জামাইবাবাজীর প্রথম পক্ষ আবার হুট করে এসে সব সাধে না

বাদ সেধে বসে।

বাহাদুর ভোরবেলা বেরিয়ে এসে প্রেসের আশেপাশে আড্ডা দেয়। এই সাতসকালে কর্ত্রীকে দেখে সে চমকে উঠেছিল। দৌড়ে এসে প্রেসের দরজা খুলে দিল। তারপর বিনীতভাবে একপাশে সরে দাঁড়াল।

লীলা পা বাড়াতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ। জগদীশের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তখন এই প্রেসটা তার কাছে তীর্থের মত পবিত্র মনে হচ্ছিল যেন। সূর্য উঠে যেমন একটা দিগন্তকে অন্ধকার থেকে আলোয় স্পষ্ট করে তোলে, তেমনি স্পষ্ট আর উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল লীলা প্রেস। ঝড়ে ছেঁড়া পাতার মত উড়ে এসে লুটিয়ে পড়তে চাইছিল এখানে। এটি ছাড়া আর সান্ত্বনার ঠাঁই হয়ত কোথাও নেই।

অথচ বড় বড় উঁচু দরজা দুটো বিকট শব্দে খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছে, সামনে এই মাত্র একটা অতিকায় রাক্ষস মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়েছে! ভিতরে আবছা অন্ধকারে কালো কালো কী সব অন্ত্র নাড়িভুঁড়ি পাকস্থলী হৃদপিণ্ড ফুসফুস—অজস্র কলকব্জা ওঁৎ পেতে রয়েছে যেন সুস্বাদু খাদ্যের অপেক্ষায়। জীবনকে চিবিয়ে খেয়ে জীবনীতে পরিণত করতে চায় সে।

এতদিন পরে এই প্রথম লীলা নিজের জন্য দুঃখ পেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর একটা শূন্য ভিজে কাগজ যেমন করে মুদ্রিত হতে যায় —তেমনি করে সে এগিয়ে গেল। নিজের চেয়ারে বসল। বলল, বাহাদুর, জানলাগুলো খুলে দাও।

মুদ্রিত হরফের মত স্তব্ধ আর ধূসর দেখাচ্ছিল লীলাকে।

রূপপুরের কথা ভাবছিল লীলা।

রূপপুরের মাঠে একটা অদ্ভুত গাছ আছে। গাছটার আসল নাম কেউ জানে না। মাটিতে কাণ্ডের কিছু অংশ যেন জোর করে কে পুঁতে দিয়েছিল —হেলান দিয়ে বেশ কিছুটা ঝুঁকে আছে মাটির দিকে। খড়ি-খড়ি ধূসর কাণ্ডের চারপাশে বাঁকাচোরা অজস্র ডালপালা—কচিৎ অল্প কিছু পাতা গজায়—পাতাগুলোও বড় শ্রীহীন, ঝাঁঝরা আর খসখসে—রুক্ষ।

তার জন্যে ঈশ্বর যেন কোন ঋতু দেননি। তার বর্ষা নেই, বসন্ত নেই। হয়ত কবে পৃথিবী চিরতুহিন অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল সে। রূপপুরের সব বুড়োমানুষই বলে, ছেলেবেলায় তারা গাছটাকে এমনি দেখেছে—তখনকার আরো সব বুড়োমানুষও ছেলেবেলায় এমনি দেখেছিল। কবে কতদিন আগে নাকি এক ভয়াবহ বন্যা এসেছিল। কোথা হতে উন্মূল করে ভাসিয়ে এনেছিল তাকে। তারপর থেকে এখানে আটকে রয়েছে। নাম জানে না, জ্ঞাতিগোত্র চেনে না—তাই লোকে ডাকে, অচিন গাছ। জটিল ডালপালায় তার অজস্র পাখির বাসা। শামুক খোল কাক বক শালিখ। খোঁদলে ডিম পাড়ে টিয়া চন্দনা কাঠঠোকরা আর ট্যাসকোনা। আর থাকে সাপ। ঢ্যামনা গোখরো চিতি। গাছটার সারা গা পাখির বিষ্ঠায় চিত্রবিচিত্র। এমনি চৈত্র শেষের মত্তমাতাল হাওয়ায় সাপের খোলস ওড়ে তার তালে।

পুরনো চমক। শিরশির করে উঠছিল মাথার চুল। লীলা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। অস্থির হয়ে ঘরময় এটাওটা নাড়ল। রেখে দিল। নিষ্পলক কিছুক্ষণ যন্ত্রগুলোর দিকে চেয়ে থাকল। তারপর বেরুল। বাহাদুর বলল, চলে যাচ্ছেন মেমসাব ?

অতি দুঃখে হাসি পেল লীলার। মেমসাব শুনে হেসে ফেলল সে। বাহাদুর তাকে মেমসাব বলে। লীলা বলল, আসছি।

আপাতত রমার কাছে। তারপর কোথাও যেতে হবে। কিছু একটা করতে হবে।

পথেই রমার সঙ্গে দেখা।···এত সকালে! রমা চমকে উঠেছে। সকালে বলে নয়, লীলার চেহারায় কী একটা ছিল। প্রচণ্ড ধ্বংসের ছবি যেন।

রমার হাত ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিল লীলা। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। এক সময় লীলা বলল, দোকানগুলো খুলবে কখন ?

রমা ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, আটটার আগে নয়। কেন ?

লীলাও কবজি তুলে ঘড়ি দেখল। এক ঘণ্টা! চল, ততক্ষণ কোথাও গিয়ে বসি। কল্পনা সিনেমার ওদিকে রেডিমেড পোষাকের দোকান আছে না?

রমা অবাক হয়ে ফের বলল, কেন ?

ছেলেবেলায় সঙ্গিনীদের যেমন করে বলত, তেমনি করে ছড়ার সুরে মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে লীলা জবাব দিল, খোকাবাবু যায় লালজুতু পায়··· আর কী যেন মনে নেই। হি হি করে হেসে উঠল পরক্ষণে।···পুতুল খেলার বড্ড শখ হয়েছে রমা। তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। বাসিনী রাণীচকে আছে শুনেছি। বুড়িকে চমকে দেব হঠাৎ। কী মজাই না হবে!

রমা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, ফিরবেন কখন ?

লীলা ছোট্ট জবাব দিল, জানি না।